পয়গামে মুহাম্মদী

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী
অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

পয়গামে মুহাম্মদী

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী

অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

www.bjilibrary.com

পয়গামে মুহাম্মদী

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী
অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

www.bjilibrary.com

পয়গামে মুহাম্মদী

- সাইয়েদ সুলায়মান নদভী

প্রকাশক ঃ আবু তাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৭ ইং

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর - ২০১৫
কার্তিক - ১৪২২
মহররম - ১৪৩৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

"PAIGAM-E-MUHAMMADI", The Message of Prophet Muhammad (s) written by Syed Sulaiman Nadvi in Urdu, Published by : Abu Taher Mohammad Ma'sum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 504/1 Baro Moghbazar, Dhaka-1217.

Fixed Price : Taka 100.00 (One hundred) only.

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী ১৯২৫ সালে মুসলিম এডুকেশনাল এসোসিয়েশন অব সাউদার্ণ ইণ্ডিয়ার আমন্ত্রণে মাদ্রাজের লালী হলে নবী চরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আটটি ভাষণ দেন। এগুলো পরবর্তীকালে 'খুতুবাতে মাদ্রাজ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক প্রসিদ্ধি অর্জন করে। মহানবীর জীবন-চরিত এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে তাঁর বিপুল অবদান সম্বন্ধে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ খুব কমই দেখা যায়। এই অমূল্য গ্রন্থখানি উর্দু থেকে বাংলা ভাষান্তরকরণের গুরু দায়িত্ব পালন করেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। বইটির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলছে। গ্রাহক চাহিদা বিবেচনায় বইটির পুনঃমুদ্রণ করা হল।

মহান আল্লাহ লেখক এবং অনুবাদকের মেহনত কবুল করে তাদের জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন ॥

www.bjilibrary.com

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

"তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও নির্ভুল জীবন-বিধান সহকারে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যেন তিনি উক্ত জীবন-বিধানকে (ইসলাম) দুনিয়ার অন্যান্য সকল জীবন-বিধানের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকদের নিকট তা অসহনীয় ॥" (সূরা আস্-সাফ, আয়াত-৯)।

www.bjilibrary.com

লেখকের কথা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আটটি বক্তৃতা এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ইসলামী শিক্ষা সংস্থার আবেদনক্রমে ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে এ বক্তৃতাগুলো প্রদত্ত হয়েছিল। মাদ্রাজে কয়েক বছর থেকে জনৈক আমেরিকান খ্রিস্টানের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে কোন না কোন বিশিষ্ট খ্রিস্টান পণ্ডিত হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের জীবন ও খ্রিস্টানধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করে আসছেন। এ বক্তৃতাগুলো প্রতি বছর প্রদত্ত হচ্ছে এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শ্রুত হয়ে আসছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাজের কতিপয় নিস্বার্থ মুসলিম শিক্ষানুরাগী মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রচেষ্টা চালাবার প্রয়োজন বোধ করেন অর্থাৎ, প্রতি বছর ইংরেজী শিক্ষার্থী ছাত্রদের রুচি ও আধুনিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক আলোচনা করার জন্য বিশিষ্ট মুসলিম আলেমগণের সাহায্য গ্রহণ করতে মনস্থ করেন।

সৌভাগ্যক্রমে মাদ্রাজের বিশিষ্ট শেঠ জনাব এম. জামাল মুহাম্মদ এ কার্যের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত হন। জনাব জামাল মুহাম্মদ মাদ্রাজের বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষায়তনে বিপুল অর্থ সাহায্য করে আসছেন। তাঁর ইসলাম-প্রীতি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণের এ সিলসিলাটি অব্যাহত রাখবে এবং মাদ্রাজে 'ইসলামী বক্তৃতাবলী'র এ সিলসিলার ইউরোপের জনপ্রিয় বক্তৃতাবলীর ন্যায় উপকারী প্রমাণিত হবে এবং ব্যাপক সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

এই গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র কাজটির জন্য সর্বপ্রথম আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয়েছে, এজন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করি। এ বক্তৃতাগুলো মাদ্রাজের লালী হলে প্রদত্ত হয়। প্রতি সপ্তাহে একটি এবং কোন কোন সপ্তাহে দুটি করে ১৯২৫ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সর্বমোট আটটি বক্তৃতা প্রদান করা হয়। সংস্থার সম্পাদক শেঠ হামীদ হাসান এ বক্তৃতাগুলোকে সর্বাঙ্গ

www.bjilibrary.com

সুন্দর করার এবং এগুলোর ইংরেজী অনুবাদ করার কার্য সম্পাদন করেছেন বলে আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। দুই দুই তিন তিন ঘন্টা অবধি ধৈর্য সহকারে এই নিরস আলোচনাসমূহ শ্রবণ করে মাদ্রাজের জনগণ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এ ছাড়াও অমুসলিম বন্ধুগণ উর্দু ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করা সত্ত্বেও একমাত্র প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে এ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন, এজন্যে আমি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞ।

মাদ্রাজের উর্দু ও ইংরেজী পত্রিকাগুলো প্রতি সপ্তাহে এই বক্তৃতা-সমূহের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেও আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে হিন্দু ও ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকা দুটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা স্ব-স্ব পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে বক্তৃতাবলীর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করার ব্যাপারে অত্যন্ত ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছে।

পরিশেষে এই বক্তৃতাগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করে আমি আল্লাহর নিকট সিজদানত হচ্ছি। তিনি যেন এই নগণ্য ভক্তি-অর্ঘটুকু কবূল করেন এবং এর লেখকের হৃদয়দেশ আন্তরিকতা ও তৌফিকের অমূল্য সম্পদে ভরপুর করে তোলেন।

দাম্মা, বিহার,
ডিসেম্বর, ১৯২৫ইং

করুণা প্রার্থী–
সাইয়েদ সুলায়মান নদভী

www.bjilibrary.com

লেখক পরিচিতি

আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সমকালীন ইসলামী বিশ্বের এক অনন্য বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৪ সালের ২২ নভেম্বর বিহারের দিস্না গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর ফুলওয়ারী শরীফ ও দারভাংগায় তাঁর দীনী শিক্ষার পাঠ শুরু হয়। ১৯০১ সালে লাক্ষ্ণৌ-এর দারুল উলুম নদওয়ায় ভর্তি হন।

১৯০৪ সালে উর্দূর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান লেখক ও গবেষক মওলানা শিবলী নোমানী নাদওয়ায় যোগদান করেন। তাঁরই যোগ্যতম তত্ত্বাবধানে সাইয়েদ সাহেব গড়ে উঠতে থাকেন। মওলানা শিবলীর কাছে মিসর ও সিরিয়া থেকে আরবী পত্রিকা আসতো প্রচুর পরিমাণে। সাইয়েদ সাহেব নিয়মিত সেগুলি পড়তেন। এভাবে আধুনিক আরবী সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা বেড়ে যেতে থাকে। ১৯০৪ সালে আন নাদওয়া নামে নাদওয়াতুল উলামার পক্ষ থেকে উর্দূতে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাইয়েদ সাহেব তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৯০৬ সালে ছাত্রদের দস্তারবন্দী মহফিলে সাবলীল ভঙ্গীতে বিশুদ্ধ আরবীতে প্রদত্ত তার বক্তৃতা শুনে মাওলানা শিবলী আনন্দে অভিভূত হন। আসন থেকে উঠে নিজের মাথার পাগড়ী খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দেন।

১৯০৭ সালে তিনি আন নাদ্ওয়ার ডাইরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সালে দারুল উলুম নাদওয়ায় কালাম শাস্ত্র ও আধুনিক আরবী সাহিত্যের অধ্যাপনার দায়িত্ব লাভ করেন। এ শিক্ষকতা সময়ে রচনা করেন 'দরুসুল আদাব' নামে দুই খণ্ড সম্বলিত একটি আরবী গ্রন্থ। ১৯১২ সালে শিক্ষকতার সাথে সাথে আন নাদওয়ার প্রশাসনিক দায়িত্বও লাভ করেন। ১৯১২ সালে লুগাতুল জাদীদা নামে আরবী ভাষার আধুনিক শব্দ সম্বলিত একটি অভিধান রচনা করেন। ১৯১৩ সালের শেষভাগে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পূনার দাক্ষিণাত্য কলেজে প্রাচ্য ভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে শিক্ষকতার সাথে সাথে 'আরদুল কুরআন' নামে একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনার কাজেও হাত দেন। এতে কুরআনে উল্লেখিত দেশ ও স্থানগুলির ভৌগোলিক বিবরণ আরব জাতির রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, বংশগত, সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণাধর্মী আলোচনা করা হয়। এতে একদিকে বাইবেলের বর্ণনার সাথে বিষয়গুলির অসামঞ্জস্য এবং অন্যদিকে কুরআনের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্য দেখানো হয়।

১৯১৪ সালে তিনি পূনা ত্যাগ করে আযমগড়ে চলে আসেন এবং সেখানে শ্রেষ্ঠ লেখক, গবেষক ও ইসলামী শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী পণ্ডিতদের নিয়ে 'দারুল মুসান্নিফীন' (লেখক একাডেমী) কায়েম করেন। এখান থেকে 'মাআরিফ' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও চালু করেন। এ প্রতিষ্ঠানের আলোকচ্ছটায় এখনো সমগ্র উপমহাদেশ আলোকিত রয়েছে। ১৯১৫ সালে তিনি দারুল উলুম নাদ্ওয়ার শিক্ষা বিষয়ক

www.bjilibrary.com

উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। উস্তাদ শিবলী নোমানীর ইন্তিকালের পর ১৯১৮ সালে তাঁর সীরাতুন্নবী সংক্রান্ত রচনাবলী গ্রন্থিত করে ১ম খণ্ডে প্রকাশ করেন। অতঃপর নিজেই অন্যান্য খণ্ডগুলি লিখতে ও প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে এর সর্বশেষ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করেন। সীরাতুন্নবী সংক্রান্ত এই অনন্য গবেষণামূলক বিশাল গ্রন্থটি তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী করে।

১৯২৫ সালে অক্টোবর ও নভেম্বরে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম এডুকেশন এসোসিয়েশনের দাওয়াতে সীরাতুন্নবীর ওপর আটটি বক্তৃতা দেন। এগুলি পরবর্তীকালে 'খুতবাত-ই-মাদরাস নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বাংলায় এ গ্রন্থটিরই নাম দেয়া হয়েছে 'পয়গামে মুহাম্মদী'। আজ পর্যন্ত বক্তৃতায় নবী চরিতকে এমন উত্তম পন্থায় আর কেউ উপস্থাপন করতে পারেননি। ১৯৩৩ সালে তার প্রসিদ্ধ গবেষণামূলক রচনা 'খাইয়াম' প্রকাশিত হয়। খাইয়াম কেবলমাত্র একজন কবিই ছিলেন না বরং একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ।

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী ১৯৪০ সালে লেখেন ছোটদের জন্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় রাসূলুল্লাহর (স) সীরাত 'রহমতে আলম।' এ বছরই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৪৬ সালে ভূপালের নবাবের অনুরোধে তিনি তাঁর এস্টেটের প্রধান বিচারপতি এবং জামেয়া মাশারিকিয়্যা তথা হায়দরাবাদের প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়'-এর আমীন বা রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন।

১৯৫০ সনে তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন। সেখানে ধর্মীয়, জাতীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে জামিয়াতুল উলামা ইসলাম'-এর সভাপতি এবং পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি কমিশন, আরবী মাদরাসাসমূহের কমিটি, ল কমিশন, করাচী ইউনিভারসিটির সিনেট ও পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল কনফারেন্সের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছিলেন রাজনীতি ও সমাজ সচেতন। মুসলিম মিল্লাতের যে কোনো সমস্যায় তাঁকে প্রথম সারিতে দেখা যেতো। তাই ১৯২১ সালে মীরাঠে অনুষ্ঠিত খিলাফত আন্দোলনের বাৎসরিক সভায় তাঁকে দেখা যায় সভাপতির আসনে। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানে আগমনের পর পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি তাঁর প্রচেষ্টা জোরদার করেন। তাঁর সভাপতিত্বে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে করাচীতে শিয়া-সুন্নী-হানাফী-আহলে হাদীস নির্বিশেষে সকল মহলের ৩১ জন উলামা সর্বসম্মতভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় 'আদর্শ প্রস্তাব' নামে এ দফাগুলি সন্নিবেশিত হয় এবং এরই ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়।

১৯৫৩ সালের ২২ নভেম্বর ইসলামী দুনিয়ার বিশ শতকের এই শ্রেষ্ঠ মনীষীর ইন্তিকাল হয়।

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

১.	মানবতার পূর্ণতা বিধানে নবীদের ভূমিকা	১৭
২.	হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ	৩৫
৩.	ঐতিহাসিক ভিত্তি	৫৫
৪.	মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা	৮১
৫.	নবী জীবনের সর্বজনীনতা	১০৩
৬.	বাস্তব কর্মজীবন	১২৭
৭.	ইসলামের পয়গম্বরের বাণী	১৫৭
৮.	হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পয়গাম–কর্ম	১৮৩
৯.	দীন ও দুনিয়ার পৃথকীকরণ	২০৪

www.bjilibrary.com

প্রথম বক্তৃতা

মানবতার পূর্ণতা বিধানে নবীদের ভূমিকা

www.bjilibrary.com

মানবতার পূর্ণতা বিধানে
নবীদের ভূমিকা

অদ্ভুত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ আমাদের এ পৃথিবী। বিচিত্র এ সৃষ্টির সমাবেশ। প্রতিটি সৃষ্টি পৃথক পৃথক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জড় পদার্থ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যাবে যে, ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে তাদের মধ্যে অনুভূতি জ্ঞান ও ইচ্ছার উন্মেষ ও উন্নয়ন ঘটে। জড় পদার্থের প্রারম্ভিক স্তর–অণু (এটম) বা ইথার সব রকমের অনুভূতি, জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তি শূন্য। কিন্তু জড় পদার্থের অন্যান্য স্তরে জীবনের ক্ষীণতম লক্ষণ পাওয়া যায়। উদ্ভিদের মধ্যে একটি অবচেতন অনুভূতির বিজাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রাণীদেহে অনুভূতির সাথে সাথে ইচ্ছাশক্তিকেও সক্রিয় দেখা যায়। আর মানব জাতির মধ্যে অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির পূর্ণত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই অনুভূতি জ্ঞান ও ইচ্ছাই আমাদের সকল দায়িত্বের আসল কারণ। যে শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে এ বিষয়গুলোর পরিমাণ যত কম, সে শ্রেণী তত বেশি ঐচ্ছিক দায়িত্বের শৃঙ্খলমুক্ত। জড় পদার্থ মূলত সব রকমের দায়িত্বমুক্ত। উদ্ভিদের মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর কতিপয় দায়িত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে মাত্র। প্রাণীদের কর্তব্য আরো কিছুটা বৃদ্ধি পায়। মানব জাতির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের শৃঙ্খলে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আবার মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এদের মধ্যে একদিকে যেমন উন্মাদ, অর্ধোন্মাদ, নির্বোধ ও শিশু রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে বুদ্ধিমান, বয়স্ক, জ্ঞানী, চতুর ও শিক্ষিত ব্যক্তির দল। অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছার তারতম্য অনুসারে তাদের কেউ পুরোপুরি দায়িত্বমুক্ত, কারোর দায়িত্ব কম এবং কারোর অনেক বেশি।

www.bjilibrary.com

অন্যদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, যে সৃষ্টির মধ্যে অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছার স্বল্পতা যত অধিক, আল্লাহ তার প্রতিপালন ও বিকাশ সাধনের দায়িত্ব তত অধিক পরিমাণেই নিজের ওপর রেখে দিয়েছেন এবং যে হারে সৃষ্টি চক্ষু উন্মীলন করতে থাকে, সে হারেই আল্লাহ তার অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছার পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর ওপর দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিতে থাকেন। পাহাড়ের বুকে মণি–মাণিক্যের লালন করে কে? সমুদ্রগর্ভে মৎস্যকুলকে কে প্রতিপালন করে? বনের পশুপাখীর আহার যোগায় কে? জীবজন্তুর দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে কে? এমনকি শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার প্রাণী এবং পাহাড়, বন ও মরুভূমিতে বসবাসকারী জীবজন্তু একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও জল-বায়ুর বিভিন্নতার দরুন এদের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ইউরোপের কুকুর ও আফ্রিকার কুকুরের জীবন ধারণের ব্যাপারে মওসুম ও জলবায়ুর বিভিন্নতার দরুন যে পার্থক্য দেখা যায়, সে অনুসারে তাদের প্রয়োজন পূরণ করার ব্যবস্থাও প্রকৃতি নিজের পক্ষ থেকেই করে। আর এ জন্যই যেসব দেশের ঋতু ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, সেসব দেশের একই শ্রেণীর পশুর নখর, চুল, লোম, চামড়ার রং ও অন্যান্য বিষয়ে বিরাট পার্থক্য লক্ষণীয়।

এসব হলো সুযোগ-সুবিধা অর্জনের বিভিন্ন উপায়। এ থেকে জানা যায়, যেখানে যে পরিমাণ অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছার অভাব থাকে, সেখানে প্রকৃতি নিজেই তা পরিমাণ মত পূরণ করার ব্যবস্থা করে। আর আল্লাহর সৃষ্টিকুল যেমনি পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত বয়সের সীমায় পৌছে যেতে থাকে, তেমনিভাবে প্রকৃতিও পর্যায়ক্রমে সুযোগ-সুবিধা অর্জনের উপায়-উপকরণসমূহ সৃষ্টির নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্যের নিকট সোপর্দ করে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে থাকে। মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা তার নিজেকেই করতে হয়। সে কৃষি-কার্য, বৃক্ষ রোপণ ও ফল উৎপাদন করার জন্যে পরিশ্রম করে। সে জন্মগতভাবে শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপযোগী চামড়া, লোম ও পশম লাভ করেনি। বিভিন্ন ধরনের পোশাকের আকারে এর ব্যবস্থা তার নিজেকেই করতে হয়। রোগ-ব্যাধি ও আঘাত প্রভৃতি প্রতিরোধ করার জন্য তার নিজেকেই প্রচেষ্টা চালাতে হয়।

www.bjilibrary.com

অন্যদিকে যেখানে অনুভূতি ও ইচ্ছা দুর্বল, সেখানে প্রকৃতি সৃষ্টিকে শত্রু থেকে রক্ষা ও তার জীবন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই বহন করেছে। আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন পশুকে বিভিন্ন উপকরণ দান করা হয়েছে। তীক্ষ্ণ নখর, সাঁড়াশী দন্ত, শিং, উড্ডয়ন ক্ষমতা, সাঁতার, অতি দ্রুতগামিতা, দংশন করার উপযোগী হুল, বিষ-দাঁত ইত্যাদি বিভিন্ন অস্ত্রে প্রকৃতি নিজেই তাদেরকে সুসজ্জিত করেছে। কিন্তু বেচারা মানুষের অবস্থা লক্ষ্য করুন, আত্মরক্ষার জন্য তার নিকট না হাতীর বৃহদাকার শুঁড় ও দাঁত আছে না বাঘের তীক্ষ্ণ নখর ও সাঁড়াশী দন্ত আছে, না ষাঁড়ের শিং আছে, না কুকুর ও সাপের বিষ আছে; আর না আছে বিছা ও বোলতার হুল। মোটকথা, বাহ্যত তাকে পুরোপুরি অসহায় ও নিরস্ত্র করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এসবের পরিবর্তে তাকে অনুভূতি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও বাসনার নিপুণ শক্তি দান করা হয়েছে এবং এ আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি তার বাইরের সকল দুর্বলতার প্রতিশেধক। সে তার এ আভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে বৃহৎ দন্ত ও শুঁড়ধারী হস্তীকে ভূপাতিত করে, লালাযুক্ত দীর্ঘ রসনা ও তীক্ষ্ণ নখরধারী ব্যাঘ্রকে হত্যা করে, ভয়াবহ বিষাক্ত সাপকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখে, শূন্যে বিচরণকারী পক্ষীকুলকে খাঁচায় আবদ্ধ করে, জলচর প্রাণীদেরকেও শিকার করে এবং আত্মরক্ষার জন্য অসংখ্য অস্ত্র নির্মাণ করে বহুতর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

বন্ধুগণ! আপনারা যে-কোনো ধর্মের ও যে-কোনো দর্শনের অনুসারী হোন না কেন, আপনাদেরকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আপনাদের মানবিক দায়িত্বের আসল কারণ হচ্ছে আপনাদের অনুভূতি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি। ইসলামী শরীয়তে এ দায়িত্বগুলোর নাম দেয়া হয়েছে 'তাকলীফ' (দায়িত্বের বোঝা)। এ দায়িত্বের বোঝা আপনাদের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী আপনাদের ওপর অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ ইসলামের এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেনঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ তাআলা কারোর ওপর তার শক্তি-সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বের বোঝা চাপান না।" (সূরা আল বাকারা- ২৮৬)

এ 'তাকলীফ'-এর দায়িত্ব ও কর্তব্যকে কুরআনের অন্য স্থানে 'আমানত' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ আমানতের বোঝা জড় পদার্থ,

www.bjilibrary.com

উদ্ভিদ, প্রাণী, এমন কি, বিরাট বিরাট পাহাড় ও সুউচ্চ আকাশের সম্মুখেও পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের একজনও তা বহন করতে রাজি হয়নি।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ـ

'আমি আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়সমূহের নিকট এ আমানত পেশ করেছিলাম। তারা (স্বাভাবিক অযোগ্যতার দরুন প্রকৃতিগত হাবভাবের দ্বারা) একে বহন করতে অস্বীকার করল। অতঃপর মানুষ একে বহন করল। অবশ্যি সে জালিম ও অজ্ঞ ছিল।' (আহযাব- ,৭২)

কবি বলেছেনঃ

اسمان بار امانت نتو ان است کشید

قرعه فال بنام من دیوانه زد ند

'আকাশ পারেনি বহিতে এ মহা আমানত-ভার
প্রেমের দিওয়ানা তাই মম শিরে আশ্রয় তার।'

'জালিম' ও 'অজ্ঞ' এই 'প্রেমের দিওয়ানা'র ভিন্নতর শাব্দিক প্রকাশ। 'জালিম' অর্থ নিজের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারী। এ গুণটি মানুষের কর্মক্ষমতা, অজ্ঞতা এবং তার জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তির ভারসাম্যহীনতার নাম। জুলুমের বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'ইনসাফ' ও 'আদল' এবং 'অজ্ঞতা'র বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'জ্ঞান'। 'ইনসাফ' ও 'জ্ঞান' জন্মগতভাবে মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। সেগুলি অর্জন করার জন্য তার কর্মক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্যের এবং মানসিক শক্তির মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন। কুরআন মজীদের পরিভাষায় ইনসাফ ও আদলের অপর নাম 'সৎ কর্ম' এবং জ্ঞানের অপর নাম 'ঈমান'।

وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ -

'সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে তারা ছাড়া।' (সূরা আল আসর– ১-৩)

www.bjilibrary.com

এ ক্ষতি হচ্ছে কর্মের ক্ষেত্রে জুলুম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা। আর এ ক্ষতিপূরণের পথ হচ্ছে 'ঈমান' অর্থাৎ, যথার্থ জ্ঞান অর্জন এবং আদল ও ইনসাফ, অর্থাৎ সৎ কর্ম অনুষ্ঠান। মানুষ যে পর্যন্ত ঈমান ও সৎ কর্ম অনুষ্ঠানের সুযোগ পায় না সে পর্যন্ত ক্ষতির মধ্যেই অবস্থান করে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সময়কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেছেন। সময়ের গতি প্রবাহের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যেসব ঘটনা, দুর্ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে, তার সমষ্টিকেই সময় আখ্যা দান করা হয়েছে উল্লিখিত আয়াতে।

কার্লাইলের ভাষায়, 'ইতিহাস নিছক মহান ব্যক্তিবর্গের জীবনী-গ্রন্থের নাম।' সময়ের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যেসব জাতি ও ব্যক্তি ঈমান ও সৎ কর্ম অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত ছিল, যারা হামেশা ক্ষতির মধ্যেই অবস্থান করেছে।

দুনিয়ার সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট পুস্তিকা, সমস্ত ধর্মগ্রন্থ, নীতিমূলক কাহিনী ও মানুষের উত্থান-পতনের সমগ্র ঘটনাবলী, জুলুম ও মূর্খতা এবং ঈমান ও সৎ কর্মের বিচিত্র সংমিশ্রণে পরিপূর্ণ। একদিকে জুলুম, মূর্খতা, দুষ্কৃতি ও অন্ধকার, আর অন্যদিকে 'আদল-ইনসাফ, সৎ কর্ম ও সুকৃতির আলোকোজ্জ্বল কাহিনী ও ইতিহাস। উপরন্তু যে সমস্ত লোক ঐ মানবিক দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করেছে, তাদের প্রশংসা এবং যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, তাদের নিন্দাবাদের ইতিকাহিনী। গ্রীক ইলিয়ড, ইতালীয় পার্লালোজ, ইরানী শাহনামা, ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারত ও গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ কি? এগুলি প্রত্যেক জাতির জন্য তার মহান ব্যক্তি ও মনীষীগণের জীবন বৃত্তান্ত থেকে জ্ঞান ও মূর্খতা, জুলুম ও ইনসাফ, ভাল ও মন্দ এবং ঈমান ও কুফরের সংঘাতের শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক জাতিকে জুলুম, দুষ্কৃতি ও কুফরীর ধ্বংসকর পরিণতি থেকে নিষ্কৃতি দান করে ইনসাফ, সুকৃতি ও ঈমানের নজীরগুলির দ্বারা ফায়দা হাসিল করার সুযোগ দানই এসবের উদ্দেশ্য।

তাওরাত, ইন্‌জীল, যাবুর ও কুরআন মজীদের অধিকাংশ বিষয়বস্তু কি? এগুলি হচ্ছে জালিম, দুষ্কৃতিকারী ও কাফের জাতি ও ব্যক্তিবর্গের ধ্বংস এবং ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও মু'মিন জাতি ও ব্যক্তিবর্গের সৎকর্মশীলতা, সৌভাগ্য ও সাফল্যের উদাহরণ। যেন এসব জানার ফলে জালিম ইনসাফ-পরায়ণ,

www.bjilibrary.com

দুষ্কৃতিকারী সৎকর্মশীল এবং কাফের মু'মিনে পরিণত হতে পারে। এ জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্বে প্রতি যুগে প্রতি দেশে আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বরগণের আগমন হয়েছিল, তাদের নিজেদের জাতির সামনে নিজেদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে পেশ করার জন্য। যেন এ আদর্শ অনুসরণ করে তাঁদের সমগ্র জাতি অথবা জাতির সৎ ব্যক্তিগণ কল্যাণ ও সাফল্য লাভে সক্ষম হয়। অতঃপর সবশেষে আল্লাহ তাআলা সমগ্র দুনিয়ার সামনে চিরন্তন জীবনাদর্শ পেশ করার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে 'সমগ্র দুনিয়ার প্রতি রহমত' হিসেবে প্রেরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-র পবিত্র যবান মারফত কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছেঃ

لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'(হে কুরাইশগণ!) (এর পূর্বে নবুয়তের দাবীর আগে) আমি তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘ অংশ অতিবাহিত করেছি, তোমরা কি বুঝতে পার না'? (সূরা ইউনুস)

আল্লাহ তাআলা মূলত এ আয়াতে তাঁর নবীর জীবন ও চরিত্রকে তাঁর নবুয়তের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

সারকথা হচ্ছে এই যে, ইতিহাসে এমন হাজার হাজার-লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির উল্লেখ আছে, যারা পরবর্তীগণের জন্য তাদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন। রাজা-বাদশাহর দরবারের জৌলুস, জগদ্বিখ্যাত সেনাপতিগণের যুদ্ধ-কৌশল, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকবৃন্দের চিন্তাশীল দল, বিশ্ববিজয়ী বীরগণের গৌরবময় চেহারা, কবিবৃন্দের বিচিত্র মাহফিল, ধন-সম্পদশালীগণের সুকোমল শয্যা ও মুদ্রা-ঝংকারে পূর্ণ ধনাগার–এসব বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা প্রত্যেকটি আদম সন্তানকে তাদের নিজেদের দিকে আকর্ষণ করেছে। কার্থেজের হেবল, ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার, রোমের জুলিয়াস সীজার, ইরানের দারা, ফ্রান্সের নেপোলিয়ান প্রত্যেকের জীবনেরই একটি আকর্ষণ আছে। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল ও গ্রীসের অন্যান্য জগদ্বিখ্যাত দার্শনিকগণ ও বৈজ্ঞানিকের জীবন একটি বিশেষ ধারায় ধাবমান। নমরূদ ও ফেরাউন এবং আবূ জেহেল ও আবূ লাহাবের জীবনযাত্রা অপর একটি ধারা প্রকাশ করেছে। কারুনের জীবন আর একটি

www.bjilibrary.com

পৃথক দৃষ্টান্ত। মোটকথা, দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে সহস্র প্রকারের জীবনাদর্শ বিরাজমান। আদম সন্তানের বাস্তব জীবনে রূপ লাভ করার জন্য এরা নিজদেরকে পেশ করেই রেখেছে। কিন্তু বলুন, এসব বিভিন্ন প্রকারের মানুষের মধ্যে কার জীবনধারা মানব জাতির কল্যাণ, উন্নতি ও মুক্তিপথের নিশ্চয়তা দানকারী এবং বাস্তব জীবনে অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে পারে?

তাদের মধ্যে অনেক জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সেনাপতি আছেন। যাঁরা তরবারির আঘাতে পৃথিবীর চেহারা পালটে দিয়েছেন। কিন্তু মানব জাতির মুক্তি, কল্যাণ ও হিদায়াতের জন্যে তাঁরা কি কোন আদর্শ রেখে গেছেন? তাঁদের তরবারি কি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে মানব সমাজের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত চিন্তার বাঁধন কাটতে সক্ষম হয়েছে? মানব জাতির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিবন্ধক কোন একটা সমস্যারও সমাধান করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন কি? তাঁরা মানুষের সমাজ-জীবনের কোন নকশা পেশ করতে পেরেছেন কি? আমাদের আধ্যাত্মিক নৈরাশ্য ও হতাশার কোন প্রতিকার তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে কি? আমাদের কর্মপ্রণালী ও নৈতিকতার কোন কাঠামো তৈরি করা কি তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে?

দুনিয়ায় অনেক বড় বড় কবির জন্ম হয়েছে। কিন্তু কল্পনা-জগতের এসব শাহানশাহ বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ অকেজো প্রমাণিত হয়েছেন। তাই প্লেটোর বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় দর্শনে তাদের কোন স্থান নেই। হোমার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত কবি জন্মেছেন, তাঁরা সাময়িক উত্তেজনা এবং কাল্পনিক আশা-আনন্দের ধুম্রজাল ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করা ছাড়া মানব জাতির জীবন-সমস্যা সমাধানের জন্য কোন যথার্থ পরামর্শ দান করতে সক্ষম হননি। কেননা তাঁদের সুমিষ্ট বাণীর পেছনে সততা ও সৎ কর্মের কোন সুদৃশ্য আদর্শ ছিল না। তাই কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছে ঃ

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ- اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ- وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ- اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ-

'আর কবিদের অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা। তোমরা কি দেখছ না তারা প্রত্যেক উপত্যকায় দিকভ্রান্তের ন্যায় পদসঞ্চার করে এবং মুখে যা

www.bjilibrary.com

বলে তা কার্যে পরিণত করে না। তবে যারা ঈমান এনেছে ও (কথা অনুসারে) সৎ কর্ম সম্পাদন করেছে (তারা এ দলে শামিল নয়)। (শু'আরা- ২২৪)

কুরআন মজীদ তাদের সুমিষ্ট বাণী প্রভাবহীন হবার কারণ স্বরূপ বলেছে যে, তারা দিকভ্রান্তের ন্যায় কল্পনার উপত্যকায় বিচরণ করে এবং তারা ঈমান ও সৎ কর্ম থেকে বঞ্চিত। কিন্তু যদি তারা দুটি সম্পদ হাসিল করতে পারেন, তাহলে তাদের বাণী অবশ্যি প্রভাবশালী হবে। অন্যথায় তারা হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে না। দুনিয়ার ইতিহাসই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ বহুবার তাদের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন ও বিশ্ব রহস্যের তেলেসমাতি কারখানা থেকে সংগৃহীত অদ্ভুত অদ্ভুত মতবাদ পেশ করে দুনিয়াকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন। তারাও মানব জাতির হিদায়াতের জন্য কোন কার্যকর নকশা পেশ করতে পারেননি এবং মানবিক কর্তব্যের রূপ রেখা ও গতিপথ নিরূপণে কোন সক্রিয় সাহায্য করেননি। কারণ তাদের সুক্ষ্মতর আলোচনা ও উচ্চ চিন্তার পেছনে সৎ কর্মের কোন বাস্তব নমুনা ছিল না। এরিস্টটল ন্যায় দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন। দুনিয়ার প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ন্যায়-শাস্ত্রের ওপর উন্নতমানের বক্তৃতা প্রদান করা হয় এবং নৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে গভীর চিন্তার প্রশংসা করা হয়। কিন্তু সত্যি করে বলুন, এ দর্শন পড়ে বা শুনে ক'জন লোক সৎ পথের অনুসারী হয়েছে? আজ দুনিয়ার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অসংখ্য বড় বড় ও যোগ্যতম অধ্যাপক রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের নীতিশাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব, নীতি-কথার প্রভাব তাদের শিক্ষায়তনগুলির চৌহদ্দি টপকে কখনো বাইরের জগতে আসতে পারেনি–আসতে পারেও না। কারণ শিক্ষায়তনের প্রকোষ্ঠ ছেড়ে যখন তাঁরা বাইরে বের হয়ে আসেন, তখন দেখা যায় তাঁদের জীবন সাধারণ মানুষের জীবনের তুলনায় এক ইঞ্চিও উন্নত নয়। মানুষ শুধু কান দিয়ে শুনেই নয়–চোখ দিয়ে দেখেও শিক্ষা লাভ করে।

দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে বড় বড় বাদশাহ ও শাসকের আবির্ভাব ঘটেছে। অনেক সময় তাঁরা দুনিয়ার বিশাল এলাকায় শাসন কর্তৃত্ব চালিয়েছেন, বিভিন্ন জাতির ধন-প্রাণের মালিক হয়েছেন। একটি দেশ ধ্বংস করেছেন ও

www.bjilibrary.com

অন্য একটি দেশ গড়ে তুলেছেন। একটি জাতিকে অধঃপতিত করেছেন ও অন্য একটি জাতিকে উন্নত করে তুলেছেন। একজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং অন্যজনকে দান করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে তাদের নীতি একই ধরনের ছিল এবং আছে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে 'সাবা'র রাণীর মুখ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً

'বাদশাহ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে এবং তার সম্মানী ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করে।' (আন নমল– ৩৪)

এসব পরাক্রান্ত শাসকদের তরবারি জনপদ ও জনসমাজে বসবাসকারী দুষ্কৃতকারীদের আত্মগোপন করতে বাধ্য করেছে বটে, কিন্তু তারা নির্জন ও নিঃসঙ্গ পরিবেশে গুপ্ত অপরাধীদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তারা শহর ও রাজপথে শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম করেছে, কিন্তু মানুষের অন্তরের রাজ্যে সুখ ও শান্তি আনতে পারেনি। তারা দেহের রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য, কিন্তু রূহের জগতে আইন ও শৃঙ্খলা তাদের দ্বারা কায়েম হয়নি। বরং আধ্যাত্মিক ধ্বংসের সকল উপাদান তাদেরই দরবার থেকে বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আলেকজাণ্ডার ও জুলিয়াস সীজারের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত বাদশাহগণও কি আমাদের জন্য কিছু রেখে গেছেন?

সুলান থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন আইনবিদ জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাদের আইনের জীবনকাল স্থায়িত্ব লাভ করেনি। এবং সে আইন মান্যকারীরা মানসিক পবিত্রতার রহস্যের সন্ধান লাভ করেনি। পরবর্তীকালের বিচারকগণ ও বিচারালয়গুলি সেসব আইনকে ভ্রান্ত মনে করে বাতিল করে দিয়েছেন। তারা মানবজাতির সংস্কারের জন্য না হলেও শুধু নিজেদের সুবিধা ও মর্জি অনুযায়ী তদস্থলে অন্য আইন জারি করেছেন। আজও এ অবস্থা বদলায়নি। আজকের সুসভ্য যুগেও বিভিন্ন দেশে এমন সব আইন পরিষদ গঠিত হয়েছে যে, তার আজকের বৈঠকে যে আইন পাস হয়, কাল তা বাতিল হয়ে যায়। আর এসব রদবদল জনগণের স্বার্থে নয় বরং সরকার ও রাষ্ট্রপরিচালকদের স্বার্থেই করা হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

প্রিয় বন্ধুগণ! যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর মানব-সন্তানদের দ্বারা মানব জাতির উপকার ও সংশোধনের আশা করা যেতে পারতো, তাদের প্রত্যেকের অবস্থা আপনারা পর্যালোচনা করেছেন। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। বর্তমানে দুনিয়ার যেখানেই সুকৃতির আলোক ও সততার কিরণ দীপ্তিমান, যেখানেই আন্তরিকতা ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের শিক্ষা প্রোজ্জ্বল, সেখানেই তা কেবলমাত্র সেই সব মহামনীষীর শিক্ষা ও হিদায়াতের ফলশ্রুতি নয় কি, যাদেরকে আপনারা নবী বলে জানেন? পর্বতের গুহায়, বনের বীথিকায়, নগরে ও জনপদে যেখানেই দয়া, করুণা, ইনসাফ, দরিদ্রের সাহায্য, এতিমের প্রতিপালন ও সুকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানেই তা অবশ্য এ মহান দলটির কোন-না-কোন ব্যক্তির দাওয়াত ও শিক্ষার স্থায়ী প্রভাবের ফল। কুরআন মজীদের শিক্ষা অনুযায়ী। وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ

'এমন কোন জাতি নেই যার মধ্যে কোন সতর্ককারীর আবির্ভাব ঘটেনি' এবং وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ 'প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছেন একজন করে পথ প্রদর্শক।'

প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির মধ্যে আজ কেবলমাত্র তাঁদেরই কথা ও কার্যের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে এবং দিকে দিকে তাঁদের বাণীর প্রতিধ্বনিই শোনা যাচ্ছে। সভ্যতার আলোক-বঞ্চিত আফ্রিকার আদিম অধিবাসী হোক বা ইউরোপের সুসভ্য মানুষ, প্রত্যেকের হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা নবীদের পবিত্র উৎসধারায় অবগাহনেরই ফল। ইতিপূর্বে আমি যেসকল মহান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীর নাম উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ শ্রেণীটি রাজা-বাদশাহের ন্যায় দেহের ওপর নয় বরং হৃদয়ের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। যদিও সেনাপতির শাণিত তরবারি তাঁদের হাতে নেই, তবুও তাঁরা গুনাহর স্তূপ ও অসৎ কর্মের সারি মুহূর্তের মধ্যে উলটিয়ে দেন। তাঁরা কল্পনা রাজ্যে বিচরণকারী কবি না হলেও আজও মানুষের কান তাঁদের সুমিষ্ট ভাষণের স্বাদ গ্রহণ করেছে। তাঁরা যদিও বাহ্যত আইন পরিষদের সিনেটর ছিলেন না, তবুও হাজার হাজার-লক্ষ লক্ষ বছর পরও তাঁদেরই আইন আজও পূর্ববৎ জীবিত আছে এবং তা শাসক ও আদালত উভয়ের ওপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। তাঁদেরই আইন আজও বাদশাহ-ফকীর ও রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সবার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য রয়েছে।

www.bjilibrary.com

এখানে ধর্ম ও আকীদার প্রশ্ন নয়, বরং প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাসের, বাস্তবে এর অস্তিত্ব আছে কি? পাটলিপুত্রের রাজা অশোকের নির্দেশাবলী কেবল পাথরের গায়ে খোদাই করা আছে। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের নির্দেশাবলী হৃদয়পটে উৎকীর্ণ রয়েছে। উজ্জয়িনী, হস্তিনাপুর (দিল্লী) ও কনৌজের রাজাদের নির্দেশ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু মনুর ধর্মশাস্ত্র আজও প্রচলিত আছে। ব্যাবিলনের সর্বপ্রথম আইন প্রণেতা রাজা হামুরাবীর আইন-পুস্তক বহুকাল পূর্বে ধরণীর মাটিতে মিশে গিয়েছে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের শিক্ষা আজও জীবিত। ফেরাউনের اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ খোদা'-এর যুগের কোন চিহ্ন বিদ্যমান আছে কি? অথচ হযরত মূসা আলায়হিস সালামের শক্তি আজও বিশ্বে স্বীকৃত। সুলান প্রণীত আইন স্থায়িত্ব লাভ করতে পেরেছে কি? অথচ তাওরাতের প্রত্যাদিষ্ট আইন আজও মানুষের মধ্যে ইনসাফের তুলাদণ্ডরূপে স্বীকৃত। যে রোমান ল' হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আদালতে পাপী প্রমাণিত করেছিল, শত শত বছর পূর্বে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-র শিক্ষা ও হিদায়াত আজও পাপীদেরকে পূণ্যবান ও অপরাধীদেরকে সচ্চরিত্র করার দায়িত্ব পূর্বের মতই পালন করে যাচ্ছে। মক্কার আবূ জেহেল, ইরানের কিসরা ও রোমের কায়সারের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মদীনার শাহানশাহের শাসন এখনও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত।

বন্ধুগণ! আমার ইতিপূর্বেকার আলোচনা যদি আপনাদের নিকট সন্তোষজনক মনে হয়ে থাকে, তাহলে তা নিছক আকিদা-বিশ্বাসের কারণে নয়। বরং যুক্তি, প্রমাণ ও দুনিয়ার ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাবলী আপনাদের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে যে, মানব জাতির সত্যিকার উপকার, সৎ কর্ম, উন্নত নৈতিক বৃত্তি, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং মানবিক শক্তি-সামর্থের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে মানব জাতির কোন দল যদি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে নবীদের দল। তাঁরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এ দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং দুনিয়াবাসীকে সৎশিক্ষা ও হিদায়াত দান করে তাঁদের পরেও মানুষের জন্যে চলার পথ নির্ধারণ করে গেছেন। তাঁদের শিক্ষা ও কর্মের প্রস্রবণে রাজা-প্রজা, আমীর-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী-মূর্খ সবাই সমভাবে অবগাহন করছে।

www.bjilibrary.com

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ط اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۔ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا ج وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ج وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ ۔

'আর আমি ইবরাহীমকে তার জাতির ওপর (নিজের যুক্তি পেশ করার জন্য) এ দলীল প্রদান করলাম। আমি যাকে চাই তার মর্যাদা বৃদ্ধি করি। অবশ্যি তোমার প্রতিপালক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাক ও ইয়া'কুব দান করেছি। তাদের প্রত্যেককে হিদায়াত দান করেছি। এবং (ইবরাহীমের) পূর্বে আমি নূহকে হিদায়াত দান করেছিলাম এবং তার (ইবরাহীমের) বংশ থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে (হিদায়াত) দান করেছি। সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। আমি যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা ও ইলইয়াসকে (হিদায়াত) দান করেছি। তাদের প্রত্যেকে ছিল সৎ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। আমি ইসমা'ঈল, 'ইয়াসায়া' ইউনুস ও লুতকে হিদায়াত দান করেছি এবং তাদের প্রত্যেককে দুনিয়ায় (তাদের সমকালীন ব্যক্তিবর্গের উপর) শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এবং তাদের প্রপিতাদের মধ্য থেকে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে আর তাদের ভাইদের মধ্য

www.bjilibrary.com

থেকে তাদেরকে নির্বাচন করেছি ও সরল-সোজা পথের দিকে হিদায়াত করেছি। এটিই আল্লাহর হিদায়াত। নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে চান তাঁকে এ হিদায়াত দান করেন। যদি তারা শিরক করত, তাহলে তাদের সমস্ত কাজ ধ্বংস হয়ে যেত। এই লোকদেরকে আমি কিতাব, সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা ও নবুয়ত দান করেছি। কাজেই এসব লোক (বর্তমানে তাদের তথাকথিত অনুসারীরা) ঐ নিয়ামত-সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কারণে ঐগুলি আমি এমন লোকদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) নিকট সোর্পদ করেছি, যারা সেগুলির অমর্যাদা করে না। এদেরকেই আল্লাহ তাআলা হিদায়াত দান করেছেন। কাজেই তুমি ও এদের হিদায়াতের অনুসরণ কর।' (আনআম ঃ ৮৩-৯০ আয়াত)

এ পবিত্র আয়াতসমূহে মানব জাতির হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্য একটি বিশেষ মানবশ্রেণীর অন্তর্গত বহু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের আনুগত্য ও অনুসৃতি আমাদের আত্মিক ব্যাধি ও নৈতিক দুর্বলতার প্রতিষেধক। এ পবিত্র দলটি আল্লাহর সৃষ্ট লোকালয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যুগে যুগে তাঁদের শিক্ষা ও হিদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন। আজ মানুষের জীবনে কল্যাণ, সৌভাগ্য, নৈতিকতা, সৎ কর্ম ও উন্নত জীবনের যা কিছু প্রভাব ও চিহ্ন বর্তমান তার সবকিছু এ মনীষীগণেরই বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে তাঁদের পদচিহ্ন রেখে গেছেন। দুনিয়া কমবেশী তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করেই চেষ্টা যত্নের দ্বারা সাফল্যের অনুসন্ধান করছে।

নূহের প্রচার উদ্দীপনা, ইবরাহীমের তাওহীদী প্রেরণা, ইসহাকের পৈতৃক উত্তরাধিকার, ইসমাঈলের কুরবানী, মূসার বিরামহীন প্রচেষ্টা ও সাধনা, হারূনের সত্য প্রীতি, ইয়াকুবের আনুগত্য, সত্যের করুণ অবস্থার প্রতি দাউদের মাতম, সুলায়মানের জ্ঞান, যাকারিয়ার ইবাদত, ইয়াহইয়ার পবিত্রতা, ঈসার আল্লাহভীতি, ইউনুসের ভ্রান্তি স্বীকার, লূতের অক্লান্ত পরিশ্রম, আইউবের ধৈর্য–এগুলিই আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মনোরম সুসজ্জিত প্রাসাদের আসল কারুকার্য। এ উন্নত গুণাবলীর অস্তিত্ব দুনিয়ার যেখানেই পরিদৃষ্ট হয়, সেখানেই তা ঐ মহামনীষীগণের আদর্শ ও জীবনের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। মানুষের উত্তম সমাজ, যথার্থ সভ্যতা-সংস্কৃতি,

www.bjilibrary.com

উন্নত মানের সুখানুভূতির পূর্ণতা এবং বিশ্বজাহানে তাকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা দান করার ব্যাপারে অবশ্যি মানবজাতির সমগ্র কর্মীদলের ভূমিকা স্বীকার্য। জ্যোতির্বিদগণ নক্ষত্রের গতি বর্ণনা করেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুর মৌলিক বিশেষত্ব নির্ণয় করেছেন, ডাক্তারগণ রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন, ইঞ্জিনীয়ারগণ বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, শিল্পীগণ হাজার হাজার শিল্প সৃষ্টি করেছেন। এদের সবার প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে দুনিয়ার পূর্ণতা এসেছে। তাই আমরা এদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা তাঁদের প্রতি সর্বাধিক কৃতজ্ঞ, যাঁরা আমাদের অভ্যন্তরীণ জগতকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন, আমাদের লোভ ও লালসাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, আমাদের আত্মিক রোগের প্রতিষেধক নির্ণয় করেছেন, আমাদের আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা ও সংকল্পের সংস্কার সাধন করেছেন, আমাদের আত্মা ও হৃদয়ের উন্নতি ও অধঃগতির পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছেন। এসবের মাধ্যমে দুনিয়ায় মানব সমাজে সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ণতা লাভ করেছে, চরিত্র ও নৈতিক বৃত্তি মানবতার প্রাণশক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে; সততা ও সৎবৃত্তি কর্মক্ষেত্রের আলোকবর্তিকা বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হয়েছে এবং সৃষ্টির প্রথম দিনের কৃত সেই বিস্মৃত ওয়াদা পুনর্বার আমাদের স্মৃতিপটে জাগরুক হয়েছে। যদি আমরা মানব-প্রকৃতির এ সমস্ত রহস্য এবং সৎবৃত্তি ও সততা সম্পর্কিত পয়গম্বরের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতাম, তাহলে এ দুনিয়া কি কখনো পূর্ণতার সীমায় পৌছতে পারতো? তাই আমাদের ওপর মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম এ শ্রেণীটির দান অগণিত এবং এ জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা অত্যন্ত জরুরী। ইসলামের ভাষায় এরই নাম 'সালাত' ও 'সালাম'। নবীগণের পবিত্র নামের সাথে আমরা হরহামেশা এ কথাগুলি উচ্চারণ করে থাকি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ

বন্ধুগণ! এ পবিত্র ব্যক্তিগণ তাঁদের নির্ধারিত সময়ে দুনিয়ায় এসেছেন এবং আবার যথাসময়ে এখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ ধ্বংসশীল বিশ্বের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাঁদের জীবন যতই পবিত্র ও নিষ্কলুষ হোক না

www.bjilibrary.com

কেন, চিরন্তন ও চিরস্থায়ী হবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। তাই মানবজাতির ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য যা পথপ্রদর্শক হতে পারে তা হচ্ছে লিখিতভাবে ও মৌখিক বর্ণনা মারফত প্রাপ্ত তাঁদের জীবনপ্রণালী। আমাদের নিকট এ অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণের অন্য কোন পন্থা নেই। অতীতকালের জ্ঞান, শিল্প, চিন্তা, গবেষণা কাহিনী ইত্যাদি জানার এ ছাড়া অন্য কোন মাধ্যম নেই। মানব জীবনের এ সমস্ত লিখিত ও বর্ণিত রূপরেখা ও প্রতিচ্ছবির নামই ইতিহাস ও জীবনচরিত। সম্ভবত আমাদের জীবনের অন্যান্য অংশের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের কোন-না-কোন শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কিন্তু আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিশুদ্ধি ও পূর্ণতার জন্যে একমাত্র নবীগণ ও তাঁদের পদাংক অনুসরণকারীগণের ইতিহাস ও জীবন চরিতই কার্যকরী ও উপকারী হতে পারে। এতদিন পর্যন্ত মানুষ একমাত্র তাঁদেরই নিকট থেকে উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও একমাত্র তাঁদের নিকট থেকেই উপকৃত হতে পারে। তাই মানুষের নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পূর্ণতার জন্য এ পবিত্র ব্যক্তিগণের জীবনচরিত সংরক্ষণ সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

দর্শন, শিক্ষা ও হিদায়াত যতই উন্নত ও উত্তম হোক না কেন, যদি তার পেছনে তাকে ধারণ ও বাস্তবায়িত করার এমন উপযোগী ব্যক্তিত্ব না থাকে যিনি আমাদের মনোযোগ, মহব্বত ও মর্যাদার মধ্যমণি হিসেবে পরিগণিত হবেন, তাহলে তা কোনদিনই সত্যিকার জীবন লাভ ও সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ক্রুকোডিয়া নামক জাহাজযোগে আমরা হেজাজ ও মিসর সফর শেষে ফিরে আসছিলাম। ঘটনাক্রমে বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একই জাহাজযোগে আমেরিকা সফর শেষে দেশে ফিরছিলেন। জনৈক যাত্রীবন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "ব্রাহ্মসমাজের ব্যর্থতার কারণ কি? অথচ তার নীতি ছিল বড়ই ন্যায়নিষ্ঠ সংস্কারবাদী। ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা ছিল ঃ সকল ধর্ম সত্য এবং সকল ধর্মের প্রবর্তকগণ সৎ ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। এ সমাজের মধ্যে বুদ্ধি ও যুক্তিবিরোধী কোন কথাই ছিল না, বর্তমান জগতের সভ্যতা সংস্কৃতি, দর্শন ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই তার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তবুও এ মতবাদ সাফল্য লাভে সক্ষম হলো না কেন?"

www.bjilibrary.com

দার্শনিক কবি এর জবাব কি চমৎকারভাবেই না দিলেন। তিনি বললেন, "ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে, এর পেছনে এমন কোন ব্যক্তির জীবন ও তাঁর বাস্তব চরিত্র ছিল না, যিনি আমাদের দৃষ্টির মধ্যমণি হতে পারতেন এবং আমাদের জন্য সততা ও সৎকর্মশীলতার জলজ্যান্ত নমুনায় পরিণত হতেন।" এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম তার নবীর চরিত্র ও বাস্তব জীবনধারা ছাড়া ব্যর্থ।

মোটকথা, আমাদের হিদায়াত ও পথনির্দেশের জন্য আমরা নিষ্কলুষ মানুষ, নিষ্পাপ সত্তা ও সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী মনীষীবৃন্দের মুখাপেক্ষী। আর তাঁরা হলেন আল্লাহর নবী।

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ -

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় বক্তৃতা

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ

www.bjilibrary.com

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ

বন্ধুগণ! আজ আমাদের মাহফিলের দ্বিতীয় দিন। ইতঃপূর্বে যা কিছু বলেছি, তা আপনাদের স্মরণ আছে। এখন আরেকটু সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া যাক। আমার পূর্বের বক্তৃতার সারমর্ম ছিল, মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত্যের অন্ধকার দূর করার জন্য অতীতের দীপ শিখা থেকে আলো গ্রহণ করা অপরিহার্য। মানব শ্রেণীর মধ্য থেকে যারা এ বিষয়ে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও আবার আমাদের প্রতি সবচাইতে বেশি অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহর নবীগণ। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগে নিজেদের জাতির সামনে সমকালীন অবস্থা অনুসারে উন্নত নৈতিক বৃত্তির ও পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণাবলীর কোন না কোন উন্নত অলৌকিক নিদর্শন পেশ করেছেন। কেউ ধৈর্য, কেউ ত্যাগ, কেউ কুরবানী, কেউ তওহীদের আবেগ, কেউ হকের প্রেরণা, কেউ আনুগত্য, কেউ নিষ্কলুষ মনোবৃত্তি, কেউ আল্লাহ্ভীতি প্রভৃতির উন্নত আদর্শ পেশ করে দুনিয়ার মানুষের জটিল জীবনপথে এক একটি সুউচ্চ মিনার কায়েম করেছেন, যেন তা দেখে মানুষ সোজা ও সরল পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। কিন্তু তবু এমন একজন পথপ্রদর্শক ও নেতার প্রয়োজন ছিল যিনি নিজের হিদায়াত ও বাস্তব কার্যাবলীর দ্বারা সমগ্র পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করতে পারেন অর্থাৎ তিনি যেন আমাদের হাতে হিদায়াতের একটি পূর্ণাঙ্গ 'গাইডবুক' প্রদান করেন। আর এ গাইডবুকটি নিয়ে প্রত্যেকটি মুসাফির যেন অনায়াসে গন্তব্যস্থানের সন্ধান লাভ করতে পারে। এহেন নেতৃত্বের ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ

www.bjilibrary.com

করেছেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا- وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ط

'হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী, (সৎকর্মশীলদেরকে) সুসংবাদদানকারী (গাফিলদেরকে) সতর্ককারী এবং আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহবানকারী ও একটি উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়ে পাঠিয়েছি।'

(আল আহযাব ঃ ৪৫-৪৬)

তিনি এ বিশ্বে আল্লাহর শিক্ষা ও হিদায়াতের সাক্ষ্যদানকারী সৎ-কর্মশীলদের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদদানকারী। আর যারা এখনও সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদেরকে সতর্ক ও সাবধানকারী, ভীতি প্রদর্শক, পথভ্রষ্ট লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবানকারী এবং তিনি নিজে মূর্তিমান আলোক ও প্রদীপ। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবন আমাদের পথের অন্ধকার দূরীভূতকারী উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। এমনি তো সকল পয়গম্বরই আল্লাহর বাণীর সাক্ষ্যদানকারী, তৎপ্রতি আহবানকারী, সুসংবাদদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী, প্রভৃতি হিসেবে এ দুনিয়ায় এসেছেন। কিন্তু এসব গুণাবলী তাঁদের সকলের জীবনে কার্যত সমানভাবে বিকাশ লাভ করেনি। অনেক নবী ছিলেন, যাঁরা বিশেষভাবে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইসহাক, হযরত ইসমাঈল প্রমুখ নবীগণ। অনেক নবী সুসংবাদদানকারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন, হযরত ইবরাহীম, হযরত ঈসা প্রমুখ নবীগণ। অনেক নবীর বিশেষ গুণ ছিল ভীতি প্রদর্শন, যেমন হযরত নূহ, হযরত মূসা, হযরত হূদ ও হযরত শুআইব প্রমুখ নবীগণ। আবার অনেক নবীর বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যের আওয়াজ দান। যেমন, হযরত ইউসুফ, হযরত ইউনুস প্রমুখ নবীগণ। কিন্তু যিনি একই সঙ্গে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, হকের আহবায়ক ও উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন এবং যাঁর জীবনপটে এসব গুণাবলী স্পষ্টভাবে খোদিত ছিল, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। কারণ তাঁকে দুনিয়ার সর্বশেষ পয়গম্বর হিসাবে পাঠান হয়েছিল। তাঁকে

www.bjilibrary.com

একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত প্রদান করা হয়েছিল। তাই একে পূর্ণতাদানের জন্য আর কোন নবী আসার প্রয়োজনই রইল না।

তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা চিরন্তন স্থায়িত্বের অধিকারী। অর্থাৎ তা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। তাই তাঁর পবিত্র সত্তাকে যাবতীয় দিক থেকে পূর্ণতা প্রদান করে অক্ষয় ভূষণে ভূষিত করা হয়েছিল।

বন্ধুগণ! আমি যা কিছু বললাম এগুলি কেবল আমার ধর্মীয় আকিদা ভিত্তিক কোন দাবী নয় বরং যুক্তি-প্রমাণের ওপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

যে চরিত্র বা জীবনাদর্শ মানুষের জন্য একটি আদর্শ জীবনের কাজ করে, তাকে গ্রহণ করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। এর সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তি।

ঐতিহাসিক ভিত্তি

ঐতিহাসিক ভিত্তির অর্থ হচ্ছে একজন আদর্শ মানবের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে যা কিছু পেশ করা হবে, তা ইতিহাস ও বর্ণনা পরম্পরার দিক থেকে নির্ভরযোগ্য হতে হবে। নিছক কিস্‌সা-কাহিনী শুনিয়ে গেলে চলবে না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, কোন জীবন-চরিত্র কাল্পনিক ও সন্দিগ্ধ বলে জানতে পারলে মানুষের মনে এর একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং এরপর তা যতই আবেগপূর্ণ ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে পেশ করা হোক না কেন, মানুষ তা থেকে কোন স্থায়ী বা সুদূরপ্রসারী প্রভাব গ্রহণ করতে পারে না। তাই একটি পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ জীবন চরিতের জন্য সর্বপ্রথম তার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন হবে অপরিহার্য। কেননা ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত মানব-প্রকৃতির ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে, কাল্পনিক গল্প-কাহিনীর দ্বারা তা সম্ভব হয় না।

ঐতিহাসিক ভিত্তির অপরিহার্যতার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, আপনি নিছক কৌতূহল নিবৃত্তি বা অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে এ আদর্শ চরিত্রের নকশা পর্যালোচনা করেন না। বরং এ আদর্শ অনুযায়ী আপনার জীবনকে গড়ে তোলা এবং তার অনুসরণ করার জন্যই এরূপ করেন। কিন্তু এ চরিত্রই যদি ইতিহাস ও বাস্তব ঘটনাবলীর ভিত্তিতে প্রমাণিত না হয়, তাহলে তার কার্যকারিতা ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে আপনি কি করে জোর দিতে পারেন? এ অবস্থায় যে কোন লোক এগুলিকে কাল্পনিক ও পৌরাণিক

www.bjilibrary.com

কাহিনী আখ্যা দিয়ে– এগুলির ওপর বাস্তব জীবনের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব নয় বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। তাই প্রভাব বিস্তারকারী, বাস্তবে কার্যকর ও অনুসরণযোগ্য হবার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ঐ পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মানুষটির জীবনচরিত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

আমরা সকল নবীকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করি এবং তাঁদের নবুয়তের সত্যতায়ও বিশ্বাসী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ -

'এ নবীগণের মধ্যে অনেককে আমি অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' –আল্লাহর একথাও স্বীকার করি। বস্তুত আদর্শের স্থায়িত্ব নবুয়তের সমাপ্তি এবং সর্বশেষে পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মানব-চরিত্র হবার কারণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন তা অন্য কোন নবী লাভ করেননি। কারণ, অন্য নবীগণকে স্থায়ী, শেষ ও খতমে নবুয়তের (নবুয়তের মোহর) মর্যাদা দান করা হয়নি। তাঁদের জীবনচরিতের উদ্দেশ্য ছিল কোন একটি বিশেষ জাতির নিকট একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত আদর্শ পেশ করা। তাই সে যুগের পর তাঁদের সে আদর্শ ধীরে ধীরে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ভেবে দেখুন! প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে, প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ভাষায় কত লাখ লাখ মানুষ আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এসেছেন। একটি প্রচলিত ইসলামী বর্ণনা মতে একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর দুনিয়ায় আগমন করেছেন। আজ তাঁদের ক'জনের নাম আমরা জানি? আর যাদের নাম জানি, তাঁদের পূর্ণ বিবরণও কি আমরা জানি? হিন্দু সম্প্রদায় দাবী করে যে, তারা দুনিয়ার সবচাইতে প্রাচীন জাতি। যদিও প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, তবুও গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, তাদের ধর্মে শত শত মনীষীর নাম পাবেন। কিন্তু এসব মনীষীর একজনের জীবনও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত নয়। তাঁদের অনেকের কেবল নামটি ছাড়া আর কিছুই উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং পৌরাণিকতার সীমা ডিঙিয়ে ইতিহাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকারও নেই। তাঁদের সবচাইতে বেশি জ্ঞাত চরিত্র হচ্ছে রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক-নায়িকাগণ। কিন্তু তাদের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে যা জানা গেছে, তার মধ্যে কোনটিকে ঐতিহাসিক বলবেন? এও জানা যায় না যে, এ ঘটনাবলী কোন কালের কোন শতাব্দীর ও কোন

www.bjilibrary.com

বর্ষের। বর্তমানে ইউরোপের কতিপয় পণ্ডিত অনেক কল্পনা ও অনুমানের মাধ্যমে কতক সময় নির্ধারণ করেছেন এবং আমাদের হিন্দু শিক্ষিত সমাজ সেগুলিকেই তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মনে করেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের বেশি সংখ্যকই এমন, যারা এগুলিকে ইতিহাসের পর্যায়ে ফেলেন না বরং এসব ঘটনা কোনদিন বাস্তবে সংঘটিত হয়েছিল বলেও স্বীকার করেন না।

ইরানের প্রাচীন পার্শী ধর্মের প্রবর্তক যরথুষ্ট্র আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বও প্রাচীনতার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে আছে। এমন কি, তাঁর নিজের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কেও অনেক ইউরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিত সন্দেহ পোষণ করেছেন। প্রাচ্যবিদগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁরা বহু ধারণা ও অনুমানের ওপর নির্ভর করে তাঁর জীবন-বৃত্তান্তের কিছু কিছু বিষয় নির্ধারণ করেন। কিন্তু তাও বিভিন্ন পণ্ডিতের পরস্পরবিরোধী মতের সংঘর্ষে এতই সন্দেহপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, কোন ব্যক্তি তার উপর নির্ভর করে নিজের কর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। যরথুষ্ট্রের জন্মস্থান, জন্মবর্ষ, জাতীয়তা, বংশ, ধর্ম, ধর্মপ্রচার, ধর্মীয় পুস্তিকার যথার্থতা, ভাষা, মৃত্যুবর্ষ, মৃত্যুস্থান প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে নির্ভুল বর্ণনার অভাব এত প্রকট যে, আন্দাজ-অনুমান ছাড়া এ প্রশ্নগুলির প্রকৃত জবাব যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যায়। এসব কারণে পার্শীগণ সরাসরি নিজেদের বর্ণনার মাধ্যমে সন্দেহযুক্ত এ অনুমানগুলির জ্ঞান রাখেন না বরং আজকাল ইউরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত থেকে তারা এগুলি বুঝবার চেষ্টা করছেন। আর তাদের নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে ফেরদৌসীর শাহনামা অতিক্রম করতে পারেনি। গ্রীক দুশমনেরা সেসব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে–এ ওজর নিতান্তই অর্থহীন। এখানে আমরা কেবল এতটুকু বলতে চাই যে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। শুধু এটুকু থেকেই প্রমাণ হয় যে, ওটা স্থায়ী ও দীর্ঘকালীন জীবন লাভ করতে পারেনি। এ জন্যই কের্ন (Kern) ও ডার মিটিটার (Der Meteter)-এর ন্যায় গবেষক ও পণ্ডিতগণ যরথুষ্ট্রের ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি অস্বীকার করেছেন।

www.bjilibrary.com

প্রাচীন এশিয়ার সবচাইতে ব্যাপক প্রচারিত ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। এ ধর্মটি এক সময় ভারতবর্ষ, চীন, সমগ্র মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, তুর্কীস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আজও বার্মা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, চীন, জাপান ও তিব্বতে এ ধর্ম বর্তমান আছে। ভারতবর্ষে অবশ্য একথা বলা সহজ যে ব্রাহ্মণেরা একে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং মধ্য এশিয়ায় ইসলাম আগমনের ফলে এর বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু সমগ্র দূরপ্রাচ্যে তার রাষ্ট্র, সভ্যতা ও ধর্ম অস্ত্রবলে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এখনো অজেয় রয়ে গেছে।[১] কিন্তু এসব সত্ত্বেও কি তারা বুদ্ধের জীবন ও চরিত্রকে ইতিহাসের আলোকে স্থায়িত্ব দান করতে পেরেছে? এবং কোন ঐতিহাসিক কি ঐ জীবনচরিতের সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাবদানের ক্ষমতা অর্জন করেছেন? স্বয়ং বুদ্ধের আবির্ভাবকাল নির্ধারণ করা হয় মগধ দেশের রাজাদের বিবরণ থেকে। অর্থাৎ এটা নিরুপণ করারও অন্য প্রমাণ নেই। ঘটনাক্রমে গ্রীকদের সঙ্গে তৎকালীন মগধ-দেশীয় রাজাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তাই আজ তাদের শাসনকাল নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে।

জৈন ধর্মপ্রবর্তকের জীবন-বৃত্তান্ত আরো অধিক অনিশ্চিত। অনুরূপ চীনের কন্‌ফুসিয়াস সম্পর্কে আমরা বুদ্ধের চাইতেও অনেক কম তথ্য জানি। অথচ তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা কোটি কোটি।

সেমেটিক জাতির মধ্যে শত শত পয়গম্বর এসেছেন। কিন্তু কেবল নাম ছাড়া ইতিহাসে তাদের আর কোন চিহ্নই নেই। হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত হূদ, হযরত সালেহ, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত যাকারিয়া এবং হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার জীবন ও চরিত্রের এক একটি বিশেষ অংশ ছাড়া আর কিছুই কি কেউ আমাদের জানাতে পারে? তাঁদের জীবনের অনেক অংশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাঁদের পবিত্র জীবনের অবলুপ্ত ও অসংলগ্ন অংশ কি কোন পূর্ণাঙ্গ মানব জীবনের জন্যে অনুসরণযোগ্য হতে পারে? কুরআন মজীদ বাদ দিলে ইহুদীদের যেসব কিতাবে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে, তার মধ্যে প্রত্যেকের সম্পর্কে ধর্মীয় পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ পোষণ করেছেন। এ সন্দিগ্ধ বিষয়গুলি বাদ দিলেও যা

১. অবশ্য বিশ শতকের প্রথমার্ধে চীনে কম্যুনিজমের প্রসারের ফলে বৌদ্ধ ধর্মে বিরাট ধ্বস নেমেছিল। –অনুবাদক

www.bjilibrary.com

অবশিষ্ট থাকে, তা তাঁদের জীবন সম্পর্কে এক অসম্পূর্ণ চিত্রই আমাদের নিকট পেশ করে।

হযরত মূসার অবস্থা আমরা তাওরাত থেকে জানতে পারি। কিন্তু যে তাওরাত আজ আমাদের কাছে আছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধানকারীদের অভিমত এই যে, হযরত মূসার শত শত বছর পর তা রচিত হয়েছে। 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার' লেখকগণও একথা স্বীকার করেছেন। অধুনা অনুসন্ধান চালিয়ে জার্মান পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করেছেন যে, বর্তমান তাওরাতে প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে পাশাপাশি দু'টো করে সূরা বা বর্ণনা লিখিত হয়েছে এবং সেগুলি অনেক স্থানে পরস্পরবিরোধী। এজন্যই তাওরাতের জীবনকথা ও ঘটনাবলীতে আমরা প্রতি পদে পদে বিপরীতমুখী বর্ণনার সম্মুখীন হই। এ থিওরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার' সর্বশেষ সংস্করণের 'বাইবেল' প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে। এ অবস্থায় হযরত আদম থেকে শুরু করে হযরত মূসা পর্যন্ত সকল নবীদের জীবন-বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু মজবুত থাকে?

হযরত ঈসার জীবনের ঘটনাবলী ইঞ্জীলসমূহে লেখা আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে লিখিত অসংখ্য ইঞ্জীলের মধ্যে বর্তমান খ্রিস্টান জগতের বিরাট অংশ মাত্র চারটি ইঞ্জীলকে স্বীকার করে। অবশিষ্ট ইঞ্জীলগুলি নির্ভরযোগ্য নয় বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ঐ চারটি ইঞ্জীলের মধ্যে কোন একটির লেখকও স্বচক্ষে হযরত ঈসা (আ)-কে দেখেননি। তাঁরা কার মুখ থেকে শুনে এ ঘটনাবলী লিখেছেন এ কথাও জানা যায়নি। বরং যে চার ব্যক্তির সাথে ঐ চারটি কিতাবকে সম্পর্কিত করা হয়, তাঁদের সঙ্গে এ কিতাবগুলির সম্পর্ক সঠিক কিনা, এ বিষয়েও বর্তমানে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে। ঐ কিতাবগুলি কোন ভাষায় ও কোন যুগে লেখা হয়েছিল, তাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়নি। ঈসায়ী ৬৭ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে ইঞ্জীল ব্যাখ্যাতা উল্লিখিত কিতাবগুলির রচনাকাল উল্লেখ করেছেন! হযরত ঈসার জন্ম, মৃত্যু ও ত্রিত্ববাদের শিক্ষাকে সম্মুখে রেখে বর্তমানে কতিপয় আমেরিকান সমালোচক ও যুক্তিবাদী (Rationalist) বলতে শুরু করেছেন যে, হযরত ঈসার অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক এবং তাঁর জন্ম ও ত্রিত্ববাদের বর্ণনা গ্রীকদের ধর্মীয় কাহিনীগুলির অনুকরণ মাত্র।

www.bjilibrary.com

কেননা গ্রীক জাতির বিভিন্ন দেবতা ও বীরদের সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। শিকাগোর বিখ্যাত পত্রিকা 'রুপন কোর্ট'-এ হযরত ঈসার অস্তিত্বকে কাল্পনিক সাব্যস্ত করে মাসের পর মাস আলোচনা হয়েছে। এ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, খৃস্টানদের বর্ণনা থেকে হযরত ঈসার জীবনের যে-সব বিবরণ পাওয়া যায়, তার ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল।

পূর্ণতা

কোন মানবচরিত্র একমাত্র তখনই কর্মজীবনের জন্য চিরস্থায়ী আদর্শরূপে পরিগণিত হতে পারে, যখন তার জীবনীগ্রন্থের প্রত্যেকটি পাতা আমাদের চোখের সামনে থাকে এবং তার জীবনের কোন একটি ঘটনা ও রহস্যও অজানার অন্ধকারে হারিয়ে যায় না। বরং তার সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত ও অবস্থা মানুষের সম্মুখে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট থাকে। এরূপ হলেই উক্ত জীবন মানব সমাজের জন্যে একটি আদর্শরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য কিনা, তা যাচাই করা যেতে পারে।

এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতাগণের জীবন ও চরিত্র যাচাই করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউ এ মানদণ্ডে টিকে না। এ থেকেই জানা যায় যে, তিনি শেষ নবী হিসেবেই দুনিয়ায় এসেছিলেন। আমি আগেই বলেছি যে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নবীর মধ্য থেকে মাত্র তিন চার জনের জীবনচরিতকে ঐতিহাসিক বলা যেতে পারে। কিন্তু পূর্ণতার দিক দিয়ে তাঁরাও যথেষ্ট নন। চিন্তা করুন, জনসংখ্যার বিচারে দুনিয়ার অধিবাসীদের এক-চতুর্থাংশ বুদ্ধের অনুসারী। এতদসত্ত্বেও ঐতিহাসিক মানদণ্ডের বিচারে বুদ্ধের জীবন মাত্র কতিপয় কিস্‌সা-কাহিনীর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ঐ কিস্‌সা-কহিনীগুলিকে ইতিহাসের মর্যাদা দান করে যদি আমরা বুদ্ধের জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের অনুসন্ধান করি, তাহলে আমাদেরকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে। এসব কিস্‌সা-কাহিনী থেকে আমরা কেবল এতটুকু জানতে পারি যে, কোন এক যুগে নেপালের 'তরাই' অঞ্চলে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর পুত্রের নাম ছিল গৌতম বুদ্ধ। তিনি স্বভাবত চিন্তাশীল ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করে এক সন্তানের পিতা হবার পর একদা ঘটনাক্রমে কতিপয়

www.bjilibrary.com

দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। এ ঘটনা তাকে অত্যধিক প্রভাবিত করলো। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ছেড়ে রাতের অন্ধকারে তিনি গৃহ ত্যাগ করলেন এবং বারানসী (কাশী) পৌছলেন। পাটলীপুত্র (পাটনা) ও রাজগীরের (বিহার) নগরে-বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে তিনি কতদিন কাটালেন এবং কবে কিভাবে গয়ার একটি বৃক্ষের নীচে সত্যের সন্ধান লাভ করলেন, কতকাল বারানসী থেকে বিহার পর্যন্ত সর্বত্র নিজের ধর্ম প্রচার করে বেড়ালেন এবং এরপর মরজগত থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন, তা জানা যায়নি। বুদ্ধ সম্পর্কে আমরা যা জানি, তার সংক্ষিপ্ত-সার হচ্ছে এটুকু।

যরথুষ্ট্রও একটি ধর্মের প্রবর্তক। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, কতিপয় ধারণা ও অনুমান ছাড়া তার জীবনচরিত সম্পর্কে আমরা আর কিছুই জানতে পারিনি। এ ধারণা ও অনুমান থেকে যা কিছু জানা গেছে, তা আমার নিজের ভাষায় না বলে বিংশ শতকের নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-সূত্র 'এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার' 'যরথুষ্ট্র' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি।

'(লোকগাথার) সংশ্লিষ্ট কবিতায় আমরা যরথুষ্ট্রের যে ব্যক্তিত্বের সাক্ষাত পাই, তা জিন্দাবেস্তার যরথুষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বরং বিপরীত প্রকৃতির। উক্ত কাহিনীর অলৌকিক ব্যক্তিটির মাধ্যমে (এরপর লোকগাথার কতিপয় কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে) আমরা যরথুষ্ট্রের সত্যিকার অবস্থা জানার আশা করতে পরি না। আর তা থেকে আমরা যরথুষ্ট্রের জীবনের কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাই না। যা কিছু পাই, তাও হয় অস্পষ্ট নয়ত অর্থহীন।[১]

যরথুষ্ট্র সম্পর্কিত বর্তমানকালের রচনাবলীর সূচনায় একই প্রবন্ধকার লিখেছেন ঃ 'তাঁর জন্মস্থান নির্ধারণ সম্পর্কিত বিবরণসমূহ পরস্পর বিরোধী।'

তাঁর আবির্ভাবকাল নির্ধারণ সম্পর্কিত গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণ এবং আধুনিক গবেষকগণের আন্দাজ-অনুমান পরস্পরবিরোধী। তাই প্রবন্ধকার লিখেছেন ঃ

'যরথুষ্ট্রের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।'

---

১. এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা, একাদশ সংস্করণ।

www.bjilibrary.com

তবুও মোটামুটি আমরা যা জানি তা হচ্ছে এই ঃ তিনি আজারবাইজানের নিকট কোন একস্থানে জন্মেছিলেন। বল্‌খ প্রভৃতি এলাকায় ধর্ম প্রচার করেন। রাজা গাশতাসপ তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি কিছু অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেন। বিয়ে করেছিলেন, সন্তানও জন্মেছিল তাঁর। তারপর কোন একস্থানে মৃত্যুবরণ করেন। এহেন অজ্ঞাত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন 'পূর্ণতার' ধারণাও বা কেমন করে করা যেতে পারে এবং তাঁর জীবনই বা কেমন করে মানুষকে পথের সন্ধান দিতে পারে?

পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনই সর্বাধিক পরিচিত। বর্তমান তাওরাত নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য আপাতত এ প্রশ্নটি বাদ দিয়ে আমরা ঐ কিতাবের বর্ণনাগুলিকে পুরোপুরি নির্ভুল মেনে নিচ্ছি। এতদসত্ত্বেও তাওরাতের পাঁচটি গ্রন্থ থেকে আমরা হযরত মূসা (আ)-র জীবন সম্পর্কে কতটুকুই বা জানতে পারি? তবুও যতটুকু জানা যায়, তা হচ্ছে এই ঃ

"হযরত মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করার পর ফেরাউনের গৃহে লালিত-পালিত হতে থাকেন। বয়োপ্রাপ্ত হয়ে ফেরাউনদের জুলুমের বিরুদ্ধে দু-একবার বনী ইসরাঈলদের সাহায্য করেন। তারপর মিসর থেকে পলায়ন করে মাদায়েনে চলে আসেন। এখানে বিয়ে করেন। বেশ কিছুকাল এখানে বসবাস করার পর মিসরে ফিরে আসেন। ফেরার পথে নবুয়ত লাভ করেন এবং ফিরে এসে ফেরাউনের নিকট পৌছেন। সেখানে তিনি অলৌকিক নিদর্শন পেশ করেন এবং বনী ইসরাঈলদেরকে মিসর থেকে নিয়ে যাবার অনুমতি চান। কিন্তু অনুমতি পাননি। অবশেষে একদা ফেরাউনের অগোচরে নিজের জাতিকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন। আল্লাহর হুকুমে সমুদ্রের বুকে তাঁর জন্য পথ তৈরি হয়। সে পথ দিয়ে তিনি তাঁর জাতিকে নিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে আরব ও সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। পেছনে অনুসরণকারী ফেরাউন তার সেনাদলসহ সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত হয়। এরপর তিনি কাফের জাতিদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। এভাবে জীবন কাটিয়ে বুড়ো বয়সে এক পাহাড়ে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের শেষ কয়েকটি বাক্যে বলা হচ্ছে ঃ

www.bjilibrary.com

তখন সদাপ্রভূর দাস মোশি (মূসা) সদাপ্রভূর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎ পিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন। কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানেনা। মরণকালে মোশির বয়স একশত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, ও তাঁহার তেজের হ্রাস হয় নাই।...মোশির তূল্য কোনো ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই। (৩৪ : ৫-১০)

১. এগুলি হচ্ছে তাওরাতের পঞ্চম গ্রন্থের বর্ণনা। এগুলি হযরত মূসার রচনা বলে দাবী করা হয়। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আপনাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত যে, এ সম্পূর্ণ গ্রন্থটি অথবা এর শেষাংশ হযরত মূসার রচনা নয়। আর সমগ্র দুনিয়ায় হযরত মূসার উক্ত জীবনী লেখক সম্পর্কে কেউ কিছু অবগত নন।

২. এ গ্রন্থটির 'কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহই জানেনা।' এবং 'মোশির (মূসা তূল্য কোন ভাববাদী (নবী) ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই।' এ শব্দগুলি দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হযরত মূসার জীবনীগ্রন্থের এ সর্বশেষ অংশটি হযরত মূসার মৃত্যুর এত দীর্ঘকাল পরে লিখিত হয়েছে যে, সে সময়ের মধ্যে একটি বহু পরিচিত স্মৃতিচিহ্নকেও মানুষ ভুলে যেতে পারে এবং একজন নতুন পয়গম্বরের আগমন আশা করা যেতে পারে।

৩. হযরত মূসা একশো বিশ বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন তাঁর এ সুদীর্ঘ একশো বিশ বছরের ক'টি ঘটনাই বা আমরা জানতে পেরেছি? তাঁর জীবনের প্রয়োজনীয় ক'টি অংশ আমাদের হাতে আছে? তাঁর জন্ম, যৌবনকালে হিজরত, বিবাহ ও নবুয়তের ঘটনাবলী আমরা জানি। অতঃপর কয়েকটি যুদ্ধের পর বৃদ্ধাবস্থায় ১২০ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। এ বিষয়গুলিকে বাদও দেয়া যেতে পারে। কেননা, এগুলি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এ বিষয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু মানব-সমাজের বাস্তব আদর্শের জন্যে যেসব বিষয়ের প্রয়োজন সেগুলি হচ্ছে চরিত্র, স্বভাব ও জীবনযাপন পদ্ধতি। আর এ অংশগুলি হযরত মূসার জীবনীতে অনুপস্থিত। এছাড়া সাধারণ খুঁটিনাটি বিষয় অর্থাৎ মানুষের নাম, বংশ, স্থানের পরিচয়, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং আইনগত বিভিন্ন বিষয় তাওরাতে উল্লিখিত আছে। এসব তথ্য ভূগোল, বংশপরিচয় ও আইন জানার জন্যে হয়ত কোন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবন

www.bjilibrary.com

যাপনের ক্ষেত্রে এর কোন কার্যকারিতা নেই এবং এগুলি জীবনচরিতকে পূর্ণতা দানের যোগ্যতা থেকেও বঞ্চিত।

ইসলামের সর্বাধিক নিকট যুগের পয়গম্বর হচ্ছেন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম। ইউরোপীয় হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে তাঁর অনুসারীরা বিশ্বে সংখ্যাগুরু। কিন্তু আপনারা শুনে তাজ্জব হবেন, এই ধর্মের পয়গম্বরের জীবনচরিত অন্যান্য পরিচিত ধর্মসমূহের প্রবর্তক ও পয়গম্বরের জীবনচরিতের তুলনায় সর্বসাধারণের নিকট সবচাইতে কম প্রকাশিত। খ্রিস্টীয় ইউরোপের ঐতিহাসিক রুচিও লক্ষনীয়। তারা ব্যাবিলন, আসিরীয়া, আরব, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও তুর্কিস্তানের হাজার হাজার বছর পূর্বের ঘটনাবলী প্রাচীন গ্রন্থ ও লিপিকা পাঠ করে, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, পাহাড় ও ভূগর্ভ খনন করে জনসমক্ষে তুলে ধরছে এবং বিশ্ব-ইতিহাসের ছিন্নপত্রসমূহ পুনর্বার জোড়া লাগাচ্ছে। কিন্তু তাদের এই অদ্ভুত পুনরুজ্জীবন-ক্ষমতা হযরত ঈসার জীবন-বৃত্তান্ত কোনক্রমেই উদ্ধার করতে পারেনি। ইঞ্জীলের বর্ণনামতে হযরত ঈসা ৩৩ বছর বেঁচে ছিলেন। বর্তমান ইঞ্জীলসমূহের বর্ণনা প্রথমত অনির্ভরযোগ্য। সেখানে কেবলমাত্র তাঁর জীবনের শেষ তিন বছরের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর ঐতিহাসিক জীবনের কেবল এতটুকুই আমরা জানি যে, তিনি জন্মগ্রহণ করলেন, জন্মের পর তাঁকে মিসরে আনা হলো। শৈশবে দু-একটি অলৌকিক কার্য সম্পাদন করলেন। অতঃপর আর তাঁর সাক্ষাত নেই। এরপর অকস্মাৎ ত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে ধর্মপ্রচার করতে দেখা গেল। পাহাড় ও নদীর ধারে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বক্তৃতা করে বেড়ালেন। কতিপয় শিষ্য জুটে গেল। ইহুদীদের সঙ্গে কতিপয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলো। ইহুদীরা তাঁকে গ্রেফতার করে রাজ দরবারে নিয়ে গেল। সেখানে রূমীয় গভর্নরের আদালতে বিচার হলো এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কবরে তার লাশ পাওয়া গেল না। ত্রিশ বছর এবং কমপক্ষে পঁচিশ বছর তিনি কোথায় এবং কিভাবে জীবনযাপন করলেন, এ খবর বিশ্ববাসী জানে না এবং কোনদিন জানবেও না। এই শেষ তিন বছরের ঘটনাবলীর মধ্যেও বা কি আছে? কতিপয় অলৌকিক কার্য, বক্তৃতা ও সর্বশেষে মৃত্যুদণ্ড।

www.bjilibrary.com

ব্যাপকতা

কোন জীবনচরিতের পক্ষে বাস্তব আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হবার জন্য তৃতীয় প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে এর ব্যাপকতা। ব্যাপকতার অর্থ হচ্ছে, বিভিন্ন মানব শ্রেণীর পথ-নির্দেশ ও আলোক লাভের জন্য যে সব আদর্শের প্রয়োজন অথবা প্রত্যেক ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক রক্ষা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করার জন্য যে সব দৃষ্টান্ত ও নমুনার প্রয়োজন, তার সম্পূর্ণই উক্ত আদর্শ জীবনের ভাণ্ডারে মওজুদ থাকতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউই সেই পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হতে পারেন না। ধর্ম কি? আল্লাহ ও বান্দার এবং বান্দাদের পরস্পরের ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সেগুলি স্বীকার ও সম্পাদন করা, অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করার নাম ধর্ম। তাই প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের কর্তব্য হচ্ছে, নিজেদের পয়গম্বর ধর্মপ্রবর্তকগণের জীবন থেকে ঐ সব হক, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে তদনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয় দিক দিয়ে বিস্তারিত বিষয় অনুসন্ধান করতে গেলে একমাত্র ইসলামের পয়গম্বর ছাড়া আর সর্বত্রই আপনাকে নিরাশ হতে হবে।

ধর্ম দু'প্রকার। এক প্রকার ধর্মে আল্লাহকে স্বীকার করা হয়নি, যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। তাই এ ধর্মগুলিতে আল্লাহ, তার সত্তা, তার গুণাবলী ও তার বিভিন্ন অধিকারের প্রশ্নই নেই। তাই তাদের প্রবর্তকগণের মধ্যে আল্লাহ প্রেম, আন্তরিকতা, তাওহীদ প্রভৃতির অনুসন্ধানই অর্থহীন। দ্বিতীয় প্রকার ধর্মে আল্লাহকে কোনো-না কোনো পর্যায়ে স্বীকার করা হয়েছে। এ ধর্মগুলির প্রবর্তক ও পয়গম্বরগণের জীবনেও আল্লাহর আনুগত্য সম্পর্কিত ঘটনাবলী অনুপস্থিত। আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসের স্বরূপ কি হওয়া উচিত এবং তাদের বিশ্বাসের স্বরূপ কি ছিল? উপরন্তু ঐ বিশ্বাসের ওপর তাঁরা কতটুকু দৃঢ় ছিলেন? তাঁদের জীবনীতে এ সম্পর্কিত আলোচনা নেই! সমস্ত তাওরাতটি পাঠ করলেও দেখা যাবে যে, আল্লাহর তাওহীদ ও তার নির্দেশাবলী এবং কুরবানীর শর্তসমূহ ছাড়া তাওরাতের পাঁচটি গ্রন্থে এমন একটি বাক্যও নেই, যা থেকে জানা যেতে পারে যে, আল্লাহর সঙ্গে হযরত মূসার আন্তরিক সম্পর্ক, আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগী আল্লাহর প্রতি

www.bjilibrary.com

নির্ভরতা ও বিশ্বাস এবং আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী ও আল্লাহর শক্তির বিকাশ তাঁর হৃদয়ে কোন পর্যায়ে ছিল। অথচ মূসার ধর্ম যদি চিরস্থায়ী ও সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে এসে থাকে, তাহলে ওসব জরুরী বিষয়গুলি লিখে রাখা তাঁর অনুসারীদেরই কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না। তাই তারা এ কাজ করতে পারেনি।

হযরত ঈসার জীবন-মুকুর হচ্ছে ইঞ্জীল। আল্লাহ হযরত ঈসার পিতা–এই একটি মাত্র বিষয় ছাড়া ইঞ্জিলে আমরা এমন আর কিছু পাই না, যার সাহায্যে এ পবিত্র পিতা ও পুত্রের মধ্যস্থিত সম্পর্কের ধরন স্থির করা যায়। পুত্রের স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যায় যে, পিতা পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু পুত্র পিতাকে কি পরিমাণ ভালবাসতেন, তা জানা যায় না। এও জানা যায় না যে, তিনি পিতার আনুগত্য ও নির্দেশ পালনে কতটুকু তৎপর ছিলেন, দিবা-রাত্রের মধ্যে কোন সময় তাঁর সম্মুখে নত হতেন কিনা, 'আজকের রুটি' ছাড়া আর কোন বস্তু কখনো তার কাছে চেয়েছিলেন কিনা এবং যে রাত্রে গ্রেফতার হন, তার পূর্বে কোন একটি রাতেও তিনি পিতার নিকট কোন প্রর্থনা করেছিলেন কিনা। এমতাবস্থায় এ ধরনের জীবনচরিত থেকে আমরা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে কি পরিমাণ লাভবান হতে পারি? হযরত ঈসার জীবনে আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক যদি সুস্পষ্ট হতো, তাহলে সাড়ে তিনশো বছর পর প্রথম খ্রিস্টান রাজাকে নিজ শহরে তিনশো খ্রিস্টান পণ্ডিতের মজলিস গঠন করে এ সম্পর্কে ফায়সালা করার দরকার হতো না এবং বিষয়টি আজও একটি অবোধগম্য রহস্য হয়ে থাকত না।

এবার বান্দার হক সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ আলোচনায়ও দেখা যাবে, এ ক্ষেত্রেও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়া আর সকল নবীর জীবনই প্রায় শূন্য। বুদ্ধদেব তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ত্যাগ করে বনের পথ ধরেন। তারপর তার যে প্রিয় স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, তার এবং একমাত্র পুত্রের সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখেননি। তিনি বন্ধুদের সাহচর্য পরিত্যাগ করেন। দেশ শাসন ও প্রজা পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেন এবং নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করাকেই মানব জীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেন। এমতাবস্থায় এ পৃথিবীর মানব-সমাজে যেখানে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, প্রভু-ভৃত্য, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন এবং বন্ধু-বান্ধব

www.bjilibrary.com

সবাই আছে–সেখানে বুদ্ধের জীবনাদর্শ মানুষের কোন কাজে লাগতে পারে বলে কি কেউ ভাবতে পারে? বুদ্ধের জীবনে কি এমন কোন ব্যাপকতা আছে, যার ফলে তা সংসারত্যাগী ভিক্ষুর সাথে সাথে সংসারবাসী গৃহীর জন্যও সমানভাবে অনুকরণযোগ্য হতে পারে? তাই তাঁর জীবন তাঁর ধর্মানুসারী ব্যবসায়ীদের জন্য তথা ব্যবহারিক জীবনে কোন দিনই অনুসরণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। যদি তাই হতো, তাহলে চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, তিব্বত ও বর্মায় সকল প্রকার শিল্প, রাজনীতি এবং যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য একদিনেই বন্ধ হয়ে যেত এবং কোলাহল মুখরিত জনপদের পরিবর্তে গড়ে উঠত বিপুল তরুশ্রেণী শোভিত নির্জন বনানী-প্রান্তর।

হযরত মূসা আলায়হিস সালামের জীবনের একটি দিক অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তা হচ্ছে তাঁর যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনা। এছাড়া তাঁর আদর্শ অনুসারীদের জন্য পার্থিব অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে তাঁর চরিত্রে কোন পথ-নির্দেশ নেই। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে তাঁর নীতি কি ছিল, সন্ধি ও চুক্তির দায়িত্ব তিনি কিভাবে সম্পাদন করতেন, তিনি কোন কোন হিতকর কাজে নিজের ধন-সম্পদ নিয়োগ করেছিলেন, পীড়িত, এতীম-মুসাফির ও দরিদ্রদের সাথে তাঁর ব্যবহার কিরূপ ছিল, এসব তথ্যের অভাবে হযরত মূসার অনুসারীরা তাঁর জীবনচরিত থেকে কি ফায়দা হাসিল করতে পারে? হযরত মূসার স্ত্রী ছিল, সন্তান ছিল, ভাই ছিল এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনও ছিল। আমাদের আকিদা হচ্ছে এই যে, তাঁদের সবার ব্যাপারে তাঁর নবীসুলভ ব্যবহার সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর বর্তমান জীবনী গ্রন্থগুলিতে আমরা এসব বিষয়ে অনুসরণযোগ্য কোন তথ্য খুঁজে পাই না।

হযরত ঈসা 'আলাইহিস সাল্লামের মা ছিলেন এবং ইঞ্জীলের বর্ণনা মতে ভাই-বোনও ছিল এবং রক্ত-মাংসের পিতাও ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনের ঘটনাবলী থেকে ঐসব আত্মীয়-পরিজনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও ব্যবহারের ধরন প্রকাশ পায় না, অথচ দুনিয়া চিরকাল ঐসব সম্পর্কের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। ধর্মের বৃহত্তর অংশ ঐসব দায়িত্ব পালন করার ওপরই নির্ভরশীল। এছাড়া হযরত ঈসা শাসিতের জীবনযাপন

www.bjilibrary.com

করেছিলেন, তাই তাঁর জীবনচরিত, শাসকসুলভ দায়িত্ব পালনের নজীরশূন্য। তিনি বিয়ে করেননি, তাই তাওরাতের প্রথম অধ্যায়ে যে দু'টি দম্পতির মধ্যে মাতাপিতার চাইতেও অধিক শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে, কেবল এর দ্বারা হযরত ঈসার জীবন পারিবারিক দিক থেকে অনুসরণীয় হতে পারে না। আর যেহেতু দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই বিবাহিত এবং সংসার জীবন যাপন করে, তাই দুনিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী হযরত ঈসার জীবন থেকে পারিবারিক জীবনের কোন পথ-নির্দেশ পেতে পারে না। যিনি কোনদিন গৃহ-সংসার, পুত্র-পরিজন, ধন-সম্পদ, যুদ্ধ-সন্ধি ও বন্ধু-শত্রুর মধ্যকার সম্পর্কের সাথে কোন সংস্রব রাখেননি, তিনি ঐসব বিষয়ে সমগ্র দুনিয়ার জন্য কিভাবে আদর্শ হতে পারেন? আজ যদি দুনিয়া তাঁর জীবনাদর্শ গ্রহণ করে তাহলে কালই সমগ্র দুনিয়ায় কবরের নির্জনতা নেমে আসবে, সমস্ত উন্নতি ও প্রগতির তৎপরতা নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং খ্রিস্টীয় ইউরোপ সম্ভবত এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারবে না।

কর্মজীবন

আদর্শ জীবনের সর্বশেষ মানদণ্ড হচ্ছে কর্মক্ষেত্র। দীনের ব্যবস্থাপক ও ধর্মপ্রবর্তক যে শিক্ষা দান করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে এ শিক্ষার বাস্তবায়ন ও জ্বলন্ত-নমুনা দেখা যাবে এবং তাঁর নিজের কর্মজীবনই তাঁর শিক্ষাকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণিত করবে।

মনোমুগ্ধকর দর্শন, চমৎকার আদর্শ এবং চিত্তহারী বাণী যে-কোন ব্যক্তি যে কোন সময় পেশ করতে পারে। কিন্তু যে বস্তুটি প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে পেশ করতে পারে না, সেটি হচ্ছে বাস্তব কর্ম। মানব চরিত্রের উন্নত মান ও পূর্ণতার প্রমাণ তার উত্তম, নিষ্কলুষ কথা, চিন্তা এবং নৈতিক ও দার্শনিক আদর্শ নয় বরং বাস্তব কর্মজীবনে তার পদক্ষেপ। যদি এ মানদণ্ড কায়েম না করা হয়, তাহলে ভাল-মন্দের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং দুনিয়া কেবল সেসব লোকের আবাসভূমিতে পরিণত হবে, যারা কেবল ফাঁকা বুলি আওড়াতে অভ্যস্ত। এবার আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি যে, লক্ষ লক্ষ নবী ও ধর্মপ্রবর্তকের মধ্যে কে নিজের কর্মজীবনকে এ তুলাদণ্ডে ওজন করার জন্য পেশ করতে পারেন?

www.bjilibrary.com

'তোমার আল্লাহকে নিজের মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাস। তোমার দুশমনকেও ভালবাস। যে তোমার ডান গালে চড় মারে, তার দিকে নিজের বাম গালখানাও ফিরিয়ে দাও। যে তোমাকে বেকার খাটিয়ে এক মাইল নিয়ে যায়, তার সঙ্গে তুমি দুই মাইল যাও। যে তোমার কোটটি চায় তাকে তোমার জামাটিও দিয়ে দাও। তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দাও, তোমার ভাইকে সত্তরবার মাফ কর। আসমানী বাদশাহর রাজ্যে ধনীর প্রবেশ কঠিন।'

এগুলি এবং এ ধরনের আরো অনেক উপদেশ বড়ই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু বাস্তব কর্মের মাধ্যমে যদি এগুলিকে সত্যে পরিণত করা না হয়, তাহলে এগুলি জীবনচরিতে শামিল হয় না, বরং এগুলি নিছক উচ্চাঙ্গের শিষ্ট কথার সমষ্টিতে পরিণত হয়। যে শত্রুকে পরাজিত করতে পারেনি সে কেমন করে ক্ষমার দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে? যার নিজের নিকট কিছুই নেই, সে কেমন করে গরীব-মিসকীন ও এতিমদের দান করতে পারে? যার আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র নেই, সে কেমন করে এদের সম্পর্কে সমগ্র দুনিয়ার জন্য আদর্শ স্থাপন করতে পারে? যে কোনদিন পীড়িতের সেবা ও দেখাশুনা করেনি, সে কেমন করে সে সম্পর্কে উপদেশ দান করতে পারে? যে নিজে কখনো অন্যকে ক্ষমা করার সুযোগ পায়নি, তার জীবন আমাদের মধ্যকার বদমেজাজী ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য কেমন করে আদর্শে পরিণত হতে পারে?

ভেবে দেখুন। সৎ কর্ম দু'প্রকারের ঃ ইতিবাচক ও নেতিবাচক। মনে করুন, কোন পর্বত গুহায় গিয়ে আপনি সারা জীবন বসে রইলেন। তখন মাত্র একথা বলাই ঠিক হবে যে, আপনি কেবল অসৎ কর্ম ও অসৎবৃত্তি থেকে নিজকে রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ আপনি এমন কোন কাজ করেননি যা আপনার জন্য দোষণীয়। কিন্তু এটি কেবল নেতিবাচক কাজ হলো। আপনার কর্মের ইতিবাচক দিকটি কি? আপনি কি গরীবকে সাহায্য করেছেন? জালিমের মুকাবিলায় সত্যকথনে সচেষ্ট হয়েছেন? ক্ষমা, করুণা, দান, মেহমানদারী, সত্যকথন, দয়া, সত্যের সাহায্যের জন্য আগ্রহ, প্রচেষ্টা, সাধনা, কর্তব্য সম্পাদন, দায়িত্ব পালন তথা কর্মজীবনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় নৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন না করে কেবল হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই সেগুলি সৎ কর্মে পরিণত হবে না। সৎ কর্মে কেবল নেতিবাচক দিক নেই বরং বহুলাংশে ইতিবাচক ও বাস্তব কর্মের উপর তা নির্ভরশীল।

www.bjilibrary.com

এ আলোচনা থেকে একটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাস্তব কর্ম জীবন সর্বসমক্ষে প্রকাশিত না হলে কোন জীবনকে কখনো 'আদর্শ জীবন' ও অনুসরণযোগ্য আখ্যা দেওয়া যায় না। কেননা মানুষ উক্ত জীবনে কিসের অনুসরণ করবে? তার কোন কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? আমাদের তো যুদ্ধ-সন্ধি, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য, বিবাহিত-অবিবাহিত, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, বান্দার সাথে সম্পর্ক, শাসক-শাসিত, শান্তি-বিপর্যয়, কোলাহল-নির্জনতা তথা জীবনের প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। কথায় নয়, কাজের দৃষ্টান্ত। কিন্তু একথা বললে মোটেই বাগ্মিতা বা কবিত্ব করা হবে না যে, এ মানদণ্ডেও একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারোর জীবনচরিত টিকবে না।

আমি আজ যা কিছু বললাম, তা পুরোপুরি বুঝে নিন। আমি একথা বলতে চাই যে, আদর্শ জীবন হিসেবে যে মানুষের জীবনকে গ্রহণ করা হবে, এবং যে মানব-চরিত্রকে অন্য মানুষের জন্যে অনুসরণীয় বলে নির্বাচিত করা হবে, তার জীবনচরিতে চারটি বিষয় থাকা প্রয়োজন। এ চারটি বিষয় হলো, ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা, জীবনচরিতের ব্যাপকতা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা এবং সামঞ্জস্যশীল কর্মজীবন। আমি যা বলছি তার অর্থ এ নয় যে, অন্যান্য পয়গম্বরের জীবন তাঁদের যামানায় এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না। বরং আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পরবর্তীকালে তাঁদের যে জীবনচরিত রচিত হয়েছে বা আমাদের নিকট পৌছেছে, তা এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। এ অবস্থাও আল্লাহরই অভিপ্রেত। কেননা এ থেকে একথা প্রমাণিত হবে যে, ঐ নবীগণ বিশেষ যামানা ও বিশেষ জাতির জন্য এসেছিলেন। তাই তাঁদের চরিত্র ও জীবন-বৃত্তান্ত পরবর্তীকালের মানুষের জন্যে সংরক্ষিত থাকার প্রয়োজন ছিল না। একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই কিয়ামত পর্যন্ত এবং সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্যে অনুসরণযোগ্য ও আদর্শরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর চরিত্র ও জীবনের ঘটনাবলী সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী হিসেবে সংরক্ষিত থাকার প্রয়োজন ছিল এবং এটিই নবীদের আগমন পরম্পরা শেষ হবার শ্রেষ্ঠতম, চূড়ান্ত ও সবচাইতে অধিক কার্যকর প্রমাণ।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় বক্তৃতা

ঐতিহাসিক ভিত্তি

www.bjilibrary.com

ঐতিহাসিক ভিত্তি

এ চারটি মানদণ্ডে এবার আমরা ইসলামের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন-চরিতের বিচার করব। সর্বপ্রথম মানদণ্ডটি হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তি। এ বিষয়ে সমগ্র দুনিয়া ঐকমত্য পোষণ করে যে, ইসলাম তার পয়গম্বরের এবং কেবল শুধু পয়গম্বরেরই নয় বরং তার পবিত্র জীবনের সাথে সামান্যতম সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকটি বস্তু ও ব্যক্তির পরিচয় ও বৃত্তান্ত এমনভাবে সংরক্ষণ করেছে যে, আজও তা সমগ্র দুনিয়ার জন্য একটি বিস্ময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়ে আছে।

যাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)-র কথা, কাজ এবং তাঁর জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ লেখা ও সংকলনের কাজ করতেন, তাদেরকে হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী অথবা মুহাদ্দিস ও 'আরবাবে সিয়ার' (জীবনীকার) বলা হয়। সাহাবা (রা), তবে'ঈন (র) এবং পরবর্তী চতুর্থ হিজরীর ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত এ গোষ্ঠীতে শামিল আছেন। সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত বিধিবদ্ধ হবার পর ঐসব বর্ণনাকারীর নাম, পরিচয়, ইতিহাস, জীবন, চরিত্র এবং অভ্যাসও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর তাঁদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি। তাঁদের সম্পর্কে লিখিত ঐ বৃত্তান্তের নাম 'আসমাউর রিজাল'। প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ডক্টর স্প্রেনগার ১৮৫৪ সালে এবং এর পরবর্তীকালেও ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের সাথে জড়িত ছিলেন এবং বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারীও ছিলেন। তাঁর আমলেও তাঁরই স্বকীয় প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে ওয়াসক্রীমারের সম্পদনায় মুসলিম ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর 'মাগাযী' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং সাহাবা চরিত সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজারের 'ইসাবা ফী আহওয়ালিস সাহাবা' মুদ্রিত হয়। ডঃ

www.bjilibrary.com

স্প্রেনগারের দাবী অনুযায়ী[১] তিনিই প্রথম ইউরোপিয়ান লেখক যিনি মূল আরবী গ্রন্থগুলির সহায়তায় 'লাইফ অফ মুহাম্মদ' লিখেছেন[২] এবং বিরোধিতা করেই লিখেছেন। তিনিই ১৮৫৩-৬৪ সালে কলকাতায় মুদ্রিত 'ইসাবার' ইংরেজী ভাষায় লিখিত ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

"দুনিয়ায় এমন কোন জাতি দেখা যায়নি এবং আজও নেই, যারা মুসলমানদের ন্যায় 'আসমাউর রিজালের' বিরাট তথ্যভাণ্ডার আবিষ্কার করেছে। এর বদৌলতে আজ পাঁচ লাখ লোকের বিবরণ জানা যেতে পারে।"

রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবনের শেষ বছর বিদায় হজ্বের সময় উপস্থিত। সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। তাঁদের মধ্য থেকে এগার হাজার ব্যক্তির নাম ও পরিচয় আজ লিখিত আকারে ইতিহাসের পাতায় রক্ষিত আছে। এগুলি বিশেষ করে এ জন্য লিখিত হয়েছে যে, তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ (স)-র কথা, কাজ ও জীবন-বৃত্তান্তের কিছু না কিছু অংশ অন্যের নিকট পৌছিয়েছেন।

অর্থাৎ তাঁরা রেওয়ায়েত বা বর্ণনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। এজন্যই তাঁদের জীবন ঐতিহাসিক ভিত্তিতে যাচাই করার পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

১১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স) ইন্তিকাল করেন এবং প্রায় ৪০ হিজরী পর্যন্ত প্রবীণ নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণ জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবদ্দশায় যে সকল সাহাবা অল্পবয়স্ক ছিলেন, ৬০ হিজরীতেও তাঁরা বিপুল সংখ্যায় জীবিত ছিলেন এবং এ শতক শেষ হবার পর নবুয়তের প্রদীপ থেকে সরাসরি আলোকপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি বাতিই প্রায় নির্বাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন শহরে সর্বশেষ ইন্তিকালকারী সাহাবাগণের নাম ও মৃত্যুবছর নিম্নরূপ ঃ

নাম	শহরের নাম	মৃত্যু সাল
১. আবূ ইমামা বাহেলী (রা)	সিরিয়া	৮৬ হিঃ
২. আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে জুয্আ (রা)	মিসর	৮৬ হিঃ
৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা (রা)	কূফা	৮৭ হিঃ
৪. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা)	মদীনা	৯১ হিঃ
৫. আনাস ইবনে মালিক (রা)	বসরা	৯৩ হিঃ

১. On the origin and progress of writing down historic facts among Musalmans.

২. ১৮৫৪ সালে লিখেছেন এবং এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

এ তালিকায় হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর নাম সর্বশেষে স্থান পেয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-র বিশেষ খাদেম ছিলেন। দশ বছর একাদিক্রমে রাসূলুল্লাহ (স)-র খিদমত করেন এবং ৯৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাবেঈন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের ছাত্রগণের যুগ প্রথম হিজরী থেকে আরম্ভ হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবদ্দশায় তাঁরা জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলেন অথবা তাঁদের বয়স এত অল্প ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-র জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনার সুযোগই তাঁদের হয়নি। যেমন 'আবদুর রহমান ইবনে হারেস (রা) ৩ হিজরীতে, কয়েস ইবনে আবি হাযেম (রা) ৪ হিজরীতে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কিরামের পর তাবেঈগণ দলে দলে মুসলিম বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবন বৃত্তান্ত, হাল-অবস্থা, নির্দেশাবলী ও বিচার-ফয়সালা সম্পর্কিত বিষয়গুলির শিক্ষাদান ও প্রচারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল কত? এর জবাবে আমি ইবনে সাআদের বরাত দিয়ে কেবলমাত্র মদীনার তাবেঈগণের সংখ্যা বিবৃত করছি। প্রথম শ্রেণীর তাবেঈন অর্থাৎ যারা নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণকে দেখেছেন এবং তাঁদের মুখ থেকে বিভিন্ন মাসায়েল ও ঘটনাবলী শ্রবণ করেছেন, তাঁরা সংখ্যায় ১৩৯ জন। দ্বিতীয় শ্রেণীর তাবেঈন অর্থাৎ যারা মদীনায় সাধারণ সাহাবাদেরকে এবং তাঁদের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তাদের সংখ্যা ১২৯। তৃতীয় শ্রেণীর তাবেঈন অর্থাৎ যাঁরা একাধিক বা কোন একজন সাহাবীকে দেখেছেন এবং তাঁর নিকট হাদীস শুনেছেন, তাঁদের সংখ্যা ৮৭। এভাবে তাবেঈগণের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৫। এ সংখ্যা কেবলমাত্র একটি শহরের। এ থেকেই মক্কা মুয়াজ্জমা, তায়েফ, বসরা, কূফা, দামেশক, ইয়ামন ও মিসর প্রভৃতি এলাকার তাবেঈগণের সংখ্যা অনুমান করা যেতে পারে। এঁরা নিজেদের শহরে সাহাবাগণের শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-র কথা ও কাজের প্রচার ও প্রকাশই ছিল এঁদের দৈনন্দিন কাজ। এই সুব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রত্যেক সাহাবী যা কিছু রেওয়ায়েত করেছেন, তার প্রত্যেকটি রক্ষা ও গণনা করা হয়েছে। এ থেকেই আন্দাজ করতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ

www.bjilibrary.com

(স)-র অবস্থা ও বাণীসমূহ সংগ্রহ করার জন্যে কত উন্নত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে নিম্নোক্তগণের রেওয়ায়েত সবচাইতে বেশি।

নাম	হাদীসের সংখ্যা	মৃত্যু
১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা)	৫৩৭৪	৫৯ হিঃ
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	২৬৬০	৬৮ হিঃ
৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)	২২১০	৫৮ হিঃ
৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)	১৬৩০	৭৩ হিঃ
৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)	১৫৬০	৭৮ হিঃ
৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)	১২৮৬	৯৩ হিঃ
৭. হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)	১১৭০	৭৪ হিঃ

উল্লিখিত সাহাবাগণের রেওয়ায়েতই আজ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবনী ও চরিত্রের বৃহত্তম অংশ। এঁদের মৃত্যুর 'তারিখের' প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যাবে যে, এঁরা এত শেষ পর্যায়ে ইন্তিকাল করেছেন, যার ফলে এঁদের নিকট থেকে লাভবান হবার এবং এঁদের রেওয়ায়েতসমূহ কণ্ঠস্থ ও লিপিবদ্ধ করার মত লোকের সংখ্যা অসংখ্য হতে পেরেছে। সে যুগে এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার নামই ছিল 'ইল্‌ম' এবং এটিই ছিল দীন-দুনিয়া উভয়ক্ষেত্রে সম্মান লাভের মাধ্যম। তাই হাজার হাজার সাহাবা যা কিছু দেখেছিলেন ও জেনেছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ (স)-র নির্দেশ بَلِّغُوْا عَنِّىْ 'আমার নিকট থেকে যা কিছু শুনো বা দেখো তা অন্যের নিকট পৌছিয়ে দাও'!) অথবা فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (যে আমাকে দেখেছে ও আমার নিকট থেকে শুনেছে, সে যেন তা তাদের নিকট পৌছিয়ে দেয়, যারা এ থেকে বঞ্চিত) অনুযায়ী নিজেদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনদেরকে শুনাবার ও জানাবার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। এটিই ছিল তাঁদের নিত্যকার জীবনের প্রধানতম কর্ম। তাই সাহাবাগণের পর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন যুবদল এ তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের প্রত্যেককে প্রত্যেকটি ঘটনার কথা হুবহু স্মরণ রাখতে ও কণ্ঠস্থ করতে হতো। সেগুলি বারবার আওড়াতে হতো। প্রতিটি বাক্য ও প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণ করতে হতো। রাসূলুল্লাহ (স)

www.bjilibrary.com

যেখানে নিজের কথা ও কর্মের প্রচারের ওপর জোর দিয়েছেন, সেখানে এ ভীতিও প্রদর্শন করেছিলেন যে, 'যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভ্রান্ত বা মিথ্যা কথা বলবে, তার স্থান হবে জাহান্নামে।' এ ঘোষণার ফলে নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণও কোন হাদীস বর্ণনা করার সময় ভয়ে কম্পিত হতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) একবার রাসূলুল্লাহ (স)-র কোন একটি কথা উদ্ধৃত করেন। তখন তাঁর চোহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি কেঁপে ওঠেন, অতঃপর বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (স) এরূপই বলেছিলেন বা প্রায় এ ধরনের কথাই বলেছিলেন।'

আরবদের স্মরণশক্তি ছিল স্বভাবতই অত্যন্ত প্রখর। তাঁরা শত শত কবিতা মুখে মুখে আওড়াতে পারতেন। উপরন্তু প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে এই যে, মানুষ যে শক্তিকে যত বেশি কাজে লাগায়, সেটি তত বেশি উন্নতি লাভ করে। সাহাবা ও তাবে'ঈগণ স্মৃতিশক্তিকে উন্নতির শেষ শিখরে পৌছিয়ে দেন। তাঁরা এক একটি হাদীস ও এক একটি ঘটনাকে মুখে মুখে শুনে এমনভাবে স্মরণ করে রাখতেন, যেমন আজকের যুগে মুসলমানরা কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করে। এক একজন মুহাদ্দিস কয়েক হাজার ও কয়েক লক্ষ হাদীস মুখে মুখে শুনে কণ্ঠস্থ করতেন এবং স্মরণ রাখতেন, যদিও স্থায়ীভাবে মনে রাখার জন্য পরে লিখে রাখতেন। কিন্তু যতক্ষণ তাঁরা স্মৃতিশক্তির সাহায্যে মুখে মুখে আওড়াতে না পারতেন, ততক্ষণ বিজ্ঞ সমাজে তাঁরা নির্ভরযোগ্য বিবেচনা হতেন না। এ জন্যই তাঁরা নিজেদের লিখিত নোটগুলিকে নিন্দনীয় বিষয়ের মত গোপন করে রাখতেন, যেন কেউ তাঁদের স্মরণশক্তি দুর্বল মনে করতে না পারে।

বন্ধুগণ! কতিপয় প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত ও শিক্ষিত মিশনারী–যাদের মধ্যে স্যার উইলিয়াম মূর ও গোলডজার সবচাইতে অগ্রণী–রাসূলুল্লাহ (স)-র হাদীসগুলির সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার কাজ তার ইন্তিকালের ৯০ বছর পর শুরু হয়েছে বলে এগুলির ত্রুটিহীনতা ও প্রামাণ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমি এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সামনে পেশ করেছি এবং সাহাবায়ে কিরাম কিভাবে বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ রাখতেন, কি পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন, কিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের হাতে এ আমানত সোপর্দ করতেন এসবও বলেছি। এ বর্ণনা থেকে আপনারা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারবেন, এ রেওয়ায়েতসমূহ

www.bjilibrary.com

অনেক পরে সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হলেও এগুলোর ত্রুটিহীনতা ও প্রামাণ্যতার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে না।

সাধারণত তিনটি কারণে সাহাবাগণ হাদীস লিখে রাখা সঙ্গত মনে করেননি।

১. প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (স) কুরআন মজীদ ছাড়া অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, 'আমার নিকট থেকে কুরআন মজীদ ছাড়া আর কিছুই লিখবে না' لَا تَكْتُبُوا عَنِّى غَيْرَ الْقُرْاٰنَ

এর কারণ ছিল এই যে, সাধারণ লোকদের নিকট কুরআন ও অকুরআন মিশ্রিত হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। কাজেই কুরআন যখন মুসলমানদের নিকট পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়ে গেল, তখন শেষ দিকে তিনি নিজেই কোন কোন সাহাবাকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেন। তবুও অধিকাংশ সাহাবা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এগুলি লিখে রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

২. সাহাবাগণ আশঙ্কা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-র বাণীসমূহ লিখিত হবার পর জনগণ আর সেগুলির প্রতি তেমন আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা অনুভব করবে না এবং লিখিত সংকলনের উপস্থিতিতে সেগুলি কণ্ঠস্থ করার ও স্মরণ রাখার জন্যে পরিশ্রম করতে উদ্যোগী হবে না। এ আশঙ্কা শতকরা একশো ভাগ নির্ভুল প্রমাণিত হয়। বইয়ের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পেয়েছে বক্ষ-সংরক্ষিত জ্ঞান ততই হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু এ প্রসঙ্গে তাঁদের এও ধারণা ছিল যে, যোগ্য-অযোগ্য সকলেই এসব সংকলন হাতে নিয়ে আলেম হবার দাবী করবে। পরবর্তীকালে এও সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

৩. তৃতীয় কারণ ছিল এই যে, তখনও পর্যন্ত আরব দেশে কোন বিষয় লিখে নিয়ে তারপর কণ্ঠস্থ করাকে দোষণীয় মনে করা হতো। লোকেরা এটিকে তাদের দুর্বল স্মরণশক্তির ঘোষণা মনে করতো। তাই কোন কথা লিখে রাখলেও তারা তা লুকাতে বাধ্য হতো!

মুহাদ্দিসগণ মনে করতেন, লিখে মনে রাখার চাইতে কণ্ঠস্থ করা অধিকতর সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা। লিখিত স্মারককে অন্যের হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। কেউ তার মধ্যে কোন প্রকার যোগ-বিয়োগ করতে পারে, এ আশঙ্কা সব সময় থাকে। কিন্তু যে কথা হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে যায়, তার মধ্যে কোন রদবদল সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

আজ প্রথমবার আপনাদের মজলিসে এবং সর্বপ্রথম আপনাদেরই মজলিসে একথা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, শত বছর না নব্বই বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (স)-র বাণী ও কার্যাবলীকে মৌখিক বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ বিভ্রান্তির আসল কারণ হচ্ছে এই যে, ইমাম মালিক (র)-এর মুয়াত্তাকে হাদীসের প্রথম কিতাব এবং ইবনে ইসহাকের 'আল-মাগাযী'কে যুদ্ধ ও নবীচরিত সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ মনে করা হয়। এ লেখকদ্বয় সমকালীন ছিলেন। এঁরা যথাক্রমে ১৭৯ ও ১৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাই হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিককেই হাদীস ও জীবনচরিত সংকলনের প্রারম্ভিক যুগ মনে করা হয়। অথচ এর অনেক আগে হাদীস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) ১০১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি নিজেও বড় আলেম ছিলেন এবং মদীনার গভর্নর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৯৯ হিজরীতে তিনি খিলাফত লাভ করেন। তিনি নিজের খিলাফত আমলে মদীনা মুনাওয়ারার কাজী এবং হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযমকে এই বলে নির্দেশ দেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও হাদীস সংকলন এবং লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু করে দাও। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, 'ইলম ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' এ ঘটনাটি 'তা'লীমাতে বুখারী' 'মুয়াত্তা' এবং 'মুসনাদে দারামী' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। খলীফার এ নির্দেশটি প্রতিপালিত হয় এবং রাসূলুল্লাহ (স)-র হাদীস ও সুন্নাতসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাজধানীতে প্রেরণ করা হয়। (দ্রষ্টব্যঃ 'মুখতাসার জামে-বায়ানুল ইল্‌ম লি-ইবনে আবদুলবার,' ৩৮ পৃষ্ঠা মিসরে মুদ্রিত) এ কাজের জন্য আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযমকে নির্বাচিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে ইমাম ছিলেন এবং ইল্‌মের কেন্দ্রভূমি মদীনার কাজী ছিলেন। কিন্তু এ ছাড়াও এ নির্বাচনের উপযুক্ততার কারণ ছিল এই যে, তাঁর খালা আম্মারাহ হযরত আয়েশা (রা)-র প্রধানতম শিষ্য ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (র)-র নিকট থেকে যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, তা সমস্তই আবূ বকর ইবনে হাযমের নিকট পূর্ব হতেই সংগৃহীত ছিল। তাই হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁকে বিশেষ করে হযরত আম্মারার রেওয়ায়েতগুলি লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ্ (স)-র আমলের লিখিত হাদীসসমূহ

আরও অগ্রসর হয়ে আমি দাবী করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-র যুগেই হাদীস ও সুন্নাত এবং তাঁর নির্দেশাবলী ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি একটি ভাষণ দেন। বুখারী শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, আবূ শাহ (রা) নামক জনৈক ইয়ামনী সাহাবীর আবেদনক্রমে তিনি ভাষণটি লিখে তাঁকে সোপর্দ করার নির্দেশ দেন। (দ্রষ্টব্যঃ বাবু কিতাবাতিল ইল্‌ম)। রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন দেশের শাসকদের নামে যেসব পত্র পাঠান, তা-লিখিত আকারে ছিল। মিসরের বাদশাহ মুকাওকাসের নামে তিনি পত্র পাঠান, দশ বারো বছর আগে মিসরের একটি ঈসায়ী গির্জায় রক্ষিত একটি পুরাতন কিতাবের মলাটের সঙ্গে তা পাওয়া গেছে। অনুমান করা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) যে পত্রটি লিখিয়েছিলেন এটা সে মূল পত্র। এর আলোকচিত্র যত্রতত্র পাওয়া যায়। এটি প্রাচীন আরবী বর্ণমালায় লিখিত এবং হাদীস গ্রন্থসমূহে যে সব শব্দ সহকারে এ পত্রটি উল্লিখিত হয়েছে, উক্ত পত্রের মোহরে নামের অক্ষর ও শব্দগুলি অবিকল ঐরূপই দেখা যায়। এ বিষয়টি ইসলামী রেওয়ায়েতের নির্ভুলতার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) ছাড়া কারোর আমার চাইতে অধিক সংখ্যক হাদীস স্মরণ নেই। আমার চাইতে তাঁর নিকট অধিক সংখ্যক হাদীস সংরক্ষিত থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-র নিকট যা শুনতেন সব লিখে রাখতেন। কিন্তু আমি লিখে রাখতাম না।' (বুখারী ঃ বাবু-কিতাবাতিল ইল্‌ম) আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে উল্লিখিত হয়েছে যে, কতিপয় সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) কখনো ক্রুদ্ধ অবস্থায় আবার কখনও প্রফুল্ল অবস্থায় থাকেন, অথচ তুমি সকল অবস্থায়ই সবকিছু লিখে রাখো'। এ কথার পর আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) লেখা বন্ধ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-র নিকট বিষয়টি বললেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, 'তুমি লিখতে থাক, এ স্থান থেকে যা বের হয় তা সত্য হয়ে থাকে।' (আবূ দাউদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) তাঁর এ সংকলনের নাম রাখেন 'সাদেকা'। (ইবনে সা'আদ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১২৫) তিনি বলতেন ঃ 'মাত্র দুটি জিনিসের

www.bjilibrary.com

জন্য আমি জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষা করেছি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই 'সাদেকা' এবং সাদেকা এমন একটি কিতাব যা রাসূলুল্লাহ (সা)-র পবিত্র মুখ থেকে শুনে শুনে আমি লিখেছি।– (দারামী ঃ ৬৯ পৃষ্ঠা) মুজাহিদ বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট কিতাব রক্ষিত দেখেছি। জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি কিতাব? বললেন, সাদেকা। এটি রাসূলুল্লাহ্ (স)-র মুখ থেকে শুনে শুনে আমি লিখেছি। এ কিতাবে আমার ও রাসূলুল্লাহ (স)-র মাঝখানে আর কেউ নেই। (ইবনে সা'আদ ঃ ২-২-১২৫) বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, মদীনায় হিজরত করার কিছুকাল পর রাসূলুল্লাহ্ (স) মুসলমানদের আদমশুমারী করে তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেন। উক্ত তালিকায় পনেরো শো' নাম ছিল। (বাবুল জিহাদ) বর্তমান বুখারী শরীফের দুপৃষ্ঠা ব্যাপী যাকাত সম্পর্কিত যেসব নির্দেশ, বিভিন্ন বস্তুর উপর দেয় যাকাত এবং তার হার সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ (স)-ই লিখিত আকারে দায়িত্বশীল কর্মচারীদের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট আবূ বকর ইবনে অমর ইবনে হাযমের খান্দানে এবং আরও কিছু সংখ্যক লোকের নিকট এ নির্দেশনামা মওজুদ ছিল। (দারে কুত্নী, কিতাবুয যাকাত ঃ ২০১ পৃষ্ঠা) যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-র জন্ম থেকে এতদ্সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীও লিখিত আকারে ছিল। (দারে কুত্নী ঃ ২০৪ পৃষ্ঠা) হযরত আলীর নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-র বাণী সম্বলিত একখানা পুস্তিকা ছিল। তিনি ওটাকে তার তরবারির খাপের ভেতর রেখে হিফাজত করতেন। এর মধ্যে কতিপয় হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-র নির্দেশ লিখিত ছিল। কিছু সংখ্যক লোক ওটা দেখার খায়েশ করায় তিনি তরবারির খাপ থেকে ওটা বের করে সকলকে দেখান। (বুখারী, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১০৮৪, ১০৩০) হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (স)ও কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের মধ্যে যে চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়, তা হযরত আলী (রা) লিখেছিলেন। এর এক কপি রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজের কাছে রাখেন। (ইবনে সাআদ, মাগাযী ৭১ পৃঃ) আমর ইবনে হাযম (রা)-কে ইয়ামনের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) একটি লিখিত নির্দেশনামা তাকে সোপর্দ করেন। তাতে ফরযসমূহ, সাদকা, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সম্পর্কে বহু নির্দেশ ছিল। (কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ)

www.bjilibrary.com

আবদুল্লাহ্ ইবনে হাকীম (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ (স)-র যে পত্র পৌঁছেছিল, তাতে মৃত প্রাণী সম্পর্কে লিখিত হিদায়ত ছিল। (মু'জামে সাগীর, তাবরানী, ২১৭) ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-র দরবার থেকে বিদায় নিয়ে যখন স্বদেশ হাদারামাউত রওয়ানা দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাকে বিশেষভাবে একটি পয়গাম পাঠিয়ে দিলেন। তাতে নামায, রোযা, সুদ, শরাব ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর নির্দেশ ছিল। (তাবরানী, সাগীর, ২৪২ পৃষ্ঠা) একবার হযরত ওমর (রা) এক জনসমাবেশে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রসুলুল্লাহ্ (স) স্বামীর 'দীয়াত' (ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য অর্থ-সম্পদ) থেকে স্ত্রীকে কত পরিমাণ দান করেছেন তা কি কারোর জানা আছে? দিহাক ইবনে সুফিয়ান দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'আমি জানি, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমার নিকট এটি লিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন।' (দারে কুতনী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর খিলাফত আমলে (৯৯হিঃ-১০১হিঃ) সদকা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ (স)-র ফরমান তালাশ করার জন্যে মদীনাবাসীদের নিকট দূত পাঠালে আমর ইবনে হাযমের খান্দানে তা পাওয়া যায়। (দারে কুতনী, ৪৫ পৃষ্ঠা) রাসূলুল্লাহ্ (স) ইয়ামনবাসীদের নিকট যে লিখিত নির্দেশ পাঠান তাতে বলা হয়েছিল যে, একমাত্র পাক-পবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে, গোলাম ক্রয় করার পূর্বে তাকে আযাদ করা যেতে পারে না এবং বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া যায় না। (দারামী, ২০৩ পৃষ্ঠা) হযরত মুআয (রা) সম্ভবত ইয়ামন থেকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র নিকট লিখিত পত্র মারফত শাক-সব্জির যাকাত আছে কিনা জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) লিখিত আকারেই জবাব দেন ঃ 'শাক-সব্জির যাকাত নেই।' (দারেকুতনী, ৪৫ পৃষ্ঠা) মারওয়ান খুতবায় বর্ণনা করেন যে মক্কা হারেমের মধ্যে শামিল। রাফে ইবনে খাদীজ সাহাবী (রা) চীৎকার করে বলেন ঃ 'এবং মদীনাও হারেমের মধ্যে শামিল। বিষয়টি আমার নিকট লিখিত আকারে মওজুদ আছে। তুমি চাইলে আমি তা পড়ে শুনাতে পারি।' (মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা) দিহাক ইবনে কায়েস নোমান ইবনে বশীর সাহাবীকে লেখেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) জুমআর নামাযে সূরায়ে জুমআ ছাড়া আর কোন সূরা পড়তেন? তিনি জবাবে লেখেন ঃ هل اتاك পড়তেন। (মুসলিম, ৩২৩) হযরত উমর (রা)

www.bjilibrary.com

উত্‌বা ইবনে ফারকাদকে পত্র লেখেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা)

এ সমস্ত নির্দেশ রাসূলুল্লাহ্ (স) বিভিন্ন লোককে লিখিয়ে দেন, অথবা তাদের নিকট পাঠান। আমাদের নিকট এমন সব দলীল-প্রমাণ আছে, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র নির্দেশ ও সুন্নাতসমূহকে পুস্তকাকারে সংকলন করেন, অথবা সংকলন করার প্রচেষ্টা চালান। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর খিলাফত আমলে হাদীসের একটি সংকলন প্রস্তুত করান, তারপর সেটি পছন্দ না হওয়ায় নষ্ট করে দেন। (তাযকিরাতুল হুক্কাম) হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফত আমলে এ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিবেচনা করেন এবং এ ব্যাপারে অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। কিন্তু তারপর তিনি আর অগ্রসর হতে সাহস করেননি। এইমাত্র আপনারা শুনেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-র অনুমতিক্রমে একটি পুস্তক রচনা করেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। বহু লোক এ পুস্তকটি দেখতে আসতো এবং তিনি তা লোকদেরকে দেখাতেন। (তিরমিযী, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) হযরত আলী (রা)-র ফতওয়াসমূহের অধিকাংশই লিখিত আকারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর খিদমতে হাযির করা হয়। (মুসলিম ভূমিকা) হয়রত আবদূল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতসমূহের বিভিন্ন লিখিত সংকলন ছিল। কতিপয় তায়েফবাসী তাঁর এমনি একটি সংকলন তাঁকে পড়ে শুনাবার জন্য হাযির করে। (কিতাবুল ইলাল, তিরমিযী, ৬৯১ পৃষ্ঠা) সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। (দারামী, ৬৯ পৃষ্ঠা) 'আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা)-এর পুস্তক 'সাদেকা' তাঁর প্রপুত্র আমর ইবনে শোআইবের নিকট মওজুদ ছিল এবং তিনি তাঁর দাদার কিতাব দেখে রেওয়ায়েত করতেন বলে তাকে দুর্বল মনে করা হত। তিনি নিজে হাফেজ ছিলেন না। (তাহযীব, ৮-৪৯) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতসমূহ সংকলন করেন ওহাব তাবেঈ। এটি ইসমাঈল ইবনে আবদুল করীমের নিকট রক্ষিত ছিল এবং তাকে এজন্যে দুর্বল মনে করা হতো। (তাহযীব, ১ম খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতসমূহের দ্বিতীয় সংকলন প্রণয়ন করেন সুলায়মান ইবনে কায়েস ইয়াশকারী এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ও

www.bjilibrary.com

তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত আবুয যুবাইর। আবূ সুফিয়ান ও শা'বী হযরত জাবের (রা)-এর পুস্তকটি তাঁর নিজ মুখেই শ্রবণ করেন। (তাহযীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২১১পৃষ্ঠা) সুমরাহ ইবনে জুনদুব (রা)-এর নিকট থেকে তাঁর পুত্র সুলায়মান একটি হাদীস পুস্তক রেওয়ায়েত করেন এবং তাঁর নিকট থেকে রেওয়ায়েত করেন তাঁর পুত্র হাবীব। (তাহযীবুত তাহযীব, ৪–১৯৮) হযরত আবু হুরায়রা (রা)–যাঁর চাইতে অধিক সংখ্যক হাদীস সাহাবাগণের মধ্যে আর কেউ কণ্ঠস্থ করেননি–তার কিছুসংখ্যক রেওয়ায়েত হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ সংকলন করেন। হাদীস শাস্ত্রে 'সহীফায়ে হাম্মাম' নামে পরিচিত এ সংকলনটি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে ৩১২ থেকে ৩১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তা উদ্ধৃত করেছেন। বশীর ইবনে তাহীক হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র নিকট তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ শ্রবণ করে সংকলন করেন। অতঃপর তা অন্যের নিকট শুনাবার জন্যে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করেন। (কিতাবুল ইলাল, তিরমিযী, ৬৯১ পৃষ্ঠা ও দারামী, ৬৮ পৃষ্ঠা) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একবার এক ব্যক্তিকে তার গৃহে আহবান করে বিভিন্ন হাদীস দেখান এবং বলেন, এ লিখিত হাদীসগুলি আমি রেওয়ায়েত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন যে, সেগুলি তার হাতের নয় বরং অন্যের হাতের লেখা ছিল। (ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা)

অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে হযরত আনাস (রা)-ও অন্যতম। তিনি নিজের পুত্রদের বলতেন ঃ 'হে আমার সন্তানগণ! ইল্‌মকে লিখিত আকারে সংরক্ষিত কর।' (দারামী, ৬৮) তাঁর ছাত্র আব্বান তাঁর সম্মুখে বসে তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। (দারামী, ৬৮) সালমা নাম্নী জনৈকা মহিলা বলেন যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র খাদেম আবু রাফে (রা)-র নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-র কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করতে দেখেছেন। (ইবনে সা'আদ ২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়, ১২৩ পৃষ্ঠা) ওয়াকেদী প্রথম যুগের নবীচরিত রচয়িতাগণের মধ্য থেকে একজনের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আম্মান প্রধান মানযার ইবনে শাবীর নামে রাসূলুল্লাহ্ (স) যে পত্র পাঠান, তা তিনি ইবনে আব্বাসের কিতাবের সঙ্গে দেখেছেন। (যাদুল মা'আদ, ২–৫৭) ইবনে যুবাইর বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা লিখে খলীফা আবদুল মালিকের নিকট পাঠান। (তাবারী, ১২২৫)

www.bjilibrary.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-র বিশেষ খাদেম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-র দরবারে তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। তাঁর অভিযোগ ছিল ঃ লোকেরা আমার নিকট এসে শুনে যায়–অতঃপর তা লিখে রাখে, অথচ আমি কুরআন ছাড়া অন্য কোন জিনিস লেখা জায়েয় মনে করি না। (দারামী, ৬৭) সা'ঈদ ইবনে জুবাইর তাবে'ঈ বলেন ঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট রাত্রে রেওয়ায়েত শুনতাম এবং মোটা চাদরের গায়ে তা লিখে রাখতাম। সকালে আবার তা পরিষ্কার করে লিখতাম। (দারামী, ৬৯) হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা)-এর নিকট বসে লোকেরা তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। (দারামী, ২৯) নাফে ৩০ বছর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর খিদমত করেন। তিনি নিজের উপস্থিতিতে লোকদেরকে লেখাতেন। (দারামী, ৬৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পুস্তক বের করে আনেন এবং কসম খেয়ে বলেন, এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ স্বহস্তে লিখেছেন। (জামে', ১৭) সা'ঈদ ইবনে জুবাইর বলেন ঃ কোন কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হত, আমরা সেগুলি লিখতাম, অতঃপর সেগুলি লুকিয়ে রেখে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর নিকট হাযির হতাম এবং তাঁকে মতভেদমূলক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম। যদি তিনি আমাদের লিখিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারতেন তাহলে তাঁর ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যেত। (জামে', ৩৩) আস'ওয়াদ সাবে'ঈ বলেন ঃ আমি ও আলকামা একটি পুস্তিকা (সহীফা) পেলাম। সেটি নিয়ে আমরা ইবনে উমর (রা)-এর নিকট আসলাম। তিনি সেটি নষ্ট করে দিলেন। (জামে', ৩৩) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ছিলেন ওহী লেখক। তিনিও রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করতে সম্মত ছিলেন না। তাই মারওয়ান একটা কৌশল করলেন। তিনি একজন লেখককে পর্দার পেছনে বসিয়ে রাখলেন, যেন যায়েদ ইবনে সাবেতের বর্ণনা তাঁর অজ্ঞাতে লিখে ফেলেন। (জামে', ৩৩) হযরত মু'আবিয়া (রা)-ও অনুরূপ কৌশলে তাঁর একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি তা অনুমান করতে পেরে জোরপূর্বক উক্ত লেখা নষ্ট করে দেন। (আহমদ, ৫–১৮২)

www.bjilibrary.com

বন্ধুগণ! সম্ভবত নীরস ঘটনাপঞ্জী ও ব্যক্তিবর্গের নাম আপনাদের নিকট ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন যে এখন আমরা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছি, যেখান থেকে সোজা ও সুস্পষ্ট পথ দেখা যাচ্ছে। এ উদ্ধৃতিগুলির মাধ্যমে আমি এ কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি যে, লিখিত বস্তু যদি দুনিয়ায় বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হতে পারে, তাহলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স)-র যুগেও সাহাবায়ে কিরাম স্বহস্তে তা লিখেছেন এবং পরবর্তীগণের জন্য তাঁদের এ রচনাগুলি সংরক্ষণ করে গেছেন। পরবর্তীগণও নিজেদের কিতাবসমূহে তা সংযোজন করেছেন। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সাহাবায়ে কিরামের জীবদ্দশায়ই তাবেঈগণ দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ প্রত্যেকের নিকট থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র প্রত্যেকটি বাণী, কাজকর্ম এবং তাঁর সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী, হিশাম ইবনে উরওয়া, কায়েস ইবনে আবী হাযেম, আতা ইবনে আবী রিবাহ, সা'ঈদ ইবনে যুবাইর, আবুয্ যানাদ প্রমুখ হাজার হাজার তাবে'ঈ বিভিন্ন এলাকা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করার জন্য জীবনপাত করে গেছেন এবং এভাবে আমাদের সম্মুখে সেগুলি স্তূপীকৃত করেছেন। হাদীস ও সীরাতশাস্ত্রের (জীবনী) অন্যতম ইমাম শিহাব যুহরী রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন। আবুয্ যানাদ বলেন ঃ আমরা কেবল হালাল ও হারাম সম্পর্কিত বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করতাম। আর যুহরী যা কিছু শুনতেন, সবই লিপিবদ্ধ করতেন (জামে' ৩৭)। ইবনে কাইসান বলেন ঃ আমি ও যুহরী ছাত্রাবস্থায় একসঙ্গে থাকতাম। আমি বললাম, আমি কেবল সুন্নাতগুলি লিখব। তাই শুধু রাসূলুল্লাহ্ (স)-র সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয় আমি লিখে নিতাম। যুহরী বলল, সাহাবাগণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিও লিখো, কেননা সেগুলিও সুন্নাত। আমি বললাম-ওগুলি সুন্নাত নয়, এ জন্য আমি তা লিখিনি, কিন্তু সে লিখেছে। ফলে দেখা গেল, সে সফলকাম হয়েছে। আর আমি হয়েছি ব্যর্থ (ইবনে সা'আদ, ২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়, ১৫৫ পৃষ্ঠা)। শত শত তাবে'ঈ এসব বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম যুহরী একজন। কেবল তার একার রচনাবলীর এত বিরাট স্তূপ গড়ে ওঠে যে, ওলীদ ইবনে ইয়াজীদের হত্যার

www.bjilibrary.com

পর যুহরীর এ রচনাবলী কয়েকটি পশুর পিঠে চাপিয়ে কোষাগার থেকে বাইরে আনা হয়েছিল।

ইমাম যুহরী ৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইন্তিকাল করেন ১২৪ হিজরীতে। তিনি কুরাইশ বংশীয় ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-র বাণী ও জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করার জন্য যে শ্রম ও সাধনা করেছেন তা অনুমান করার জন্যে ঐতিহাসিকগণের এ একটি বর্ণনাই যথেষ্ট যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারার প্রত্যেকটি আনসারের গৃহে যেতেন। যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ এমনকি পর্দানশীন মহিলাগণের নিকট গিয়েও রাসূলুল্লাহ (স)-র বাণী ও জীবনের ঘটনাবলী জিজ্ঞেস করে লিপিবদ্ধ করতেন (তাহযীর, তর্জমায়ে যুহরী)। তখন অসংখ্য সাহাবা জীবিত ছিলেন। যুহরীর ছাত্রদের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ্ (স)-র কথা, কাজকর্ম ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণ, লেখা শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, প্রচার এবং প্রকাশনার কাজে রাতদিন মশগুল থাকতেন। এটিই তাঁদের জীবনের একমাত্র কাজ ছিল। এ ছাড়া দুনিয়ার আর সব কাজের সঙ্গে তাঁরা সম্পর্ক ছেদ করে রেখেছিলেন।

বিভ্রান্তির প্রধানতম কারণ হচ্ছে এই যে, সাধারণ লোকেরা মনে করে হাদীস ও নবীচরিত সংকলন ও রচনার কাজ তাবে'ঈগণ শুরু করেন। আর তাবে'ঈ তাদেরকে বলে, যাঁরা সাহাবাগণকে দেখেছেন এবং তাঁদের নিকট শিক্ষালাভ করেছেন। উপরন্তু প্রায় একশ বছর পর্যন্ত ছিল সাহাবাগণের যামানা। অর্থাৎ তাবে'ঈগণের যামানা যেমন শুরু হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র একশ বছর পর এবং অনুরূপভাবে হাদীস ও নবীচরিত সংকলন ও প্রণয়নের কাজও যেন একশ বছর পরই শুরু হয়েছে। অথচ এ ধারণা পুরোপুরিই ভুল। কেননা তাবে'ঈ তাদেরকে বলা হয়, যারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেননি, কিন্তু সাহাবাগণকে দেখেছেন এবং তাঁদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-র যুগেও অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। অথবা রাসূলুল্লাহ্ (স)-র যামানার শেষের দিকে তাঁদের জন্ম হয়েছে, তাই তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। অথবা তাঁর ইন্তিকালের (রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী) পর জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁরা সবাই তাবে'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তাবে'ঈগণের যুগ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবদ্দশায়ই

www.bjilibrary.com

কমপক্ষে ১১ হিজরী থেকে শুরু। সুতরাং যে কাজ ১১ হিজরী থেকে শুরু হয়েছে, সে সম্পর্কে এ কথা বলা যেতে পারে যে, তাবে'ঈগণ এ কাজ শুরু করেছেন। তাবে'ঈগণের কার্যারম্ভের জন্য প্রত্যেকটি সাহাবীর দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ অপরিহার্য নয় এবং শত বছর অতিক্রান্ত হবারও কোন প্রয়োজন নেই। শত বছর পর তাবে'ঈগণের যুগও তো শেষ সীমান্তে এসে পৌঁছে এবং তারপর তাবে'ঈ হবার সৌভাগ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেননা তখন সাহাবাগণের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং সাহাবাগণকে দেখার ফলে লোকেরা তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত হতো। মোটকথা আমার এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণ হবে যে, হাদীস ও নবীচরিত সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ একশ বছর পর মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয়েছে—এ কথা বলা একটি বিরাট অজ্ঞতার পরিচায়ক।

আসলে মুসলমানদের মধ্যে সুন্নাত ও জীবনচরিত সংগ্রহ এবং তথ্য সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার কাজ তিন পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যেক শহরে সংগৃহীত তথ্যাবলী একত্র করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সংগৃহীত তথ্যাবলী একত্র করা হয়েছে এবং সেগুলিই বর্তমানে পুস্তকাকারে আমাদের কাছে রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের যুগটি সম্ভবত একশ হিজরী পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায়ের যুগটি ১৫০ হিজরী থেকে তৃতীয় শতকের পরও কিছুকাল বর্তমান ছিল। প্রথম যুগটি ছিল সাহাবা ও নেতৃস্থানীয় তাবে'ঈগণের। দ্বিতীয় যুগটি ছিল তাবয়ে-তাবে'ঈগণের এবং তৃতীয় যুগটি ছিল ইমাম বুখারী (র), ইমাম মুসলিম (র), ইমাম তিরমিযী (র), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ ব্যক্তিদের। প্রথম যুগের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব দ্বিতীয় যুগের কিতাবগুলিতে স্থান পেয়েছে এবং দ্বিতীয় যুগের কিতাবগুলির যাবতীয় বিষয়বস্তু তৃতীয় যুগের কিতাব-সমূহে লিপিবদ্ধ হয়েছে। উপরন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের সমস্ত গ্রন্থসম্পদ আজ হাজার হাজার পাতায় আমাদের নিকট মওজুদ আছে। আর এগুলিই ইতিহাসের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের সমষ্টি। এর চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য তথ্য ইতিহাসের ভাণ্ডারে আর নেই।

হযরত আল্লামা শিবলী নোমানী (র)-র ভাষায় বলা যায় ঃ 'দুনিয়ার অন্যান্য জাতি যখন এ ধরনের মৌখিক রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করার সুযোগ

www.bjilibrary.com

পেয়েছে, অর্থাৎ কোনো যুগের অবস্থা যখন দীর্ঘকাল পর লিখে রাখার দরকার হয়েছে, তখন সব রকমের কিংবদন্তি, প্রচলিত গাল-গল্প, উড়ো খবর, গুজব সবকিছুই নির্বিবাদে কাগজের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করেছে। এমন কি এসব ঘটনা বর্ণনাকারীদের নাম-নিশানাও পাওয়া যায় না। আর এসব ক্ষেত্রে বিশেষ করে গুজবগুলির মধ্য থেকে এমন সব ঘটনা নির্বাচন করা হয়, যেগুলি আন্দাজ-অনুমানের সাথে খাপ খায়। কিছুকাল পর এসব গাল-গল্প চমৎকার ইতিহাসরূপে পরিগণিত হয়। ইউরোপের অধিকাংশ রচনার ভিত্তি এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

'কিন্তু মুসলমানরা জীবনচরিত রচনার যে মানদণ্ড কায়েম করেছে তা এদের তুলনায় অনেক উচ্চপর্যায়ের ছিল। তার প্রথম নীতি ছিল এই যে, কোন ঘটনা বর্ণনা করার কালে এমন ব্যক্তির নিজস্ব ভাষায় তা বর্ণিত হতে হবে, যে ব্যক্তি নিজে ঐ ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। আর যদি বর্ণনাকারী নিজে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি সরাসরি ঘটনায় শরীক ছিল তার নিকট থেকে ঘটনার ক্রমানুসারে বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও অনুসন্ধান চালাতে হবে যে, ধারাবাহিক বর্ণনায় যে সকল বর্ণনাকারীর নাম উল্লিখিত হয়েছে তারা কারা ও কোন ধরনের লোক? তাদের কাজ-কারবার ও আচার-ব্যবহার কেমন ছিল? জ্ঞান-বুদ্ধি কতটুকু ছিল? নির্ভরযোগ্য কিনা? সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞানের অধিকারী ছিল, না গভীর জ্ঞানসম্পন্ন? শিক্ষিত ছিল, না অশিক্ষিত? এ খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। কিন্তু শত শত হাজার হাজার মুহাদ্দিস এ তথ্যগুলি উদ্ধার করার জন্য তাঁদের জীবনপাত করে গেছেন। তাঁরা শহরে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বর্ণনাকারীদের সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁদের যাবতীয় হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করেছেন এবং এ সম্পর্কে পইপই করে বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এসব অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা 'আসমাউর রিজাল'-এর বিরাট শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। এর ফলে কমপক্ষে একলক্ষ লোকের জীবনবৃত্তান্ত জানা যায়।'

এ তো ছিল কেবলমাত্র 'রেওয়ায়েত' এবং ঘটনার বর্ণনা সম্পর্কিত ব্যাপার। এছাড়াও তাঁরা যাচাই করার নীতি এবং 'দেরায়েত' অর্থাৎ যুক্তিপ্রজ্ঞা ও প্রমাণের কষ্টিপাথরে রেওয়ায়েতগুলিকে পরখ করার জন্য পৃথক নীতি-নিয়ম নির্ধারণ করেছেন এবং এ পন্থায় কিভাবে

www.bjilibrary.com

রেওয়ায়েতগুলিকে নির্ভুল বা ত্রুটিশূন্য প্রমাণ করা যেতে পারে, তাও তাঁরা ঠিক করেছেন। বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে যাচাই ও অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁরা এত বেশি সততা ও সত্যবাদিতার আশ্রয় নিয়েছেন যে, তাঁদের কার্যাবলী আজ ইসলামের জন্য গর্বের সম্পদে পরিণত হয়েছে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন সব পরাক্রমশালী খলীফা এবং আমীরও ছিলেন, যাঁদের নামে মানুষ কেঁপে উঠত। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত নির্ভীকতার সাথে সকলের পর্দার ভেতর উঁকি মেরেছেন এবং এ ব্যাপারে যে যতটুকু মর্যাদা লাভের অধিকারী, ঠিক ততটুকু মর্যাদা তাঁদেরকে দান করেছেন। ইমাম ওকা'য় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন সরকারী অর্থসচিব। তাই তিনি নিজে যখন পিতার নিকট থেকে শুনে রেওয়ায়েত করেন, তখন তাঁর সমর্থনে অন্য কোন বর্ণনাকারীর নামও অবশ্যি উল্লেখ করেন। অর্থাৎ একা তাঁর পিতার বর্ণনা কখনো গ্রহণ করতেন না। এ সর্তকতা ও সত্যবাদিতার কি কোন তুলনা আছে? (তাহযীবুত তাহযীব, ১১শ খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠা) মাসউদী ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। ১৫৪ হিজরীতে জনৈক ইমাম মু'আয ইবনে মু'আয দেখেন যে, কিছু বর্ণনা করতে হলে তাঁকে লিখিত হাদীসের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়। তিনি (মুআয) সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্মৃতিশক্তির ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেন। (তাহযীবুত তাহযীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা) এই মুআয ইবনে মুআযকে এক ব্যক্তি দশ হাজার দীনার (যার মূল্য বর্তমানে দশ হাজার গিনির চাইতেও অধিক) কেবল-মাত্র এজন্যে দিতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন এক ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য কিছুই না বলেন অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে যেন নীরব থাকেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে আশরফীর থলে ঠেলে দিয়ে বললেন ঃ 'আমি কোন সত্যেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারি না।' দুনিয়ার ইতিহাস কি এর চাইতে অধিক সততার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে?

এর চাইতেও বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এসব কাঁচা-পাঁকা ভুল ও নির্ভুল, শক্তিশালী ও দুর্বল এবং গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহের বিরাট স্তূপ আজও বর্তমান আছে। এবং আজও পূর্বোল্লিখিত নীতিসমূহের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি রেওয়ায়েতের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা করা যেতে পারে এবং ভেজাল ও নির্ভেজাল পুনরায় পৃথক করা সম্ভব হতে পারে।

www.bjilibrary.com

বন্ধুগণ! এই নীরস অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি। রাসূলুল্লাহ (স)-র পবিত্র জীবনের ঐতিহাসিক দিকটি এখন অনেকটা আপনাদের সম্মুখে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবনের যে সমস্ত ঘটনা সংগৃহীত হয়েছে, তার উৎস এবং সেগুলি কিভাবে সংযোজিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা এখন আমি আপনাদেরকে বিবৃত করব।

প্রথম উৎস, রাসূলুল্লাহ (স)-র পবিত্র জীবনের সবচাইতে নির্ভুল অংশের উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদ। কুরআন মজীদের নির্ভুলতা ও নির্ভর-যোগ্যতার ব্যাপারে শত্রুরাও কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় অংশ প্রাক-নবুয়ত জীবন, পিতৃ-মাতৃহীন জীবন, দারিদ্র্য, সত্যের সন্ধান, নবুয়ত, ওহী, ঘোষণা ও প্রচার, মি'রাজ, বিরোধী পক্ষের শত্রুতা, হিজরত, যুদ্ধ, চারিত্রিক অবস্থা ইত্যাদি সবকিছু এর অন্তর্ভূক্ত। এর চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক জীবন চরিতের সন্ধান দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয় উৎসটি হচ্ছে হাদীস। এর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি। এর মধ্যে নির্ভুল, দুর্বল ও মনগড়া হাদীসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূল্যবান 'সিহাহ সিত্তা'র (ছয়টি নির্ভূল হাদীসগ্রন্থ) প্রত্যেকটি হাদীস কঠোর সমালোচনা এবং যাচাই-পরখের পর সন্নিবেশিত হয়েছে। এরপর আছে বিভিন্ন মুসনাদ। এর মধ্যে সবচাইতে বিপুলায়তন হচ্ছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থ। এটি ছ'টি খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি খণ্ডে মিসরের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির টাইপে মুদ্রিত অন্যূন পাঁচশ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এতে প্রত্যেকটি সাহাবীর রেওয়ায়েত পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সংকলনসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবন-বৃত্তান্ত ও শিক্ষাসমূহ মিশ্রিত হয়ে আছে।

তৃতীয় উৎসটি হচ্ছে মাগাযী। এ গ্রন্থসমূহে মূলত রাসূলুল্লাহ্ (স)-র যুদ্ধসমূহের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং প্রসঙ্গত অন্যান্য ঘটনাও উল্লিখিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উরওয়া ইবনে যুবাইরের (মৃত্যু ৯৪ হিঃ) মাগাযী, যুহরীর (মৃত্যু ১২৭ হিঃ) মাগাযী, মুসা ইবনে উৎবার (মৃত্যু ১৪১ হিঃ)

www.bjilibrary.com

মাগাযী, ইবনে ইসহাকের (মৃত্যু ১৫০ হিঃ) মাগাযী, যিয়াদ বুকাই'র (মৃত্যু ১৯৩ হিঃ) মাগাযী, ওয়াকেদীর (মৃত্যু ২০৭ হিঃ) মাগাযী প্রভৃতি প্রাচীনতম।

চতুর্থ উৎস হচ্ছে সাধারণ ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ। এগুলির প্রথমাংশ বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবন সংক্রান্ত। এর মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও ঘটনাবহুল হচ্ছে 'তাবকাতে ইবনে সা'আদ' এবং ইমাম জাফর তাবারির 'তারিখুর রাসূলে ওয়াল মুলুক', ইমাম বুখারীর তারিখে সগীর ও কবীর, তারিখে ইবনে হিব্বান, তারিখে ইবনে আবী খাইসামা বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৯ হিঃ) প্রভৃতি।

পঞ্চম উৎস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলী সম্পর্কিত পৃথক কিতাবসমূহ। এগুলিকে 'কুতুবে দালায়েল' বলা হয়। যেমন, ইবনে কুতাইবার (মৃত্যু ২৭৬ হিঃ) দালায়েলুন নবুয়ত, আবূ ইসহাক হারবীর (মৃত্যু ২৫৫ হিঃ) দালায়েলুন নবুয়ত, দালায়েলে ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু ৪৩০ হিঃ) দালায়েল আবু না'ঈম ইসফাহানী (মৃত্যু ৪৩০ হিঃ), দালায়েল মুস্তাগফেরী (মৃত্যু ৪৩২ হিঃ), দালায়েল আবুল কাশেম ইসমা'ঈল ইস্ফাহানী (মৃত্যু ৫৩৫ হিঃ)। এ শাখায় সবচাইতে তথ্যবহুল কিতাব হচ্ছে ইমাম সুয়ূতীর খাসায়েসে কুবরা।

ষষ্ঠ উৎসটি হচ্ছে শামায়েল গ্রন্থসমূহ। এ গ্রন্থসমূহে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (স)-র স্বভাব, চরিত্র, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ শাখায় সর্বপ্রথম ও সবচাইতে বিপুলায়তন ও বৃহত্তম কিতাব হচ্ছে ইমাম তিরমিযির (মৃত্যু ২৭৯ হিঃ) শামায়েল। বড় বড় আলেমগণ এর বহুসংখ্যক ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন। এ শাখায় সবচাইতে বিপুলায়তন ও বৃহত্তম কিতাব হচ্ছে কাজী ইয়ায লিখিত কিতাবুশ শিফা ফী হুকূকিল মুস্তফা এবং এর ভাষ্য শিহাব খাফফাজী লিখিত নাসীমুর রিয়ায। এ শাখায় অন্যান্য কিতাব হচ্ছে আবুল আব্বাস মুসতাগফেরীর (মৃত্যু ৪৩২ হিঃ) শামায়েলুন নবী, এবং সাতেয়্ ইবনুল মুকেররী গার্নাতীর (মৃত্যু ৫৫২ হিঃ) শামায়েলুননূর এবং মাজদুদদীন ফিরোজাবাদীর (মৃত্যু ৮১৭ হিঃ) সফরুস্ সা'আদাহ।

www.bjilibrary.com

সপ্তম উৎসটি হচ্ছে মক্কা ও মদীনার অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থসমূহ। এসব কিতাবে এ শহরদ্বয়ের সাধারণ বৃত্তান্ত ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (স)-র আমলের স্থানীয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-র সঙ্গে সে সকল স্থানের কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল, সেগুলির নাম পরিচয় ও অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। এ শাখায় সবচাইতে প্রাচীন কিতাব হচ্ছে যারকীর (মৃত্যু ২২৩ হিঃ) আখবারে মক্কা, 'উমরা ইবনে শিবা'র (মৃত্যু ২৬৩ হিঃ) আখবারে মদীনা, ফাকেহীর আখবারে মক্কা ও ইবনে যাবালার আখবারে মদীনা প্রভৃতি।

বন্ধুগণ! আমার আজকের আলোচনায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পবিত্র জীবনের ঐতিহাসিক তথ্য-সম্পদের যে চিত্র পেশ করেছি, তা থেকে আমাদের সমর্থক ও বিরোধী সকলেই বুঝতে পারবেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত। কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যা ও বিক্ষিপ্ত স্মারকলিপির ওপরই প্রথম যুগের মুহাদ্দিসগণ ও মুসলিম খলীফাগণ সন্তুষ্ট থাকেননি। বরং তাঁরা এসব শাস্ত্রের বড় বড় ইমামগণের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-র যুদ্ধ সংক্রান্ত (মাগাযী) বিষয়াবলী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষায়তন ও মসজিদসমূহে রীতিমত ক্লাশ শুরু করেন। হযরত কাতাদা আনসারী একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর প্রপুত্র আসেম ইবনে উমর মাগাযীর ইমাম ছিলেন। তিনি ১২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের নির্দেশে তিনি রাজধানী দামেশকের জামে মসজিদে বসে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াবলীর শিক্ষা প্রদান করতেন।–(তাহযীব) মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পবিত্র যামানা থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি ভাষায় তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত, জীবনের ঘটনাবলী ও বাণীসমূহ সম্পর্কে যে সমস্ত কিতাব লিখিত হয়েছে, তার সংখ্যা কয়েক হাজারেরও উর্ধে। উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলিতে বিগত দুশো বছর থেকে রচনার কাজ শুরু হয়েছে। উপরন্তু মৌলিক রচনার কাজ এখানে শুরু হয়েছে মাত্র বিগত ১৮৫০ ঈসায়ী সালের কিছু আগে পরে থেকে। তবুও এসব ভাষায় ছোট বড় কয়েকশো কিতাব এ পর্যন্ত লিখিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

দুশমনদের চোখে

মুসলমানদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স)-র প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ এবং তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন তাদের দীন ও ঈমানেরই দাবী। একবার দুশমনদের শিবিরে আসুন। ভারতের হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান ও ব্রাহ্মসমাজীরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবনী লিখেছেন। ইউরোপও রাসূলুল্লাহ (স)-র প্রতি স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল নয়। তবুও সেখানে মিশনারীদের সেবার জন্য অথবা তত্ত্বগত রুচি বা বিশ্ব-ইতিহাসের জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য 'লাইফ অব মুহাম্মদ' সম্পর্কে বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ১৬/১৭ বছর পূর্বে[১] দামেশকের 'আল-মুকতাবিস' নামক পত্রিকায় এ সম্পর্কিত একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, এ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ১৩শ পুস্তক লিখিত হয়েছে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত আরো যে সমস্ত কিতাব লেখা হয়েছে, সেগুলিকেও শামিল করা হলে এ সংখ্যা বিরাট আকার ধারণ করবে। অধ্যাপক D.S.Margoliuth (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী অধ্যাপক) লিখিত এবং ১৯০৫ সালে 'হিরোজ অব দি নেশান্স' সিরিজ কর্তৃক মুদ্রিত ইংরেজী কিতাব 'মুহাম্মদ'-এর চাইতে রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবনী সংক্রান্ত অধিকতর বিষাক্ত পুস্তক আর একটিও লেখা হয়নি। এ কিতাবে তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য পেশ করে নবী-চরিত্রকে বিকৃত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছেন। তবুও কিতাবের ভূমিকায় এ সত্যটি স্বীকার না করে পারেননি যে, 'মুহাম্মদের জীবনীকারদের দীর্ঘ সিলসিলা শেষ হওয়া অসম্ভব, কিন্তু তাঁদের মধ্যে স্থান লাভ করা একটি বিরাট সম্মান।'

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জন ডেভিনপোর্ট ইংরেজী ভাষায় সর্বাধিক সহানুভূতিপূর্ণ গ্রন্থ 'এ্যপলজি ফর মুহাম্মদ এণ্ড দি কুরআন' লেখেন। তিনি এভাবে গ্রন্থটি শুরু করেনঃ

'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল আইন-প্রণেতা ও বিজয়ীগণের মধ্যে একজনও এমন নেই, যার জীবন-বৃত্তান্ত মুহাম্মদের জীবন বৃত্তান্তের চাইতে অধিক বিস্তারিত ও সত্য।'

---

১. ১৯২৫ সালে এ বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়।

www.bjilibrary.com

অক্সফোর্ড ট্রিনিটি কলেজের ফেলো রেভারেণ্ড বসওয়ার্থ স্মিথ (Bosworth Smith) ১৮৭৪ সালে 'রয়াল ইনস্টিটিউশান অব গ্রেট বৃটেন'–'মুহাম্মদ' এবং 'মোহামেডানিজম' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। এটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে। এতে রেভারেণ্ড সাহেব কী চমৎকারভাবে বলেছেনঃ

'ধর্ম সম্পর্কে সাধারণত (প্রারম্ভকাল অজ্ঞাত থাকার কারণে) যা কিছু সত্য, দুর্ভাগ্যবশত এ তিনটি ধর্ম ও এদের প্রবর্তকদের সম্পর্কেও তা সত্য। অন্য কোন ভাল নাম না থাকার কারণে আমরা এদেরকে ঐতিহাসিক ভিত্তি বলে থাকি। আমরা ধর্মের প্রাথমিক প্রারম্ভিককালের কর্মীবৃন্দের সম্পর্কে খুব কম এবং তাদের শ্রমের সঙ্গে যারা পরবর্তীকালে নিজেদের শ্রম মিলিয়েছেন তাদের সম্পর্কে সম্ভবত অনেক বেশি জানি।

আমরা যরথুষ্ট্র ও কনফুসিয়াস সম্পর্কে সুলান ও সক্রেটিসের চাইতে অনেক কম জানি। মূসা ও বুদ্ধ সম্পর্কে তার চাইতে অনেক কম জানি, যা এ্যামব্রেস (Ambrase) ও জুলিয়াস সীজার সম্পর্কে জানি! আমরা আসলে ঈসা-মসীহর জীবনের একটি অংশের আংশিক জ্ঞান রাখি। যে ত্রিশটি বছর তিন বছরের জন্যে পথ পরিষ্কার করল তাকে আবরণমুক্ত করবে কে? যা কিছু আমরা জানি তা হচ্ছে এই যে, তিনি দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশকে জীবিত করেছেন এবং সম্ভবত আরো অনেক বেশি অংশকে জীবিত করবেন। একটি 'আদর্শ জীবন' যা অনেক দূরের আবার অনেক নিকটের, যা সম্ভব আবার অসম্ভবও তার কত বিরাট অংশ সম্পর্কে আমরা এখনও অজ্ঞ! আমরা ঈসার মাতা, তাঁর সংসার-জীবন, তাঁর প্রাথমিক বন্ধু-বান্ধব, তাঁদের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর অধ্যাত্মিক মিশনের পর্যায়ে ক্রমিক অভ্যুদয় অথবা তার আকস্মিক প্রকাশ সম্পর্কে কী-ই বা জানি! এগুলি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের মনে কত প্রশ্নই না জাগে। এগুলি চিরকাল প্রশ্নই থেকে যাবে। কিন্তু ইসলামের প্রত্যেকটি বস্তু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এখানে কোন অস্পষ্টতা ও রহস্য নেই। আমাদের নিকট ইতিহাস আছে। আমরা মুহাম্মদ সম্পর্কে এত বেশি জানি, যেমন জানি-লুথার ও মিলটন সম্পর্কে। পৌরাণিকতা, কাল্পনিক গল্প ও স্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রাথমিক যুগের আরব লেখকগণের রচনামুক্ত। অথবা যদি কোথাও এগুলির অস্তিত্ব কিছু থাকেও

www.bjilibrary.com

তাহলে অতি সহজেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে সেগুলিকে পৃথক করা যায়। এখানে কেউই নিজকে অথবা অন্যকে প্রতারণা করতে পারে না। এখানে সমগ্র পরিস্থিতি স্বচ্ছ দিবালোকে ভাস্বর। প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর সে আলোক পড়ছে এবং তা প্রত্যেকের নিকট পৌছতে পারে (পৃষ্ঠাঃ ১৪-১৫ ঃ ১৮৮৯ খৃঃ)।

রাসুলুল্লাহ (স)-র জীবন সংক্রান্ত লাখো লাখো কিতাব মুসলমান লেখকগণও রচনা করেছেন এবং আজও করছেন। এর প্রতিটি কিতাব অন্যান্য নবীগণের জীবন-চরিত সংক্রান্ত কিতাবগুলির তুলনায় অধিক স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য ও ঐতিহাসিক। রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবন-চরিত ও তাঁর হাদীসসমূহের প্রথম কিতাবগুলিকে প্রত্যেক লেখকের নিকট থেকে লক্ষ লক্ষ লোক শুনেছে, পাঠ করেছে এবং তার প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝে নিয়ে অন্যের নিকট পৌছিয়েছে। হাদীসের প্রথম কিতাব 'মুয়াত্তা'কে তার লেখক ইমাম মালিক (র)-এর নিকট থেকে ৬০০ লোক শুনেছে। তাদের মধ্যে সমকালীন সুলতান, আলেম, ফকীহ, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সূফী তথা প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যক্তিই শামিল ছিলেন। ইমাম বুখারীর রচনা সহীহ বুখারীকে মাত্র তাঁর একজন ছাত্র ফারবারী-র নিকট থেকে ৬০ হাজার লোক শুনেছে। এখন বলুন তো, কোনো ধর্ম প্রবর্তক ও প্রচারকের জীবন-বৃত্তান্ত ও বাণী সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য এহেন সতর্কতা ও ঘটনা বর্ণনাকারীদের এরূপ ধারাবাহিকতা রক্ষা করার এত বিপুল আয়োজন করা হয়েছে কি? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কার জীবন চরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি এত মজবুত?

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

www.bjilibrary.com

চতুর্থ বক্তৃতা

মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা

www.bjilibrary.com

মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা

বন্ধুগণ! আজ আমি 'মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা' সম্পর্কে আলোচনা করবো। কোন জীবন যতই ঐতিহাসিক হোক না কেন যতক্ষণ না তার মধ্যে মানবিক গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করে, ততক্ষণ তা আমাদের জন্য আদর্শ হতে পারে না। আবার কোন জীবনে পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণাবলীর সমাবেশ ও তা যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত তখনই প্রমাণিত হতে পারে, যখন তার সমগ্র অংশ আমাদের সম্মুখে থাকে। ইসলামের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর যামানার লোকের সম্মুখে ছিল এবং তাঁর ইন্তিকালের পর বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় তা পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর জীবনের সামান্যতম অংশও এমন নেই যে, ঐ সময়ে তিনি তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ভবিষ্যতের প্রস্তুতিতে লিপ্ত ছিলেন।

জন্ম, দুগ্ধপান, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, ব্যবসায়ে যোগদান, চলাফেরা, বিয়ে, নবুয়ত-পূর্বকালের বন্ধু-বান্ধব, কুরাইশদের যুদ্ধ ও চুক্তিতে অংশগ্রহণ, 'আমীন' উপাধি লাভ, কাবাগৃহে প্রস্তর স্থাপন, ধীরে ধীরে নির্জন-প্রিয়তা, হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ অবস্থান, ওহী অবতরণ, ইসলামের দাওয়াত দান, প্রচার অভিযান, বিরোধিতা, তায়েফ সফর, মি'রাজ, হিজরত, যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, বিভিন্ন দেশে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ, ইসলাম প্রচার, দীনকে পূর্ণতা প্রদান, বিদায় হজ্ব, মৃত্যু–এর মধ্যে কোন যুগটি দুনিয়াবাসীর দৃষ্টিসীমার আড়ালে আছে? তাঁর কোন অবস্থানটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ অজ্ঞ? সত্য-মিথ্যা, ভুল-নির্ভুল প্রত্যেকটি বিষয়ই পৃথক পৃথক মওজুদ আছে এবং প্রত্যেকেই তা জানতে পারে।

www.bjilibrary.com

দুর্বল রেওয়ায়েত সংরক্ষণ কেন?

কখনো কখনো চিন্তা করি, মুহাদ্দিসগণ মনগড়া ও দুর্বল রেওয়ায়েতসমূহ সংরক্ষিত রেখেছেন কেন? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে যে, এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের যেন একথা বলার সুযোগ না থকে যে, তারা নিজেদের পয়গম্বরের বিভিন্ন দুর্বলতা ঢেকে রাখার জন্য অনেক রেওয়ায়েত বিলুপ্ত করে দিয়েছে। যেমন আজ খ্রিস্টানদের বইপত্রের বিরুদ্ধে স্বতঃই আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। তাই আমাদের মুহাদ্দিসগণ নিজেদের পয়গম্বর সম্পর্কিত সত্য-মিথ্যা যাবতীয় বিষয় সম্মুখে রেখে দিয়েছেন, এদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এরূপ পার্থক্য করার নীতিও নির্ধারণ করেছেন।

ওঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ, বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, নামায-রোযা, দিবারাত্রের ইবাদত, যুদ্ধ-সন্ধি, চলাফেরা, সফর ও অবস্থান, গোসল, আহার-বিহার, হাসি-কান্না, বস্ত্র পরিধান, হাসি-ঠাট্টা, আলাপ-আলোচনা, নির্জনে ও জনসমাজে বিহার, মেলামেশা, আচার-ব্যবহার, দেহের বর্ণ ও গন্ধ, আকৃতি-প্রকৃতি, লম্বা-চওড়া এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, একত্রে শয়ন ও পবিত্রতা অর্জন প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় সম্পূর্ণ প্রকাশিত, সর্বজনবিদিত ও সংরক্ষিত আছে। আমি এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-র আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত মাত্র একটি প্রাচীনতম কিতাব 'শামায়েলে তিরমিযী'র বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম পাঠ করে আপনাদের শুনাচ্ছি। এ থেকে আপনারা আন্দাজ করতে পারবেন, হযরত মুহাম্মদ (স)-র সম্পর্কিত অতি তুচ্ছ বিষয়ও আমাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১. রাসূলুল্লাহ্ (স)-র চেহারা ও গঠনাকৃতির আলোচনা
২. " (স)-র কেশের আলোচনা
৩. " (স)-র পক্ক কেশের আলোচনা
৪. " (স)-র চুল আঁচড়াবার আলোচনা
৫. " (স)-র চুলে খেজাব লাগাবার আলোচনা
৬. " (স)-র চোখে সুর্মা লাগাবার আলোচনা
৭. " (স)-র পোশাকের আলোচনা

www.bjilibrary.com

৮. রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবন যাপনের আলোচনা
৯. " (স)-র মোজার আলোচনা
১০. " (স)-র পাপোশের আলোচনা
১১. " (স)-র আংটির মোহরের আলোচনা
১২. " (স)-র তলোয়ারের আলোচনা
১৩. " (স)-র লৌহবর্মের আলোচনা
১৪. " (স)-র লৌহ শিরস্ত্রাণের আলোচনা
১৫. " (স)-র পাগড়ীর আলোচনা
১৬. " (স)-র পায়জামার আলোচনা
১৭. " (স)-র চলার আলোচনা
১৮. " (স)-র মুখে কাপড় ঢাকবার আলোচন্যা
১৯. " (স)-র বসার আলোচনা
২০. " (স)-র বিছানা ও বালিশের আলোচনা
২১. " (স)-র হেলান দেবার আলোচনা
২২. " (স)-র আহার করার আলোচনা
২৩. " (স)-র রুটির আলোচনা
২৪. " (স)-র গোশ্ত ও তরকারীর আলোচনা
২৫. " (স)-র অযু করার আলোচনা
২৬. " (স)-র আহারের পূর্বে ও পরে দোয়া পাঠের আলোচনা
২৭. " (স)-র পেয়ালার আলোচনা
২৮. " (স)-র ফলের আলোচনা
২৯. " (স)-র কি কি পান করতেন তার আলোচনা
৩০. " (স)-র কিভাবে পান করতেন তার আলোচনা
৩১. " (স)-র খোশবু লাগাবার আলোচনা
৩২. " (স)-র কথা বলার আলোচনা
৩৩. " (স)-র কবিতা পাঠের আলোচনা
৩৪. " (স)-র রাত্রে কথাবার্তার আলোচনা
৩৫. " (স)-র নিদ্রার আলোচনা
৩৬. " (স)-র 'ইবাদতের আলোচনা
৩৭. " (স)-র হাসির আলোচনা

www.bjilibrary.com

৩৮. রাসূলুল্লাহ (স)-র রসিকতার আলোচনা
৩৯. " (স)-র চাশতের নামাযের আলোচনা
৪০. " (স)-র গৃহে নফল পড়ার আলোচনা
৪১. " (স)-র রোযার আলোচনা
৪২. " (স)-র কুরআন পাঠের আলোচনা
৪৩. " (স)-র রোনাজারির আলোচনা
৪৪. " (স)-র বিছানার আলোচনা
৪৫. " (স)-র নম্রতার আলোচনা
৪৬. " (স)-র আচার-ব্যবহারের আলোচনা
৪৭. " (স)-র ক্ষৌরকাজের আলোচনা
৪৮. " (স)-র নামসমূহের আলোচনা
৪৯. " (স)-র জীবনের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা
৫০. " (স)-র জন্ম তারিখ ও বয়সের আলোচনা
৫১. " (স)-র মৃত্যু আলোচনা
৫২. " (স)-র মীরাস ও পরিত্যক্ত বস্তুর আলোচনা

এগুলি রাসূলুল্লাহ্ (স)-র ব্যক্তিগত অবস্থার বিবরণ। এর মধ্যে প্রত্যেকটি শিরোনামে কোথাও মাত্র কতিপয় এবং কোথাও বহু ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এ ঘটনাগুলির প্রত্যেকটি দিক স্বচ্ছ ও দ্ব্যর্থহীন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবনের কোন একটি মুহূর্ত পর্দান্তরালে ছিল না। অন্তঃপুরে তিনি থাকতেন স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে এবং বাইরে আত্মীয়-বান্ধব ও ভক্তদের মজলিসে।

বন্ধুগণ! দুনিয়ার বিরাট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিও নিজের ঘরে সাধারণ মানুষই থাকেন। তাই ভল্টেয়ারের কথায় বলা যায়, 'কোন ব্যক্তি নিজের ঘরে হিরো হতে পারে না' (No man is hero to his valet)। বসওয়ার্থ স্মিথের মতে 'এ নীতিটি কমপক্ষে ইসলামের পয়গম্বরের ক্ষেত্রে সত্য নয়।[১] গীবন বলেছেন ঃ 'মুহাম্মদের ন্যায় অন্য কোন পয়গম্বর তাঁর অনুসারীদেরকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেননি। যারা তাঁকে মানুষ হিসেবে খুব ভালভাবেই জানতেন, তাদের সম্মুখে তিনি হঠাৎ নিজেকে পয়গম্বর হিসেবে পেশ করলেন। নিজের স্ত্রী, নিজের গোলাম, নিজের ভাই এবং নিজের

১. বসওয়ার্থ স্মিথের বই 'লাইফ অব মুহাম্মদ' সম্পর্কে বক্তৃতা।

www.bjilibrary.com

ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের সম্মুখে নিজেকে পয়গম্বর হিসাবে পেশ করলেন এবং তারা বিনা দ্বিধায় তাঁর দাবী মেনে নিলেন।'

মানুষের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার খবর স্ত্রীর চাইতে অধিক আর কেউ জানতে পারে না। কিন্তু এটি কি একটি বাস্তব সত্য নয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-র নবুয়তের ওপর সর্বপ্রথম তাঁর স্ত্রী ঈমান এনেছিলেন? নবুয়ত লাভের পূর্বে পনের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-র সাথে জীবনযাপন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে প্রতিটি বিষয় ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। এসব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (স)-র নবুয়ত দাবী করার পর সর্বপ্রথম তিনিই তাঁর দাবীর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

অতি মহান ব্যক্তিও যিনি মাত্র একটি স্ত্রীর স্বামী, তিনিও স্ত্রীকে এই মর্মে ব্যাপক অনুমতিদানের হিম্মত রাখেন না যে, তুমি আমার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অবস্থা ও ঘটনা জনসমক্ষে বিবৃত কর এবং যা কিছু গোপন আছে তাও সকলের নিকট প্রকাশ করে দিও। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স)-র একই সঙ্গে ন'জন স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেককে তিনি এ অনুমতি দিয়েছিলেন যে, নির্জনে আমার মধ্যে যা কিছু দেখ তা বিনা দ্বিধায় জনসমক্ষে বিবৃত কর। কপাটবন্ধ ঘরের ভেতরে যা কিছু দেখ, খোলা ময়দানে তা সবাইকে শুনিয়ে দিও। এহেন চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের নবী কি আর কোথাও পাওয়া যাবে?

এগুলি হলো রাসূলুল্লাহ্ (স)-র ব্যক্তিগত অবস্থা বর্ণনা। হাদীস গ্রন্থসমূহ তাঁর পবিত্র চরিত্র, উন্নত গুণাবলী ও উত্তম আচার-ব্যবহারের বিস্তারিত বর্ণনায় ভরপুর। বিশেষ করে কাযী 'ইয়ায আন্দালুসীর কিতাব 'আশ্‌শিফা' এ ব্যাপারে সর্বোত্তম। জনৈক ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ ফ্রান্সে আমাকে বলেছিলেন, ইসলামের পয়গম্বরের প্রকৃত গুণাবলী সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য কাযী 'ইয়াযের 'আশশিফা' কিতাবটিকে কোন ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা উচিত। সীরাতুননবীর[১] দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা 'শামায়েল' অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শিরোনামসমূহ সংযোজিত করেছি ঃ

১.মওলানা শিবলী নোমানী ও মওলানা সুলায়মান নদবী লিখিত রাসূলুল্লাহ (স)-র অদ্বিতীয় জীবনচরিত। –(অনুবাদক)

www.bjilibrary.com

'পবিত্র চেহারা, নবুয়তের মোহর, পবিত্র কেশ, চলার ভঙ্গী, কথাবার্তা, হাসি, পোশাক, আংটি, বর্ম ও লৌহ শিরস্ত্রাণ, খাদ্য ও আহার পদ্ধতি, দৈনন্দিন আহার, উত্তম পোশাক, পসন্দনীয় রঙ ও অপ্রিয় রঙ, খোশবু ব্যবহার, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, সওয়ার হবার আগ্রহ।'

'নিয়মিত কার্যধারা' অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শিরোনামসমূহ সংযোজন করেছি ঃ

'সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যা করতেন, নিদ্রা, নৈশ ইবাদত, নিয়মিত নামাযসমূহ, বক্তৃতার ধরন, সফর, জিহাদ, পীড়িতদের খোঁজ-খবর নেয়া, সাধারণ সাক্ষাতকার এবং সকলের সঙ্গে লেনদেন ও আদান-প্রদান।'

'নবীর মজলিস' অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শিরোনামসমূহ সংযোজন করেছি ঃ

'নবীর দরবার, নসিহতের মজলিস, মজলিসের আদব-কায়দা, মজলিসের সময়সূচী, মহিলাদের জন্য বিশেষ মজলিস, নসিহত করার ধরন-পদ্ধতি, মজলিসের আনন্দঘন পরিবেশ, সঙ্গ লাভের সুফল, কথা বলার ভঙ্গিমা, বক্তৃতাসমূহের ধরন, বক্তৃতাসমূহের প্রভাব।'

'ইবাদত' অধ্যায়ে সংযোজিত শিরোনামসমূহ ঃ

'দোয়া ও নামায, রোযা, যাকাত, সাদকা, হজ্জ, সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহ প্রেমের আনন্দ, যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহভীতি, রোনাজারী, আল্লাহ-প্রেম, আল্লাহর ওপর নির্ভরতা, ধৈর্য ও শোকর।'

'নবী-চরিত্র' অধ্যায়ে বিস্তারিত শিরোনামসমূহ ঃ

'নবী-চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, কর্মের দৃঢ়তা, সদ্ব্যবহার, সদাচার ও ইনসাফ, দানশীলতা, ত্যাগ, মেহমানদারী, ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা, সাদকা গ্রহণে অসম্মতি, তোহফা গ্রহণ, কারো অনুগ্রহভাজন না হওয়া, বলপ্রয়োগ বিরোধ নীতি, আত্মপীড়ন অপসন্দনীয়, অপরের প্রচার ও অযথা-প্রশংসার প্রতি বিরূপ মনোভাব, সারল্য ও অনাড়ম্বরতা, কর্তৃত্বের বড়াই ও লোক

www.bjilibrary.com

দেখানো ভাব থেকে দূরে অবস্থান, সাম্য, নম্রতা, অপাত্রে সম্মান ও প্রশংসার প্রতি বিরূপতা, লজ্জাশীলতা, স্বহস্তে কাজ করা, হিম্মত ও দৃঢ়তা, সাহসিকতা, সত্যবাদিতা, প্রতিজ্ঞা পালন, মিতাচার ও অল্পে তুষ্টি, ক্ষমা ও ধৈর্য, শত্রুদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও সদ্ব্যবহার, কাফের ও মুশরিকদের সাথে ব্যবহার, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে ব্যবহার, গরীবদের প্রতি ভালাবাসা ও সমবেদনা, জানের দুশমনের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন, শত্রুদের জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মহিলাদের সাথে ব্যবহার, পশুর প্রতি দয়া, সাধারণভাবে সকলের জন্য করুণা ও ভালবাসার প্রকাশ, অন্তরের কোমলতা, পীড়িতদের দেখাশোনা, মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি, নম্র মেজাজ, সন্তানদের প্রতি ভালবাসা ও নিজের বিবিদের সঙ্গে ব্যবহার।'

হাফিজ ইবনে কাইয়েম 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র হাল অবস্থা সবচাইতে বেশি তথ্যবহুলরূপে পেশ করেছেন। কেবল ব্যক্তিগত বিষয়াবলী সম্পর্কে তাঁর আলোচ্যসূচীর তালিকা নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (স)-র যোগাযোগ পদ্ধতি, তাঁর আহার ও পানীয় গ্রহণের পদ্ধতি, তাঁর বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্কের পদ্ধতি, নিদ্রা ও জাগরণ পদ্ধতি, সওয়ার হবার পদ্ধতি, দাস-দাসীকে নিজের খিদমতের জন্যে পেশ করার পদ্ধতি, তাঁর লেনদেন ও বেচাকেনার পদ্ধতি, মলমূত্র ত্যাগের নিয়মাবলী, দাড়ি বানাবার পদ্ধতি, গোঁফ রাখার ও ছাঁটার পদ্ধতি, তাঁর কথা বলার পদ্ধতি, তাঁর নীরবতা, তাঁর হাসি, তাঁর কান্না, তাঁর বক্তৃতার পদ্ধতি, তাঁর অযুর পদ্ধতি, মোজার ওপর মসেহ করার পদ্ধতি, তায়াম্মুম করার পদ্ধতি, নামায পড়ার পদ্ধতি, দুই সিজদার মাঝখানে বসার পদ্ধতি, সিজদা করার পদ্ধতি, শেষ বৈঠকে বসার ধরন, নামাযে বসার ও তাশাহ্হুদের সময় আঙ্গুল উঠাবার পদ্ধতি, নামাযে সালাম ফেরাবার পদ্ধতি, নামাযে দোয়া করা, তাঁর সোহ্-সিজদা করার পদ্ধতি, নামাযে 'সতর' নির্ধারণ করার পদ্ধতি, সফররত ও স্থির অবস্থা, মসজিদে ও গৃহে তাঁর সুন্নাত ও নফল পাঠের পদ্ধতি, তাহাজ্জুদ বা ফজরের সুন্নাতের পর বিশ্রাম করার পদ্ধতি, তাহাজ্জুদ পড়ার পদ্ধতি, রাতের নামায ও বেতের পড়ার পদ্ধতি, বেতেরের পর বসে নামায পড়ার পদ্ধতি, কুরআন পাঠের সময় তাঁর অবস্থা, তাঁর চাশতের নামায পড়ার পদ্ধতি, শোকরের সিজদা আদায় করার পদ্ধতি, তাঁর

www.bjilibrary.com

জুমআর নামায পড়ার নিয়মাবলী, জুমআর দিন তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি, তাঁর খুতবাদানের পদ্ধতি, দুই ঈদের নামায পড়ার পদ্ধতি, সূর্য গ্রহণের সময় নামায পড়ার পদ্ধতি, অনাবৃষ্টির কারণে নামায পড়ার পদ্ধতি, তাঁর সফরের পদ্ধতি, সফরে নফল পড়ার পদ্ধতি, দুই নামাযকে এক সঙ্গে পড়ার পদ্ধতি, তাঁর কুরআন পড়ার ও শুনার পদ্ধতি, পীড়িতদের দেখার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, জানাযার ব্যাপারে তার পদ্ধতি, জানাযার সাথে তাঁর দ্রুতপদে চলার পদ্ধতি, তাঁর মৃতের ওপর কাপড় ঢাকা দেবার পদ্ধতি, কোন লাশ আনা হলে সে সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ করার পদ্ধতি, তাঁর জানাযার নামাযের পদ্ধতি, শিশুদের জানাযা পড়ার ব্যাপারে তাঁর নিয়ম, আত্মহত্যাকারী ও জিহাদে প্রাপ্ত গনীমাতের অর্থ আত্মসাৎকারীর জানাযা না পড়া, জানাযার আগে আগে তাঁর চলা প্রভৃতির পদ্ধতি, অদৃশ্য লাশের জন্য তাঁর জানাযা পড়ার পদ্ধতি, জানাযার জন্য তাঁর দাঁড়াবার পদ্ধতি, শোক প্রকাশ ও কবর যিয়ারতের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, রোযার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, রমযানে তাঁর অধিক ইবাদত করার পদ্ধতি, চাঁদ দেখার সাথে সাথেই তাঁর রোযা ইফতার করার পদ্ধতি, চাঁদ দেখার সাক্ষী গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, সফরে রোযা না রাখার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, আরাফা দিবসে আরাফার কারণে তাঁর রোযা না রাখার এবং শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার রোযা রাখার পদ্ধতি, তার একাদিক্রমে রোযা রাখার পদ্ধতি, তার নফল রোযা রাখার ও তা ভেঙ্গে যাবার পর আদায় করাকে ওয়াজিব না মনে করার পদ্ধতি, জুমআর দিনটিকে রোযার জন্যে বাছাই করার কারণে তাঁর পদ্ধতি, তাঁর এক বছরে দুটি উমরাহ আদায় করার পদ্ধতি, তাঁর হজ্বসমূহের অবস্থা, তাঁর স্বহস্তে কুরবানী করার পদ্ধতি, হজ্বে তাঁর কেশ মুণ্ডনের পদ্ধতি, হজ্বের দিনগুলিতে তাঁর খুতবা দানের পদ্ধতি, ঈদুল আযহায় তাঁর কুরবানী দানের পদ্ধতি, আকীকার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, নব-জাতকের কানে আযান দেবার এবং তাঁর নাম রাখার ও খাতনা করার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, নাম ও কুনিয়াত (ডাক নাম) রাখার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং শব্দ নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, তাঁর গৃহে প্রবেশ পদ্ধতি, তাঁর পায়খানায় প্রবেশের ও সেখান থেকে নির্গমনের পদ্ধতি, তাঁর কাপড় পরার পদ্ধতি, অযুর দোয়ার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, প্রথম তারিখের চাঁদ দেখার পর তাঁর দোয়া করার

www.bjilibrary.com

পদ্ধতি, খাবার পূর্বে ও পরে তাঁর দোয়া করার পদ্ধতি, আহারের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, সালামের আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, অন্যের গৃহে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, সফরের আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, সফরে দোয়া পাঠের পদ্ধতি, বিবাহের দোয়ার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, কোনো কোনো শব্দের ব্যবহার অপসন্দ করার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, যুদ্ধ ও জিহাদে তাঁর পদ্ধতি, কয়েদীদের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, গুপ্তচর-কয়েদী গোলামের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, সন্ধি করার, নিরাপত্তা দানের, জিজিয়া নির্ধারণ করার এবং আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের সঙ্গে ব্যবহারের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, কাফের ও মুনাফিকদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে তাঁর ব্যবহারের পদ্ধতি, তাঁর দিল ও দেহের রোগ চিকিৎসার পদ্ধতি।

আপনাদের সামনে আমি সামান্য ও খুঁটিনাটি ব্যপারসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করলাম। এ থেকে আপনারা আন্দাজ করতে পারেন যে, এ সমস্ত ছোট ছোট বিষয়কে যখন এভাবে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, তখন বিরাট বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কত বিস্তারিত বিবরণ এখানে বর্তমান। মোটকথা একটি মানুষের জীবনের যতগুলি দিক থাকতে পারে, সবই এখানে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত আছে।

বন্ধুগণ! এখন আপনারা বুঝতে পারছেন যে, 'মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা' বলতে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি এবং এখন আমার দাবীর (অর্থাৎ এ মানদণ্ডে বিচার করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন-বৃত্তান্ত ছাড়া অন্য কোন পয়গম্বরের জীবন-বৃত্তান্ত সংরক্ষিত নেই) সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

এ আলোচনা দীর্ঘ না করে সংক্ষেপেই পেশ করছি। উপলব্ধি করুন যে, রাসূলুল্লাহ (স) নির্জনে বা জনসমক্ষে, মসজিদে বা জিহাদের ময়দানে, রাতের নামাযে মশগুল বা সেনাদলের সংগঠনে, ব্যস্ত মিম্বরের ওপর বা নির্জন কক্ষে–যেখানে যে অবস্থায় থাকেন না কেন সর্বাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি হুকুম দিয়েছেন ঃ 'আমার যাবতীয় অবস্থা ও প্রতিক্রিয়াকে জনসমক্ষে তুলে ধরো।' তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর নির্জন কক্ষের অবস্থা ও ঘটনাবলী প্রকাশ করতে থাকেন। মসজিদে নববীর একটি উঠান ছিল। গৃহহীন ভক্তের দল সেখানে অবস্থান করতেন। তাঁরা দিনের বেলা

www.bjilibrary.com

পালাক্রমে বন থেকে কাঠ কেটে আনতেন, তা বিক্রি করে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-র বাণী শ্রবণ, তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তাঁর সাহচর্যে অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করতেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৭০ এর কাছাকাছি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর চাইতে অধিক রেওয়ায়েত আর কোন সাহাবীর নেই। এ সত্তর জন সাহাবা ভক্ত সহচরের ন্যায় অতি আগ্রহ সহকারে দিবারাত্র হরহামেশা তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং অন্যের নিকট তা বিবৃত করতেন। মদীনার সমস্ত অধিবাসী একাদিক্রমে দশ বছর যাবত প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করত। যুদ্ধকালে হাজার হাজার সাহাবা দিবারাত্র তাঁকে দেখার ও তাঁর অবস্থা অবগত হবার সুযোগ লাভ করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় দশ হাজার, তাবুক যুদ্ধে ত্রিশ হাজার এবং বিদায় হজ্বে প্রায় একলক্ষ সাহাবা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করেছিল। এভাবে নির্জনে ও জনসমক্ষে, ঘরে ও বাইরে, মসজিদের মধ্যে ও মসজিদের উঠানে, সাহাবাদের মজলিসে, শিক্ষালয়ে ও যুদ্ধক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাঁকে যে অবস্থায় দেখেছেন, তার ব্যাপক প্রচারের কেবলমাত্র অনুমতিই ছিল না বরং নির্দেশ এবং কঠোর নির্দেশ ছিল। এখন আপনারা বিচার করতে পারেন–তাঁর জীবনের কোন দিকটি পর্দান্তরালে ছিল এবং তাঁর জীবনের কোন এলাকাটি মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে? আজ তাঁর শত্রু ও বিরোধীরা সব রকমের যাচাই-পরখ ও অনুসন্ধান চালাবার পর মাত্র জিহাদ ও তাঁর স্ত্রীদের সংখ্যা ছাড়া তাঁর অন্য কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেনি। তাহলে এহেন জীবনকে মা'সুম ও নিষ্পাপ বলা সঙ্গত, না এমন জীবনকে নিষ্পাপ বলা সঙ্গত, যার বিরাট অংশ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে?

আর এক দিক দিয়েও ভেবে দেখুন! রাসূলুল্লাহ (স) হামেশা কেবল তাঁর ভক্তদল পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন না। বরং তিনি মক্কায় কুরাইশদের মধ্যে অবস্থান করেছেন। নবুয়ত-পূর্ব চল্লিশটি বছর তাদের মধ্যে কাটিয়েছেন। তাছাড়া ব্যবসায়ী জীবন, লেনদেন, ব্যবহারিক ও কারবারী জীবন, যেখানে প্রতি পদে পদে অসদ্ব্যবহার, অসদিচ্ছা, ওয়াদা খেলাফী ও খেয়ানতের গভীর আবর্ত বিদ্যমান, এতদসত্ত্বেও তিনি এমন সতর্কতার সাথে এ পথ অতিক্রম করেন যে, তাঁকে জনগণ 'আমীন' উপাধি দান

www.bjilibrary.com

করে। নবুয়ত লাভের পরও লোকেরা তাঁকে পূর্ববৎ বিশ্বস্ত মনে করত এবং তাদের আমানতসমূহ তাঁরই নিকট গচ্ছিত রাখত। তাই হিজরতের সময় লোকদের আমানত ফেরত দেবার জন্যে তিনি হযরত আলীকে মক্কায় রেখে আসেন। তাঁর নবুয়ত দাবীর বিরুদ্ধে কুরাইশরা বিক্ষোভ প্রকাশ করে, তাঁকে সামাজিক বয়কট করে, তাঁর সঙ্গে সব রকমের শত্রুতা করে, তাঁকে গালি দেয়, তাঁর পথ রোধ করে, তাঁর ওপর নাপাক আবর্জনা নিক্ষেপ করে, তাঁর প্রতি প্রস্তর ছুঁড়ে মারে। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে, তাঁকে যাদুকর আখ্যা দেয়, কবি নামে অভিহিত করে, পাগল বলে বিদ্রূপ করে। কিন্তু তাঁর আচার-ব্যবহার, কর্ম-চরিত্রের বিরুদ্ধে একটি কথা বলার সাহসও কেউ করেনি। অথচ নবুয়ত ও পয়গম্বরীর দাবীর অর্থই হচ্ছে এই যে, দাবীদার নিজের নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও মা'সুম অবস্থা ঘোষণা করছে। এ দাবী বাতিল করার জন্য তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি শত্রুতামূলক সাক্ষ্যই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এ দাবীটি বাতিল করার জন্য বিরোধীরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করেছে, সন্তানদের কুরবানী করেছে, নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, এতদসত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি সামান্যতম দোষারোপ করে একে চিরতরে ধূলিসাৎ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ থেকে কি একথা প্রমাণ হয় না যে, বন্ধুদের চোখে তিনি যেমনটি ছিলেন শত্রুদের চোখেও তা থেকে মোটেই ভিন্নতর ছিলেন না? আর তাঁর সম্পর্কিত কোন বিষয়ই পর্দান্তরালে বা অজ্ঞাত ছিল না?

একদিন কুরাইশদের বড় বড় নেতারা মজলিস সরগরম করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স)-র সম্পর্কেই চলছিল গরম গরম আলোচনা। কুরাইশদের মধ্যে সবচাইতে অভিজ্ঞ ও বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণকারী নাযার ইবনে হারেস বলল ঃ 'হে কুরাইশগণ! তোমাদের ওপর যে বিপদ এসেছে তার কোন সুরাহা করতে তোমরা পারলে না। মুহাম্মদ তোমাদের সম্মুখে শিশু থেকে যুবকে পরিণত হয়েছে, সে তোমাদের মধ্যে সব চাইতে জনপ্রিয়, সাচ্চা ও আমানতদার ছিল। আর এখন তার চুল সাদা হতে চলেছে। এখন সে তোমাদের সম্মুখে এসব কথা বলছে। তাই তোমরা তাকে বলছ যাদুকর, জ্যোতিষী, কবি ও পাগল। আল্লাহর কসম! আমি তার কথা শুনেছি। মুহাম্মদের মধ্যে এ দোষগুলির একটিও নেই।–(ইবনে হিশাম)

www.bjilibrary.com

তাঁর সবচাইতে বড় শত্রু আবূ জেহেল বলত ঃ 'হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি না, তবে তুমি যা বলছো এবং বোঝাতে চাচ্ছো, সেগুলিকে আমি সত্য মনে করি না।' কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি এ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে ঃ (তিরমিযী, তফসীরে আন'আম)

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ -

'আমি জানি, এ কাফেরদের কথা তোমাকে মর্মাহত করে। তবে এরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না বরং এরা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।' (আনআম ঃ ৩৩)

আল্লাহ তাআলা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে হুকুম দিলেন, তোমার খান্দানের লোকদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দাও, তখন তিনি একটি পাহাড়ের পাদদেশে সকলকে সমবেত করে বললেন ঃ 'হে কুরাইশগণ! যদি আমি তোমাদেরকে একথা বলি যে, এ পাহাড়ের পিছন থেকে একটি সেনাদল তোমাদের ওপর হামলা করতে আসছে, তাহলে কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে? সবাই বলল, 'হ্যাঁ'! কারণ আমরা কখনো তোমাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।'–(বুখারী)

রূমের কাইসারের দরবারে রাসূলুল্লাহ (স)-র দূত পৌঁছেছেন। কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র প্রধানতম শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী আবূ সুফিয়ান, যিনি একাদিক্রমে ছয় বছর তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছেন, তাঁকেই রাসূলুল্লাহ (স)-র বিবরণ সম্পর্কিত সাক্ষ্য ও অনুসন্ধানের জন্যে আহ্বান জানান হয়েছে। পরিস্থিতির নাজুকতার প্রতি লক্ষ্য করুন। এক শত্রু তার এমন এক শত্রুর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে যাকে সে মনে-প্রাণে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এমন এক পরাক্রান্ত বাদশাহর দরবারে এ সাক্ষ্য দিতে হচ্ছে যে, তাকে কোনক্রমে রাজি করতে পারলেই মুহূর্তের মধ্যে তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরগুলো শুনুন ঃ

কাইসার ঃ নবুয়তের দাবীদারের বংশগত মর্যাদা কোন পর্যায়ের?

আবূ সুফিয়ান ঃ সম্ভ্রান্ত।

কাইসার ঃ ইতিপূর্বে এ বংশে আর কেউ কি নবুয়তের দাবী করেছে?

www.bjilibrary.com

আবূ সুফিয়ান ঃ না।
কাইসার ঃ এই বংশের কেউ বাদশাহ ছিল কি?
আবূ সুফিয়ান ঃ না।
কাইসার ঃ যারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা দুর্বল না প্রভাবশালী?
আবূ সুফিয়ান ঃ দুর্বল।
কাইসার ঃ তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বাড়ছে না কমছে?
আবূ সুফিয়ান ঃ বেড়ে চলেছে।
কাইসার ঃ তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এমন কোন ঘটনা কি তোমরা জানতে পেরেছ?
আবূ সুফিয়ান ঃ না।
কাইসার ঃ তিনি কি কখনো নিজের প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি ভঙ্গ করেছেন?
আবূ সুফিয়ান ঃ এখনো পর্যন্ত তো ভঙ্গ করেননি, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যেতে পারে না।
কাইসার ঃ তিনি কি শিক্ষা দেন?
আবূ সুফিয়ান ঃ তিনি বলেন, এক আল্লাহর ইবাদত কর। নামায পড়, পাপ কার্য থেকে দূরে থাক, সত্য কথা বল, আত্মীয়-পরিজনদের হক আদায় কর।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লামের জীবন ছাড়া অন্য কোথাও কি এমন নাযুক অবস্থায় এহেন সাক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে? তাঁর মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতার এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে!

আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (স)-র ওপর যাঁরা প্রথমে ঈমান আনেন, তাঁরা নদী-তীরের মৎস্যজীবী ছিলেন না, তাঁরা মিসরের পরাধীন ও গোলাম জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বরং তাঁরা একটি আযাদ জাতির লোক। সে জাতি বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রাধান্যে সুপরিচিত ছিল এবং তারা সৃষ্টির শুরু থেকে সে সময় পর্যন্ত কখনো কারো আনুগত্য করেনি। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইরান, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, গভীর জ্ঞান, বুদ্ধি মেধার প্রমাণ বিভিন্ন আকারে আজও আমাদের সামনেই বর্তমান আছে। তাদের মধ্যে এমন

www.bjilibrary.com

লোকও আছেন, যারা বিরাট বিরাট সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করে বিজয় লাভ করেছেন এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যাঁরা বিরাট দেশের ওপর শাসন চালিয়েছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। এক মুহূর্তের জন্য কি কেউ একথা বিশ্বাস করতে পারে যে, এমন শক্তিশালী, এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ও এহেন বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের দৃষ্টি থেকে কখনো রাসূলুল্লাহ্ (স)-র কোন অবস্থা প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে? বরং তাঁরাই রাসূলুল্লাহ্ (স)-র প্রতিটি কাজ-কর্ম অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের অনুসৃতিকে নিজেদের জন্য বিরাট সৌভাগ্য মনে করতেন। এটিও তাঁর মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতার অকাট্য প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ্ (স) কখনো তাঁর কোন অবস্থা ও জীবনের কোন ঘটনা পর্দান্তরালে রাখার চেষ্টা করেননি। তিনি যেভাবে জীবনযাপন করতেন তা সবার নিকট প্রকাশিত ও পরিচিত ছিল এবং আজও আছে। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী হযরত আয়েশা (রা) নয় বছর তাঁর সঙ্গে বসবাস করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ আল্লাহর নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন এবং মানুষের নিকট তা প্রকাশ করেননি, তাকে সত্যবাদী মনে করো না।'–(বুখারী শরীফ, তফসীর নিম্নোক্ত আয়াত) কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ-

অর্থাৎ 'হে নবী! আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা মানুষের নিকট পৌছিয়ে দাও। যদি তুমি এরূপ না কর, তাহলে তোমার নবুয়তের হক আদায় হবে না।' (মায়েদা ঃ ৬৭)

দুনিয়ায় কোন ব্যক্তিই তার সামান্যতম দুর্বলতার কথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চায় না। বিশেষ করে যে ব্যক্তি কোন একটি জামা'য়াতের নেতৃত্ব এবং তাও আবার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দান করেন তিনি কখনো এ কার্যে ব্রতী হন না। কিন্তু কুরআন মজীদে এমন অনেক আয়াত আছে, যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-র বাহ্যিক ছোট-খাট ভুলত্রুটির জন্য তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও কুরআনের প্রতিটি আয়াত তিনি লোকদেরকে শুনিয়েছেন। লোকেরা সেগুলি কণ্ঠস্থ করেছে। প্রত্যেকটি

www.bjilibrary.com

মসজিদে ও মেহরাবে সেগুলির আবৃত্তি হয়েছে। আজও যেখানে মুহাম্মদ (স)-র নাম পরিচিত, সেখানে তাঁর অনুসারীদের মুখে ওগুলিও উচ্চারিত হচ্ছে। অথচ এ মামুলি ভ্রান্তিগুলির উল্লেখ যদি কুরআনে না থাকতো, তাহলে আজ দুনিয়া এগুলির কথা জানতেই পারতো না। কিন্তু একটি পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি বস্তুরই প্রকাশ্য দিবালোকে আসার প্রয়োজন ছিল এবং তাই হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-র নিজের পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা আরবের অজ্ঞদের নিকট আপত্তিকর ছিল। কুরআন মজীদে এ ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ আছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যদি আল্লাহর কোন আয়াত লুকিয়ে রাখতে পারতেন, তাহলে এ আয়াতটিকে অবশ্য লুকিয়ে রাখতেন (যে আয়াতে বিয়ের উল্লেখ আছে)–(মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)। এর ফলে অজ্ঞ লোকদের অনর্থক প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগই থাকত না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তা করেননি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবনের কোন অংশও প্রচ্ছন্ন নেই।

বসওয়ার্থ স্মিথ চমৎকার সাক্ষ্য দিয়েছেন

'এখানে সব কিছুই উজ্জ্বল দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। এ আলোক প্রতিটি বস্তুর ওপর পড়েছে এবং প্রতিটি বস্তু পর্যন্ত তা পৌছতে পারে। আসলে ব্যক্তি জীবনের গভীরতম অঞ্চল চিরকাল আমাদের নাগালের বাইরে থাকবে। কিন্তু আমরা মুহাম্মদের বাহ্যিক জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে অবগত। তাঁর যৌবন, তাঁর নবুয়তের প্রকাশ, মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর অভ্যাস, তাঁর প্রাথমিক চিন্তাধারা ও এর ক্রমিক উন্নতি, তাঁর ওপর মহান ওহীর পর্যায়ক্রমিক অবতরণ, তাঁর ভিতরের জীবনের জন্য তাঁর মিশন ঘোষিত হবার পরবর্তীকালের একখানা কিতাব (কুরআন) আমাদের নিকট আছে। এই কিতাবটি নিজের মৌলিকত্বের ব্যাপারে, সংরক্ষিত থাকার ও অবিন্যস্ত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। এই কিতাবের মধ্যে আলোচিত বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রশ্নে কখনো কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ পোষণ করতে পারেনি। যদি এমন কোন কিতাব আমাদের নিকট থাকে, যার মধ্যে যামানার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সত্ত্বা রূপ লাভ করেছে, তাহলে সেটি হচ্ছে এই কুরআন যা, সাধারণত কৃত্রিমতা মুক্ত, অবিন্যস্ত, বৈপরিত্যসম্পন্ন, ক্লান্তিকর অথচ

www.bjilibrary.com

বিরাট ও মহৎ চিন্তায় পরিপূর্ণ। এর মধ্যে আবদ্ধ আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একটি চিন্তাশীল মগজ আল্লাহ প্রেমের নেশায় বিভোর। কিন্তু তার সাথে মানবিক দুর্বলতারও যোগ আছে। এ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হবার দাবী তিনি কখনো করেননি এবং এটি হচ্ছে মুহাম্মদ (স)-র সর্বশেষ শ্রেষ্ঠত্ব যে, তিনি তা থেকে মুক্ত হবার দাবী করেননি।'–(পৃষ্ঠা ১৫)

গীবনের ভাষায়

'প্রথম যুগের কোন পয়গম্বর সত্যতার এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি, যেমন মুহাম্মদ (স) উত্তীর্ণ হয়েছেন। সর্বপ্রথম তিনি এমন সব লোকের সম্মুখে নিজেকে পয়গম্বর হিসেবে পেশ করেছিলেন, যারা মানুষ হিসেবে তাঁর যাবতীয় দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত ছিল। যারা তাঁকে সবচাইতে বেশি জানতেন, তাঁর স্ত্রী, গোলাম, তাঁর চাচাতো ভাই, তার সবচাইতে পুরাতন বন্ধু–যাঁর সম্পর্কে মুহাম্মদ (স) নিজেই বলেছেন যে, একমাত্র সেই বন্ধুই কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি এবং কখনো শঙ্কিত হয়নি– এসব লোকই সর্বপ্রথম তাঁর অনুসারী হয়েছেন। এক্ষেত্রে সাধারণত পয়গম্বরদের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে, মুহাম্মদ (স)-এর ব্যাপারে হয়েছে ঠিক তার বিপরীত। যারা তাঁকে জানত না, তারা ছাড়া অন্যদের নিকট তিনি অখ্যাত ছিলেন না।'

এ উক্তিগুলি পেশ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-র অবস্থা যত বেশি অবগত ছিলেন, তিনি তাঁর প্রতি তত বেশি শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি প্রকাশ করেছেন। সাধারণ পয়গম্বরগণের ব্যাপারে এ নিয়ম ছিল না। সর্বপ্রথম অপরিচিত লোকেরাই তাঁদের ওপর ঈমান এনেছে। তারপর তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-র ক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে সর্বপ্রথম তাঁরাই মেনে নিয়েছেন যাঁরা তাঁর অবস্থা, চরিত্র ও অভ্যাসসমূহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেই নিজেদের ঈমান ও আকিদার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। হযরত খাদীজা (রা) তিন বছর পর্যন্ত 'শিআবে আবু তালিব' নামক উপত্যকায় অবরুদ্ধ ছিলেন। সেখানে তাঁকে

www.bjilibrary.com

ক্ষুধা, অনাহার ও অর্ধাহারের সম্মুখীন হতে হয়। যখন চতুর্দিক থেকে দুশমনরা পশ্চাদ্ধাবন করছিল তখন রাত্রির অন্ধকারে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ভীষণ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তাঁর সহযাত্রী হন। হযরত আলী (রা) এমন বিছানায় শয়ন করেন, যা পরদিন সকালে রক্তরঞ্জিত হতে যাচ্ছিল। হযরত যায়েদ (রা) এমন ক্রীতদাস ছিলেন, যিনি পিতার সন্ধান পাবার পর তাঁর অত্যধিক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও নিজের আধ্যাত্মিক পিতাকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি।

ক্যাডফ্রে হেগেন্স 'এ্যাপলজি ফর মুহাম্মদ'-এ বলেছেন ঃ

'খ্রিস্টানরা যদি একথা মনে রাখে, তাহলে খুব ভালই হবে যে, মুহাম্মদ (স)-র এর পয়গাম তাঁর অনুসারীদের মনে এমন নেশার সৃষ্টি করেছিল, যা যীশুর প্রথম যুগের অনুসারীদের মধ্যে সন্ধান করা অর্থহীন। যীশুকে যখন শূলদণ্ডের ওপর চড়ান হলো, তখন তাঁর অনুগামীরা পলায়ন করল। তাদের ধর্মীয় নেশা কেটে গিয়েছিল এবং নিজেদের শ্রদ্ধেয় নেতাকে মৃত্যুর কবলে শৃঙ্খলিত রেখে তারা সরে পড়ল। অপরদিকে মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারীরা তাদের মজলুম পয়গম্বরের চতুর্দিকে সমবেত হলো, তারা নিরাপত্তার জন্যে নিজেদের জানমাল বিপদের মুখে নিক্ষেপ করে তাঁকে শত্রুদের ওপর বিজয়ী করল।'

(উর্দু অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭, ১৮৭৩ সালে বেরিলীতে মুদ্রিত)

উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ-সেনারা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-র ওপর হামলা করল এবং মুসলমানদের সারিগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, তখন তিনি আওয়াজ দিলেন ঃ 'কে আমার জন্য প্রাণ দেবে?' এ আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই সাতজন আনসার বের হয়ে আসলেন এবং তাদের প্রত্যেকে বিপুল বিক্রমে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। জনৈক আনসার মহিলার পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর ন্যায় প্রিয়জন এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। পর পর এ তিনটি হৃদয় বিদারক সংবাদ মহিলাটি শুনলেন কিন্তু প্রতিবারই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমার প্রিয় রাসূল (স) কেমন আছেন? লোকেরা বলল, 'নিরাপদে আছেন।' আনসার মহিলা নিকটে এসে তাঁর পবিত্র চেহারা দেখলেন এবং বলে উঠলেন ঃ كل مصيبة بعدك ذامل يا رسول الله

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিরাপদ থাকলে সকল বিপদই তুচ্ছ।'

www.bjilibrary.com

বন্ধুগণ! এ ভালোবাসা, এ প্রেম, এ প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা তাদের মধ্যে ছিল যারা তাঁকে সর্বতোভাবে জানতেন। এমন কোন ব্যক্তি যার সাথীদের দৃষ্টিতে তাঁর মধ্যে মানবিক গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করেনি, তাঁর জন্য সাথীরা কি এভাবে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে? এর চাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, ইসলাম তার পয়গম্বরের জীবনকে তাঁর অনুসারীদের জন্য আদর্শে পরিণত করেছে এবং তাঁর অনুসৃতিকে আল্লাহ প্রেমের মাধ্যমে পরিণত করেছে। যেমন আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (স) বলেছেন ঃ

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -

'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার আনুগত্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।'

তাঁর আনুগত্য, তাঁর জীবনের অনুসৃতিকে আল্লাহর ভালোবাসার মানদণ্ডে পরিণত করা হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য দীনের নেশায় বিভোর হয়ে প্রাণ দান করা সহজ। কিন্তু সারা জীবন প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রতিটি অবস্থায় তাঁর অনুসৃতির পুলসিরাত এমনভাবে অতিক্রম করা–যেন কোন পদক্ষেপেই সুন্নাতে মুহাম্মদী থেকে সামান্য পরিমাণও এদিক-ওদিক না হতে পারে– বড়ই কঠিন পরীক্ষা। এই অনুসৃতির পরীক্ষায় সকল সাহাবা পূর্ণ সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সাহাবা, তাবে'ঈন, তাবই তাবে'ঈন, মুহাদ্দিসগণ, ঐতিহাসিক ও নবীচরিত রচয়িতাগণ তাঁর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি বিষয় ও প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জানা এবং ভবিষ্যত বংশধরদের জানানো নিজেদের কর্তব্য মনে করেছেন, যেন প্রত্যেকটি মুসলমান সে অনুসারে চলার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে পারে। এ থেকে প্রমাণ হবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-র অনুসারীগণের দৃষ্টিতে তাঁর জীবনে মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল। এজন্যই তো তাঁরা তার অনুগমনকে পরিপূর্ণ মানবিকতার মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁর জীবন মুসলমানদের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ বিশেষ। তাই এ আদর্শের সকল দিক প্রত্যেকের সামনে থাকা উচিত এবং অবশ্যি তা সবার সামনে আছে। এ থেকে প্রমাণিত হবে যে, তাঁর জীবনের কোন একটি বিষয়ও লুপ্ত হয়ে যায়নি। কোন একটি ঘটনাও পর্দান্তরালে নেই। তাঁর জীবনের সবকিছুই ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। কোন

www.bjilibrary.com

একটি জীবনের পরিপূর্ণতা, নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হওয়ার ওপর বিশ্বাস করার এটিই একমাত্র মাধ্যম। উপরন্তু যে জীবনের প্রত্যেকটি দিক এমনিভাবে উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল থাকে, একমাত্র সে জীবনটিই মানুষের জন্যে আদর্শ হতে পারে।

ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও রোমে বিরাট বিরাট শক্তিশালী সভ্যতার জন্ম হয়েছে; নৈতিকতা সম্পর্কিত চমকপ্রদ মতবাদের প্রচলন হয়েছে; সংস্কৃতির উন্নততর নীতি নির্ধারিত হয়েছে; উঠাবসা, পানাহার, মেলামেশা, পরিধান, বসবাস, শয়ন-জাগরণ, বিবাহ, জীবন-মৃত্যু, দুঃখ-আনন্দ, আমন্ত্রণ, সাক্ষাত, মুসাফাহা, সালাম, গোসল, পবিত্রতা অর্জন, রোগীর সেবা, শোক প্রকাশ, অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন, কাফন-দাফন প্রভৃতির বহু নিয়ম-কানুন, শর্ত ও নির্দেশ প্রণীত হয়েছে এবং এসবের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সামাজিকতার নীতি নির্ধারিত হয়েছে। শত শত বছরে এসব নির্ণীত হয়েছে এবং এরপরও এগুলি বিকৃত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রচেষ্টা-সাধনায় এগুলি সমাজে স্থান লাভ করে, তবুও এগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামের এ সভ্যতা-সংস্কৃতি মাত্র কয়েক বছরেই জন্মলাভ করেছে এবং সুগঠিত হয়েছে। অতঃপর ১৪শ বছর থেকে সমগ্র বিশ্বে শত শত জাতির মধ্যে একই ধারায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কেননা এর উৎস মাত্র একটি এবং তা হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন। এ জীবন-মুকুরে সাহাবাগণ নিজেদের জীবনকে প্রতিফলিত করেছেন এবং তার প্রতিফলন হয়েছে পরবর্তীকালে তাবেঈদের জীবনে। এভাবে তা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের রীতি-প্রকৃতি ও কর্মে পরিণত হয়েছে। এ পবিত্র জীবনটি ছিল কেন্দ্রবিন্দু, সাহাবায়ে কিরাম তাকে রেখায় এবং পরবর্তীগণ তাকে বৃত্তে পরিণত করেছেন। এ সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপ যদিও আজ পরিদৃশ্য নয়, তবুও তার পদচিহ্ন আজো বিরাজিত এবং তারই অনুসরণে বিশ্বের সমস্ত মুসলমান প্রভাবিত হচ্ছে। যা একদা ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন– তাই সমস্ত সাহাবার জীবনধারায় পরিণত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জীবনধারার রূপ পরিগ্রহ করেছে। সে পরিপূর্ণ চিত্র আজও আমাদের মধ্যে বিরাজিত। আফ্রিকা অথবা ভারতবর্ষের কোন গোত্র যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তখন তাদেরকে ধর্মের

www.bjilibrary.com

শিক্ষা ইঞ্জিল থেকে দান করা হলেও সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কর্মজীবনের শিক্ষাদান করা হয় ইউরোপে সৃষ্ট সভ্যতাসমূহ থেকে। কিন্তু দুনিয়ার অসভ্যতম ও বর্বরতম জাতি যখন মুসলমান হয় তখন তারা যেখান থেকে ধর্মলাভ করে সেখান থেকেই সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিকতার শিক্ষাও লাভ করে থাকে। মুসলমান হবার পর ইসলামের পয়গম্বরের সমগ্র জীবন মানবিক প্রয়োজন ও অবস্থাসহ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং এই সবাক, সক্রিয়, জীবন্ত ও জাগ্রত চিত্র প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের প্রতিটি কার্য ও স্পন্দনের জন্যে আয়নায় পরিণত হয়।

জনৈক ইহুদী একজন সাহাবীকে ব্যঙ্গ করে বলেছিল ঃ তোমাদের পয়গম্বর তোমাদেরকে প্রত্যেকটি বস্তুর শিক্ষাদান করেন এবং মামুলি কথাও শেখান। সাহাবী সগর্বে বলেছিলেন ঃ 'অবশ্য আমাদের পয়গম্বর আমাদেরকে প্রত্যেকটি বস্তুর শিক্ষাদান করেন। এমনকি তিনি আমাদেরকে ইস্তেঞ্জা ও হস্ত প্রক্ষালনের শিক্ষাও দেন।' আমরাও আজ সেই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষামূলক জীবনকে সগর্বে বিশ্ব সমক্ষে উপস্থাপিত করি। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন যেন দুনিয়ার গৃহ-মুকুর। এর মধ্যে নিজের দেহ-আত্মা, ভেতর-বাইর, কথা-কাজ, কণ্ঠ-হৃদয়, রসম-রেওয়াজ, নিয়ম-পদ্ধতি, চাল-চলন প্রভৃতির প্রতিফলন দেখে প্রত্যেক ব্যক্তি সেগুলির সংস্কার ও সংশোধন করতে পারে। এজন্যই মুসলিম জাতি নিজের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও নৈতিকতার জন্য তার ধর্মের এবং তার রাসূলের জীবনের বাইরে থেকে পৃথক কোন কিছু চায় না। চাওয়ার কোন প্রয়োজনও হয় না। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবন ও চরিত্র মুসলিম বিশ্বের জন্য এক বিশ্বমুকুর। এর সামনে দাঁড়ালে ভালোমন্দ এবং সুন্দর-অসুন্দরের রহস্য সকলের নিকট উদঘাটিত হয়। আর যেহেতু এহেন ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার সাথে কোন পরিপূর্ণ মানুষের জীবন দুনিয়ার সম্মুখে বিদ্যমান নেই, তাই সমগ্র মানব জাতির জন্য এটিই একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ এবং এহেন পরিপূর্ণ ও আবরণহীন জীবনই মানবজাতির আদর্শ হতে পারে।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.bjilibrary.com

পঞ্চম বক্তৃতা

নবী জীবনের সর্বজনীনতা

www.bjilibrary.com

নবী জীবনের সর্বজনীনতা

বন্ধুগণ! আল্লাহর ভালোবাসার যোগ্য ও তাঁর প্রিয়পাত্র হবার জন্য প্রত্যেক ধর্মে একটি মাত্র পথ বাতলানো হয়েছে। তা হচ্ছে ঐ ধর্মের প্রর্বতক ও ব্যবস্থাপক যেসব ভাল ভাল উপদেশ দান করেন, সেগুলিকে মেনে চলা। কিন্তু ইসলাম এর চাইতেও উত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ইসলাম তাঁর পয়গম্বরের বাস্তব কর্মজীবন সবার সম্মুখে রেখে দিয়েছে এবং সে কর্ম-জীবনের অনুকরণ ও আনুগত্যকে আল্লাহর ভালোবাসার যোগ্য ও তাঁর প্রিয়পাত্র হবার উপায় হিসেবে পেশ করেছে। ইসলামের দুটি বস্তু আছে ঃ কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলী, যা কুরআন মজীদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছেছে। আর সুন্নাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পথ। এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর নির্দেশাবলীকে কার্যকরী করতে গিয়ে যে পথের ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, সে পথ। অর্থাৎ তাঁর বাস্তব কর্মজীবন, যার চিত্র আমরা শব্দের আবরণে হাদীসসমূহে দেখতে পাই। মোটকথা, একজন মুসলমানের সাফল্য ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার জন্য যে বস্তুটির প্রয়োজন, তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-র সুন্নাত।

যেসব লোক কোন ধর্মের আওতায় প্রবেশ করে তাদের সকলেরই মানব জাতির কোন এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কর্মের বৈষম্যের ওপরই এ পৃথিবীর সমাজ জীবনের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিভিন্ন বৃত্তি ও কর্মের মাধ্যমেই পৃথিবী পরিচালিত হচ্ছে। এখানে বাদশাহ বা জন-নায়কের প্রয়োজন যেমন আছে, তেমনি অধীনস্থ জনগোষ্ঠী ও প্রজার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারক ও জজের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য–তেমনি

www.bjilibrary.com

সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও অফিসারদের প্রয়োজনও রয়েছে। এখানে ধনী আছে আবার গরীবও আছে, রাত্রের ইবাদতকারী ও কৃচ্ছ্রসাধনকারীও আছে। আবার দীনের মুজাহিদ এবং সিপাইও রয়েছে। সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসায়ী-বণিক, নেতা এবং জননায়কও আছে। মোটকথা, এ দুনিয়ার আইন-শৃঙ্খলা এ সকল শ্রেণীর অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভরশীল। আর এসব শ্রেণী তাদের নিজেদের জীবনের জন্য বাস্তব আদর্শের মুখাপেক্ষী। ইসলাম সকল মানুষকে রাসূলুল্লাহ (স)-র সুন্নাতের অনুসৃতি ও আনুগত্যের আহ্বান জানায়। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন মানবশ্রেণীর জন্য পয়গম্বরদের বাস্তব কর্মজীবনের মধ্যে আদর্শ ও নজীর রয়েছে। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই প্রমাণ হয় যে, ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা ইসলামের পয়গম্বরের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ মানব জাতির সকল গোষ্ঠী ও শ্রেণীর জন্য তাঁর পবিত্র জীবন উপদেশ ও কর্মের শিক্ষায় পরিপূর্ণ। শাসকের জন্য অধীনের জীবন এবং অধীনের জন্য শাসকের জীবন, আবার ধনীর জন্য গরীবের জীবন এবং গরীবের জন্য শাসকের জীবন, পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হতে পারে না। তাই এমন একজন বিশ্বজনীন ও স্থায়ী পয়গম্বরের জীবনের প্রয়োজন, যেখানে ঐ সমস্ত রঙ-বে-রঙের দৃশ্যাবলীর সমাবেশ ঘটেছে!

শ্রেণীগত দিক ছাড়া খোদ ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন মুহূর্তের বিভিন্ন কর্মের সর্বজনীনতা লক্ষণীয়! আমরা চলাফেরা, ওঠা-বসা, খাওয়া-পরা, লেন-দেন, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। আমরা মারি ও মার খাই, নিজে খাই আবার অন্যকে খাওয়াই, উপকার করি ও উপকার গ্রহণ করি, প্রাণ দান করি, আবার প্রাণ রক্ষা করি, ইবাদত ও দোয়া করি–আবার ব্যবসা-বাণিজ্যও করি, আমরা মেহমান হই, আবার মেহমানদারীও করি। আমাদের দেহের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট এ সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের জন্য আমাদের বাস্তব আদর্শের প্রয়োজন। এমন আদর্শ, যা প্রত্যেক নতুন অবস্থায় আমাদের নতুন পথ-নির্দেশ ও নতুন নেতৃত্বদানের শিক্ষা দেবে।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট এ কর্মসমূহের পর হৃদয় ও মস্তিষ্কের সাথে বহু কর্মও আছে। এগুলিকে আমরা মানসিক কর্ম বা প্রেরণা ও অনুভূতি বলে থাকি। প্রতি মুহূর্তে আমরা একটি নতুন মানসিক কর্ম বা

www.bjilibrary.com

প্রেরণা অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হই। আমরা কখনো সন্তুষ্ট আবার কখনো অসন্তুষ্ট হই। কখনো আনন্দিত কখনো দুঃখিত হই। কখনো বিপদের মুখোমুখি হই আবার কখনো আরাম-আয়েশে থাকি, কখনো ব্যর্থতার সম্মুখীন হই আবার কখনো সাফল্য লাভ করি। এসব অবস্থায় আমরা বিভিন্ন প্রেরণা ও আবেগের অধীনে থাকি। উন্নত নৈতিক চরিত্র অধিক মাত্রায় নির্ভর করে ঐ সমস্ত প্রেরণা, আবেগ ও অনুভূতির ভারসাম্য রক্ষা ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ওপর। এসবের জন্য আমাদের একটি বাস্তব জীবনের প্রয়োজন। তার হাতে থাকবে আমাদের ঐ সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহী ও চপল শক্তিসমূহের লাগাম। সে আমাদের আত্মার ভারসাম্যহীন শক্তিসমূহকে সেই পথে নিয়ে যাবে, যে পথে একদা মদীনার নিষ্কলুষ মানবাত্মারা অগ্রসর হয়েছিল।

হিম্মত, দৃঢ়তা, সাহস, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, নির্ভরতা, ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্টি, বিপদ সহ্য করা, ত্যাগ, অল্পে তুষ্টি, স্বাবলম্বিতা, কোরবানী, দানশীলতা, নম্রতা, উন্নতি ও অনুন্নতি এবং ছোট ও বড় সব রকমের নৈতিক বৃত্তি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় অথবা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় সৃষ্টি হয়। এসবের জন্য আমাদের বাস্তব নির্দেশ ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। কিন্তু তা কোথায় পাওয়া যেতে পারে। তা একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র নিকট পাওয়া যেতে পারে। হযরত মূসা (আ)-র নিকট থেকে আমরা দুরন্ত সাহসিকতার দৃষ্টান্ত লাভ করতে পারি। কিন্তু কোমল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত লাভ করতে পারি না। হযরত ঈসা (আ)-র নিকট কোমল ব্যবহারের অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু কর্ম-তৎপরতা ও রক্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী শক্তি সেখানে নেই। আর এ উভয় ধরনের শক্তির ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানই মানুষের প্রয়োজন। আর এ উভয় শক্তির ব্যাপক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনেই পাওয়া যায়।

বস্তুত যে ব্যক্তি-চরিত্রে মানব সমাজের সকল গোষ্ঠী শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার প্রকাশ ঘটেছে এবং যেখানে সকল বিষয়ে সঠিক মনোভাব ও পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতার সমাবেশ দেখা যায়, তা হচ্ছে একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবন। যদি তুমি ধনী হয়ে থাক, তাহলে মক্কার ব্যবসায়ী ও বাহরাইনের অর্থশালীর অনুগামী হও। যদি তুমি গরীব হয়ে

www.bjilibrary.com

থাক, তাহলে আবূ তালেব গিরিসঙ্কটের কয়েদী ও মদীনার প্রবাসীর অবস্থা শ্রবণ কর। যদি তুমি বাদশাহ হয়ে থাক, তাহলে কুরাইশদের অধিপতিকে এক নজর দেখ। যদি বিজয়ী হয়ে থাক, তাহলে বদর ও হুনায়নের সিপাহসালারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। যদি তুমি পরাজিত হয়ে থাক, তাহলে উহুদ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। যদি তুমি শিক্ষক হও, তাহলে 'সুফফা'র শিক্ষালয়ের মহান শিক্ষকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি ছাত্র হয়ে থাক, তাহলে জিব্রীলের সম্মুখে উপবেশনকারীর দিকে তাকাও। যদি বক্তৃতা ও উপদেশদানকারী হয়ে থাক, তাহলে মদীনার মসজিদে মিম্বরের ওপর দণ্ডায়মান ব্যক্তির কথা শুনো। যদি তুমি নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় সত্যের প্রতি আহবানকারীর দায়িত্ব পালন করতে চাও, তাহলে মক্কার সহায়-সম্বলহীন নবীর আদর্শ তোমার জন্য আলোকবর্তিকার কাজ করবে। যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহে শত্রুদের পরাজিত ও বিরোধীদের দুর্বল করতে সক্ষম হয়ে থাক, তাহলে মক্কাবিজয়ীর অবস্থা দেখ। যদি তুমি নিজের কারবার এবং পার্থিব বিষয়াবলীর ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে চাও, তাহলে বনী নাযীর, খয়বর ও ফিদাকের ভূ-সম্পত্তির মালিকের কাজ-কারবার ও ব্যবস্থাপনা দেখ। যদি এতিম হয়ে থাক, তাহলে আবদুল্লাহ ও আমেনার কলিজার টুকরাকে ভুল না। যদি শিশু হয়ে থাক, তাহলে হালিমা সা'ঈদার আদরের দুলালকে দেখ। যদি যুবক হয়ে থাক, তাহলে মক্কার মেষপালকের জীবনী পাঠ কর। যদি ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী হয়ে থাক, তাহলে বসরা সফরকারী দলের অধিনায়কের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। যদি আদালতের বিচারক ও পঞ্চায়েতের বিবাদ মীমাংসাকারী হয়ে থাক, তাহলে কাবাগৃহে সূর্যকিরণ প্রবেশের পূর্বে প্রবেশকারী এবং 'হাজরে আসওয়াদকে' পুনঃস্থাপনজনিত বিবাদ মীমাংসাকারীকে দেখ। মদীনার কাঁচা মসজিদের বারান্দায় উপবেশনকারী বিচারকের দিকে নজর কর, যাঁর দৃষ্টিতে বাদশাহ-ফকীর, আমীর-গরীব সব সমান ছিল।

যদি তুমি স্বামী হয়ে থাক তাহলে খাদীজা (রা) ও আয়েশা (রা)-র মহান স্বামীর পবিত্র জীবন অধ্যয়ন কর। যদি তুমি সন্তানের পিতা হয়ে থাক, তাহলে ফাতিমা (রা)-র পিতা এবং হাসান হুসাইনের নানার অবস্থা জিজ্ঞেস কর। বস্তুত তুমি যা-ই হও না কেন এবং যে অবস্থায়ই থাক না

www.bjilibrary.com

কেন, তোমার জীবনের জন্য আদর্শ, তোমার চরিত্র সংশোধনের উপকরণ, তোমার অন্ধকার গৃহের জন্যে আলোকবর্তিকা ও পথ নির্দেশক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র ব্যাপক জীবনাদর্শের মধ্যে সর্বক্ষণ ও প্রতি মুহূর্তে পাওয়া যেতে পারে। তাই ঈমানী আলোকবর্তিকার অনুসন্ধানরত প্রতিটি মানুষের জন্য একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবনই হিদায়াতের উৎস ও নাজাতের মাধ্যম। তার সম্মুখে আছে মুহাম্মদ (স)-র জীবন, আবার নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), আইয়ূব (আ), ইউনুস (আ), মূসা (আ), ও ঈসা (আ)-র জীবনও তার সম্মুখে অতি স্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান। কিন্তু অন্য সকল নবীর জীবন যেন এমন কতকগুলি দোকান, যেখানে একটি মাত্র পণ্য পাওয়া যায় আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবনচরিত দুনিয়ার বৃহত্তম বিপণীর মত যেখানে প্রত্যেক বস্তুর ক্রেতা ও প্রত্যেকটি জিনিস অনুসন্ধানকারীর জন্য সর্বোত্তম উপকরণ মওজুদ আছে।

আজ থেকে ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে পাটনার বিখ্যাত বাগ্‌মী মরহুম মাস্টার হাসান আলী 'নূর ইসলাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাতে তিনি তাঁর জনৈক শিক্ষিত হিন্দু বন্ধুর মতামত উদ্ধৃত করেছিলেন। তাতে বলা হয় ঃ একদিন উক্ত হিন্দু-বন্ধুটি মাস্টার সাহেবকে কলেন, 'আমি আপনাদের পয়গম্বরকে সবচাইতে পরিপূর্ণ ও আদর্শ মানুষ মনে করি।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমাদের পয়গম্বরের তুলনায় আপনি হযরত ঈসা (আ)-কে কেমন মনে করেন? জবাব দেন, 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র তুলনায় ঈসা (আ)-কে এমন মনে হয়, যেমন কোন মহাজ্ঞানী ব্যক্তির সম্মুখে একটি ছোট্ট শিশু বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেন ইসলামের পয়গম্বরকে দুনিয়ার সর্বাধিক পরিপূর্ণ মানুষ মনে করেন? জবাব দেন, তাঁর জীবনে একই সঙ্গে এতগুলি পরস্পরবিরোধী বিচিত্র গুণের সমাবেশ দেখা যায়, যা ইতিহাসে কখনো একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে দেখা যায়নি। তিনি এমন বাদশাহ একটি দেশ যার পুরোপুরি কর্তৃত্বাধীন। আবার এমনি অসহায় খোদ নিজের ওপর নিজের অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করেন না বরং সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর অধিকারই স্বীকার করেন। তিনি এমন ধনী, অর্থসম্পদ বহন করে উটের পর উট তাঁর রাজধানীতে প্রবেশ করছে–আবার এমন দরিদ্র মাসের পর মাস তাঁর চুলোয়

www.bjilibrary.com

আগুন জ্বলে না, একাদিক্রমে কয়েকদিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হয়। তিনি এমন সিপাহসালার মুষ্টিমেয় প্রায় নিরস্ত্র সেনাদল নিয়ে পূর্ণরূপে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হাজার হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক লড়াই লড়ছেন। অন্যদিকে এমন শান্তিপ্রিয় হাজার হাজার প্রাণ উৎসর্গকারী সাথীর উপস্থিতিতেও নির্বিবাদে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করছেন। তিনি এমন সাহসী ও বীর হাজার হাজার লোকের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হন এবং এমন কোমল হৃদয় যিনি কখনো স্বহস্তে একবিন্দু মানুষের রক্ত প্রবাহিত করেননি। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক এত গভীর যে, আরবের প্রতিটি ধূলিকণার জন্যে তিনি চিন্তিত, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের জন্যে তিনি চিন্তিত, মানবজাতির জন্য তিনি উদ্বিগ্ন। মোটকথা, সমগ্র দুনিয়া সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেন। আবার নিরাশক্তিও এতো প্রবল যে নিজের আল্লাহ ছাড়া আর সবাইকে ভুলে যান। তিনি কখনো ব্যক্তিগত কারণে নিজের বিরোধীদের নিকট থেকে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তিনি নিজের ব্যক্তিগত শত্রুদের কল্যাণের জন্য হামেশা দোয়া করেছেন এবং তাদের মঙ্গল কামনা করেছেন। কিন্তু আল্লাহর দুশমনদের কখনো ক্ষমা করেননি এবং সত্যের পথরোধকারীদেরকে সর্বদা জাহান্নাম ও আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাতেন। তাঁকে একই সময়ে ধারাল অস্ত্রধারী এবং রাত্রি জাগরণকারী আবেদের মূর্তিতে দেখা যায়। যে মুহূর্তে তাঁকে বিপুল পরাক্রমশালী বিজয়ী বলে ধারণা হয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি নবীসুলভ নিষ্কলুষতার সাথে আমাদের সামনে হাজির হন। যে মুহূর্তে আমরা তাঁকে আরবের কবি বলতে উদ্যত হই, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁকে দেখি খেজুরের ছোবড়ার বালিশে ভর দিয়ে মোটা চাটাইর ওপর উপবেশনকারী দরবেশরূপে। যেদিন আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে ধন-দৌলত এসে তাঁর মসজিদের উঠানে স্তূপীকৃত হচ্ছিল, ঠিক সেই দিনই দেখা যায় তাঁর গৃহে অনাহারের পালা চলছে। যে যুগে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসীরূপে মুসলমানদের ঘরে ঘরে পাঠান হচ্ছিল, ঠিক সেই যুগেই তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.) এসে নিজের হাতের ফোসকা ও বুকের দাগ পিতাকে দেখাচ্ছেন–যাঁতা পিষতে ও মশক ভরতে ভরতে তাঁর হাত ও বুকে এ সব ফোসকা ও দাগ পড়েছিল। যে সময় অর্ধ আরব তাঁর কর্তৃত্বাধীন সে সময় একদা হযরত উমর (রা) তাঁর দরবারে হাজির হয়ে

www.bjilibrary.com

এদিক-ওদিক নজর করে নবীগৃহের আসবাবপত্র দেখলেন। নবী একটি মোটা দড়ির খাটে বিশ্রামরত। তাঁর পবিত্র শরীরে দড়ির দাগ পড়ে গেছে। গৃহের এক কোণে এক মুঠি জোয়ার রক্ষিত আছে। একটি খুঁটির গায়ে শুকনা মশক ঝুলছে। বিশ্বজাহানের নেতার ঘরে এ আসবাবপত্র দেখে হযরত উমর (রা) কেঁদে ফেললেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কাইসার ও কিস্‌রা পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে, আর আপনি পয়গম্বর হয়ে এ অবস্থায় আছেন, এর চাইতে অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? জবাব দিলেন 'হে উমর! কাইসার ও কিস্‌রা দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করবে, আর আমরা লাভ করবো আখিরাতের উচ্চতম মর্যাদা, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?'

আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (স)-র চরম বিরোধী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি হযরত আব্বাস (রা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিজয় অভিযান প্রত্যক্ষ করছিলেন। নানান রঙের ব্যানার ও ঝাণ্ডার ছায়াতলে ইসলামের দুর্বার তরঙ্গ ছুটে আসছিল। আরব উপজাতিদের দুরন্ত মিছিল অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। আবূ সুফিয়ানের দৃষ্টি এবারও প্রতারিত হলো। হযরত আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ 'আব্বাস! তোমার ভাতিজা তো বিরাট বাদশাহ হয়ে গেছে।' হযরত আব্বাসের দৃষ্টি অন্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিল। বললেন ঃ 'হে আবূ সুফিয়ান, এটি বাদশাহী নয়, নবুয়ত।'

আদী ইবনে হাতেম তাঈ গোত্রের প্রধান এবং ইতিহাস বিখ্যাত হাতেম তাঈর পুত্র ছিলেন। তিনি ঈসায়ী ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-র দরবারে হাজির হলেন। সাহাবায়ে কিরামের ভক্তি ও জিহাদের সাজসরঞ্জাম দেখে তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে, হযরত মুহাম্মদ (স) বাদশাহ না পয়গম্বর। হঠাৎ মদীনার একটি দারিদ্র ক্রীতদাস এসে সেখানে দাঁড়াল এবং বলল, আমি রাসূলুল্লাহ (স)র নিকট কিছু আরজ করতে চাই। জবাব দিলেন, দেখো, মদীনার যে গলিতে তুমি আমাকে আহবান করবে সেখানে দাঁড়িয়ে আমি তোমার কথা শুনবো–এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করলেন। এই বাহ্যিক শান-শওকতের অন্তরালে এহেন নম্রতা, কোমলতা ও উদারতার প্রকাশ দেখে হাতেম-পুত্র আদীর চোখের ওপর থেকে পর্দা সরে গেল। তিনি মনে মনে ফয়সালা করলেন– এ অবশ্যি

www.bjilibrary.com

নবীসুলভ শান-শওকতেরই প্রকাশ। তিনি তৎক্ষণাৎ গলা থেকে ক্রুশ নামিয়ে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র আনুগত্যের শৃঙ্খল গলায় পরে নিলেন।

মোটকাথা আমি ইতিপূর্বে যা কিছু বলেছি তা নিছক কবিত্ব নয় বরং ঐতিহাসিক সত্য। যে পরিপূর্ণ ও সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে মানুষের সকল শ্রেণীর, সকল দলের ও সকল গোষ্ঠীর জন্য পথনির্দেশ, দৃষ্টান্ত ও আদর্শ আছে, একমাত্র তিনিই এই বিচিত্র ধারা ও পেশায় পরিপূর্ণ দুনিয়ার বিশ্বজনীন ও চিরন্তন নেতৃত্বদানে সক্ষম। যে ব্যক্তি ক্রোধ, করুণা, দয়া, দানশীলতা, দারিদ্র্য, অভাব, অনাহার, সাহসিকতা, বীরত্ব, কোমলতা, সংসার বুদ্ধি, আল্লাহ্জ্ঞান এবং দীন-দুনিয়ার উভয় ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ জীবনের মাধ্যমে আমাদেরকে আলোক প্রদান করেন, যিনি দুনিয়ার বাদশাহীর সাথে সাথে আসমানের বাদশাহীর এবং আসমানের বদশাহীর সাথে সাথে দুনিয়ার বাদশাহীরও সুখবর দান করেন এবং উভয় বাদশাহীর নিয়ম-কানুন কর্মধারা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দেন, একমাত্র তিনিই মানব-জাতির নেতৃত্বদানের যোগ্য। দুনিয়ায় সাধারণত ক্ষমা, দয়া, করুণা ও কোমলতাকে মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বিবেচনা করা হয়। বরং একমাত্র এ সব গুণাবলীকেই পূর্ণতার উপায় মনে করা হয়। তাই যে ব্যক্তির চরিত্রে কেবলমাত্র এই একমুখী গুণের সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়, তাঁকেই মানবতার সবচাইতে বড় শিক্ষক ও কল্যাণ সাধনকারী মনে করা হয়। কিন্তু বলুন তো, মানুষের চরিত্রে কি কেবল এ শক্তিগুলিই রয়েছে? অথচ এর বিপরীত শক্তিগুলিরও সেখানে সমাবেশ ঘটেছে। একই মানুষের মধ্যে ক্রোধ ও দয়া, ভালবাসা ও শত্রুতা, বাসনা ও পরিতৃপ্তি, প্রতিশোধস্পৃহা ও ক্ষমা সব রকমের বিপরীত গুণের সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। তাই একজন আদর্শ ও পরিপূর্ণ শিক্ষক একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি এ সমস্ত শক্তি ও আবেগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে এগুলির যথার্থ প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করতে পারেন। যে সকল ধর্ম দাবী করে যে, তাদের পয়গম্বরদের জীবন কেবল দয়া, করুণা, ক্ষমা ও কোমলতায় পরিপূর্ণ, তাদের অনুসারীরা কি আমাকে বলতে পারেন যে, সামগ্রিকভাবে তারা কতদিন ঐ পয়গম্বরগণের জীবনাদর্শ অনুযায়ী চলতে পারেন? প্রথম খ্রিস্টান বাদশাহ কনস্ট্যান্টিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মের অনুসারী কত

www.bjilibrary.com

বাদশাহই রাজত্ব করেছেন এবং কত নতুন নতুন খ্রিস্টধর্মানুসারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন বাদশাহ তাদের পয়গম্বরের জীবন ও চরিত্রের অনুসরণ ও আনুগত্যকে তার রাষ্ট্রের আইন বলে ঘোষণা করেছেন? তাহলে বাস্তব জগতে যে জীবন ও চরিত্র সকল দিক দিয়ে তার অনুসারীদের জন্যে আদর্শ হবার যোগ্যতা রাখে না, তাকে কেমন করে সর্বগুণসম্পন্ন ও ব্যাপক বলা যেতে পারে?

হযরত নূহ (আ)-র জীবন কুফরীর বিরুদ্ধে ক্রোধের দুরন্ত প্রকাশ। হযরত ইবরাহীমের জীবনচরিত দেব-মূর্তি ভাঙ্গার দৃশ্য পেশ করে। হযরত মূসা (আ)-র জীবন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ এবং রাজকীয় শাসন-শৃঙ্খলা, সমাজ-বিধান, আইনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হযরত ঈসার জীবন নম্রতা, কোমলতা, উদারতা, ক্ষমা ও পরিতুষ্টির বিস্তৃত শিক্ষায়তন। হযরত সুলায়মানের জীবন রাজকীয় হিম্মত, দৃঢ়তা, পরাক্রম ও শক্তিমত্তার প্রতিমূর্তি। হযরত আইয়ূবের জীবন ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার প্রোজ্জ্বল আদর্শ। হযরত ইউনুসের জীবন অনুতাপ, লজ্জা, প্রভুর নৈকট্য লাভ ও ভুলের স্বীকারোক্তির দৃষ্টান্ত। হযরত ইউসুফের জীবন জেল-জুলুমের মধ্যেও হকের দাওয়াত এবং সত্য প্রচারের অফুরন্ত প্রেরণার শিক্ষা, হযরত দাউদের জীবন কান্নাকাটি, দোয়া এবং আল্লাহর প্রশংসার উন্মুক্ত কিতাব, হযরত ইয়াকুবের জীবন আশা-আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও আশ্বাসের জ্বলন্ত নজীর। কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পবিত্র জীবনে ও চরিত্রে নূহ ও ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা, সুলায়মান ও দাউদ, আইয়ুব ও ইউনুস, ইউসুফ ও ইয়াকুব প্রমুখ নবীদের সবার জীবন ও চরিত্র একত্রিত ও সুসংবদ্ধ হয়েছে।

মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী একটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে,–রাসূলুল্লাহ (স)-র জন্মের সময় আওয়াজ এলো, মুহাম্মদ (স)-কে দেশে দেশে ঘুরিয়ে আনো এবং সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে যাও, যেন সমস্ত দুনিয়া তাঁর নাম ও নিশানা চিনতে পারে, জিন-ইনসান, পশু-পাখী বরং প্রত্যেকটি প্রাণীর সম্মুখে তাকে নিয়ে যাও। তাকে আদমের ব্যবহার, শীসের তত্ত্বজ্ঞান, নূহের সাহসিকতা, ইবরাহীমের বন্ধুত্ব, ইসমাঈলের বাকশক্তি, ইসহাকের সন্তুষ্টি, সালেহ্‌র মধুর ভাষণ, লুতের হিকমত, মূসার কঠোরতা, আইয়ুবের সবর, ইউনুসের আনুগত্য, ইউশার জিহাদ, দাউদের

www.bjilibrary.com

কণ্ঠ, দানিয়েলের প্রেম, ইলিয়াসের গাম্ভীর্য, ইয়াহ্ইয়ার চারিত্রিক পবিত্রতা ও ঈসার কৃচ্ছ্রসাধনা দান কর এবং সকল পয়গম্বরের চরিত্রের মধ্যে তাকে নিমজ্জিত কর। যে সকল আলেম এ হাদীসটিকে তাদের কিতাবে স্থান দিয়েছেন, তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের পয়গম্বরের সর্বব্যাপক গুণাবলীকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ অন্যান্য নবীগণকে পৃথক পৃথকভাবে যা কিছু দান করা হয়েছিল, তা সব একত্রিত করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মধ্যে পুঞ্জীভূত করা হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবনের বিভিন্ন বিভাগে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর ঐ সর্বজনীন ও পরিপূর্ণ গুণাবলীর উজ্জ্বল চিত্র পরিলক্ষিত হবে। মক্কার পয়গম্বরকে যখন মক্কা থেকে ইয়াসরিবে যেতে দেখেন তখন কি আপনারা সে পয়গম্বরের চিত্র দেখেন না যিনি মিসর থেকে মাদায়েনে হিজরত করেন? হেরা পর্বতের গুহাবাসী ও সিনাই পাহাড়ে আল্লাহর নির্দশন প্রত্যক্ষকারীর মধ্যে একদিক দিয়ে কত গভীর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কেবল এতটুকু পার্থক্য যে, হযরত মূসার চক্ষু উম্মীলিত ছিল আর রাসূলুল্লাহ্ (স)-র চক্ষু ছিল মুদ্রিত। হযরত মূসা (আ) দেখেছিলেন বাইরে আর তিনি ভিতরে। যয়তুন পাহাড়ে উপদেশ দানরত পয়গম্বর (হযরত ঈসা) আর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে 'হে কুরাইশগণ' বলে আহবানকারীর মধ্যে কত সামঞ্জস্য! বদর ও হুনায়েন এবং আহযাব ও তাবুকের সিপাহসালার এবং মাওয়াবী, উমুনী ও মূরীগণের সাথে যুদ্ধরত পয়গম্বরের (মূসা) মধ্যে কতই না সাদৃশ্য রয়েছে! কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স) মক্কার সাতজন সর্দারের জন্য বদদোয়া করেন। এক্ষেত্রে তাঁর জীবনের সাথে হযরত মূসার সাদৃশ্য আছে। কেননা, তিনিও অসংখ্য 'মুজিযা' দেখার পরও তাঁর ওপর ঈমান না আনার কারণে ফিরাউনদের জন্য বদদোয়া করেন। আবার যখন রাসূলুল্লাহ্ (স) উহুদে তাঁর শত্রু ও রক্তপিপাসুদের কল্যাণের জন্য দোয়া করেন, তখন তাঁর মধ্যে দেখুন হযরত ঈসার চিত্র–যিনি কখনো শত্রুদের অমঙ্গল কামনা করেননি। যখন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে দেখেন মসজিদে নববীর আদালতগৃহে ও পঞ্চায়েতসমূহের সালিসী মজলিসে অথবা যুদ্ধ ও জিহাদের ময়দানে, তখন তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করুন হযরত মূসা (আ)-র চিত্র। কিন্তু যখন তাঁকে

www.bjilibrary.com

নিজের ঘরে, পর্বতগুহায় এবং রাত্রের নির্জনতায় ও অন্ধকারে দেখেন, তখন তাঁর মধ্যে হযরত ঈসার নমুনা লক্ষ্য করা যায়। দিন-রাতের ২৪ ঘন্টায় তাঁর মুবারক কণ্ঠ থেকে দোয়া ও মুনাজাতের আওয়ায শুনে 'যবুরে' বর্ণিত দলগুলির চিত্র চোখের সামনে ফুঠে উঠবে। মক্কা বিজয়ের শান-শওকত এবং জ্ঞান ও বিচারের ছায়াতলে তাঁকে দেখে শান-শওকত, পরাক্রম ও সেনাদল পরিচালনাকারী সুলায়মানের কথা মনে পড়বে। যদি আবূ তালিব গিরিসঙ্কটে তাঁকে তিন বছর এমন অবস্থায় দেখেন যে, এক কণা খাদ্যও বাইর থেকে তার নিকট পৌঁছতে পারে না, তাহলে মিসরের জেলে আটক হযরত ইউসুফের চিত্র মানসপটে ভেসে উঠবে।

হযরত মূসা (আ) এনেছেন আইন, হযরত দাউদ (আ) এনেছেন দোয়া ও মুনাজাত, হযরত ঈসা (আ) এসেছেন কৃচ্ছ্রতা ও সদ্ব্যবহার নিয়ে, কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স) আইন এনেছেন, দোয়া ও মুনাজাতও এনেছেন এবং কৃচ্ছ্রতা ও সদ্ব্যবহারও এনেছেন। শাব্দিক ও অর্থগতভাবে এ সমস্ত কুরআনের মধ্যে লিখিত এবং কর্মের দিক দিয়ে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবন ও চরিত্রের মধ্যে নিহিত।

বন্ধুগণ! মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র জীবনচরিতের আর একটি দিক এখন আপনাদের সম্মুখে পেশ করবো। দুনিয়ায় দুই ধরনের শিক্ষায়তন আছে। এক ধরনের শিক্ষায়তনে কেবল একটি বিষয়ের শিক্ষা দান করা হয়। সেখানে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পৃথক ও স্থায়ী শিক্ষাগার আছে। যেমন মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আর্ট কলেজ, কমার্স কলেজ, কৃষি শিক্ষা নিকেতন, আইন কলেজ ও ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রত্যেকটি শিক্ষা কেবল এক ধরনের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। মেডিকেল কলেজ থেকে কেবল ডাক্তার বের হয়। কৃষি কলেজ থেকে কেবল কৃষি বিশেষজ্ঞ বের হয়। আইন কলেজ থেকে কেবল আইনবিদ বের হয়। বাণিজ্য শিক্ষাকেন্দ্র থেকে কেবল ব্যবসা বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি হয়। বিদ্যা ও শিল্পকেন্দ্র থেকে কেবল বিদ্বান ও শিল্পীর উদ্ভব হয়। সাহিত্য শিক্ষায়তন থেকে কেবল লেখক ও সাহিত্যিকের জন্ম হয়। ক্যাডেট কলেজ থেকে কেবল উচ্চ শ্রেণীর সিপাহী তৈরি হয়। এভাবে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে উৎপাদন চলতে থাকে। আবার কোথাও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থাকে।

www.bjilibrary.com

এগুলি দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষায়তন। এ শিক্ষায়তনসমূহ তাদের ব্যাপকতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে থাকে। তাদের পরিচালনাধীনে মেডিকেল কলেজ থাকে আবার শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রও থাকে, কৃষি ও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় থাকে, আবার সামরিক কলেজও থাকে। বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্ররা সেখানে আসে এবং নিজের রুচি, প্রকৃতি, প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী এক একটি কলেজ বা বিদ্যালয় নির্বাচন করে। অতঃপর সেখানে সেনাবাহিনীর জেনারেল ও সিপাহী, আদালতের জজ ও আইনবিদ, ব্যবসায়ী ও এ্যাকাউন্টেন্ট, ডাক্তার, শিল্পী ও শিল্প বিশেষজ্ঞ সবই সৃষ্টি হয়।

একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, কেবল একই ধরনের শিক্ষা, একই ধরনের শিল্প ও একই ধরনের বিদ্যা আহরণ করলে তার মাধ্যমে মানব-সমাজে পূর্ণতা আসতে পারে না। বরং এর সবগুলি একত্রিত হলে তবেই মানব-সমাজ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। যদি কেবল একটি বিদ্যা এবং একটি শিল্প বিশেষজ্ঞ দ্বারা দুনিয়া ভরে যায়, তাহলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কারখানা মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং মানুষের যাবতীয় কাজ-কারবার নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে যাবে। এমনকি সমগ্র বিশ্ব যদি নির্জনবাসী সাধনাকারীদের দ্বারা ভরে যায়, তাহলেও দুনিয়ার পরিপূর্ণতা আসবে না। এখন আসুন, বিভিন্ন পয়গম্বরের জীবনকে আমরা এ মানদণ্ডে যাচাই করি। হযরত ঈসা (আ)-র কথায় বলা যায়, 'ফলেই বৃক্ষের পরিচয়।' শিক্ষায়তনসমূহের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের আধ্যাত্মিক সন্তান ও ছাত্রবৃন্দের মাধ্যমে। নবীগণ যে সব শিক্ষায়তনের শিক্ষক ছিলেন, একবার সেগুলি পর্যালোচনা করে দেখুন। প্রথমে কোথাও দশ-বিশ জন, কোথাও ষাট-সত্তর জন, কোথাও দু-একশ, কোথাও হাজার দু'-হাজার, আবার কোথাও পনের-বিশ হাজার ছাত্র পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু নবুয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ শিক্ষায়তনটি দেখুন। সেখানে একই সময়ে এক লক্ষেরও বেশি ছাত্র দেখতে পাবেন। উপরন্তু অন্যান্য নবীর শিক্ষায়তনসমূহের ছাত্রগণকে যদি জানতে চান, যদি জানতে চান তাদের বসবাস কোথায় ছিল, তাদের পরিচয় কি, তারা কিভাবে তৈরি হয়েছিল, তাদের আচার, ব্যবহার, আধ্যাত্মিক অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় কেমন ছিল,

www.bjilibrary.com

এবং তাদের শিক্ষা ও অনুশীলনের বাস্তব ফলশ্রুতি কি, তাহলে এ প্রশ্নগুলির কোন জবাব পাবেন না। কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র শিক্ষায়তনের প্রত্যেকটি বিষয় আপনি জানতে পারেন। তাঁর প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম, পরিচয়, অবস্থা, জীবনচরিত, শিক্ষা ও অনুশীলনের ফলাফল, প্রত্যেকটি বস্তু ইসলামের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

আরো সম্মুখে অগ্রসর হোন। নবুয়ত ও ধর্মের দাওয়াতের প্রতিটি শিক্ষায়তন আজ দাবী করছে যে, তার দুয়ার প্রত্যেক জাতির জন্য উন্মুক্ত আছে। কিন্তু ঐ শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শিক্ষকের জীবনী পাঠ করুন। তাঁর যুগে কোন একটি দেশের, একটি গোত্রের ও একটি খান্দানের ছাত্ররা কি সেখানে ভর্তি হয়েছে এবং তাদের কি ভর্তি হবার অনুমতি দান করা হয়েছে অথবা তাদের দাওয়াতের মধ্যে কি এমন কোন সর্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা ছিল, যার ফলে প্রত্যেকটি আদমসন্তান এবং মাটির পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তার মধ্যে কার্যত প্রবেশ করতে পেরেছে অথবা প্রবেশ করার জন্য তাকে আহবান করা হয়েছে? তাওরাতের সকল নবী ইরাক, সিরিয়া অথবা মিসর দেশের সীমা পার হননি। অর্থাৎ তাদের নিজের দেশে যেখানে তাঁরা থাকতেন সেখানেই তাঁদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বংশ ও গোত্র ছাড়া অন্যকে তাঁরা দাওয়াত দেননি। তাঁদের প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল বনী ইসরাইল বংশ। আরবের প্রাচীন নবীগণও তাঁদের নিজেদের জাতির দায়িত্বই গ্রহণ করতেন। তাঁরা কেউ বাইরে বের হননি। যীশুর শিক্ষায়তনে অ-ইসরাইল ছাত্রদের অস্তিত্ব ছিল না। তিনি কেবল ইসরাইলদের হারানো মেষগুলির সন্ধানে ছিলেন। (মোথিঃ ৭ম অধ্যায়ঃ ২৪শ আয়াত) এবং অন্য জাতির লোকদের শিক্ষা দান করতেন না। (ইঞ্জীল) ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধর্মের আহবায়ক 'পবিত্র আর্যবর্ত্যে'র বাইরে যাবার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। যদিও গৌতম বুদ্ধের অনুসারী বাদশাহগণ তাঁর পয়গামকে বাইরের জাতিদের নিকট পৌছিয়েছেন কিন্তু এটি ছিল যথার্থই খ্রিষ্টানদের দেখাদেখি পরবর্তীকালের বৌদ্ধদের নিজস্ব চিন্তার ফসল। তাদের ধর্মের আহবায়কের নিজের জীবন ও চরিত্রে এই সর্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতার দৃষ্টান্ত নেই।

www.bjilibrary.com

এবার আসুন, আরবের এই উম্মী নবীর শিক্ষায়তন পর্যালোচনা করা যাক! এ ছাত্ররা কারা? এরা আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), তালহা (রা), ও যুবাইর (রা) প্রমুখ মক্কার কুরাইশ বংশীয় ছাত্র। এরা কারা? এরা আবূ যর (রা) ও আনাস (রা), মক্কার বাইরের তাহামা এলাকার গফফারী গোত্রের লোক। এরা কারা? এরা আবূ হুরায়রা (রা) ও তোফায়েল ইবনে আমর (রা)। ইয়ামন দেশের দুসী গোত্রের লোক। এরা কারা? এরা আবূ মূসা আশআরী (রা) ও মুআয ইবনে জাবাল (রা)। এরাও ইয়ামন দেশের অন্য গোত্রের লোক। ইনি কে? ইনি যিয়াদ ইবনে ছাআলাবা (রা) উযদু গোত্রের লোক। ইনি কে? ইনি খাব্বাব ইবনে ইর্ত (রা), তামীম গোত্রের লোক। ---------এরা হচ্ছেন আবদুল কায়েস গোত্রের মুনকায ইবদে জাম (রা) ও মানযার ইবনে আসেদ (রা), এসেছেন বাহরাইন থেকে। আর এরা হচ্ছেন আম্মানের সর্দার উবাইদ (রা) ও জাফর (রা)। ইনি হচ্ছেন মাআন অর্থাৎ সিরিয়া এলাকার অধিবাসী ফারদাহ (রা)। এ কৃষ্ণকায় লোকটি কে? ইনি হচ্ছেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী বেলাল (রা)। আর ইনি কে? ইনি হচ্ছেন রোমের অধিবাসী সোহায়েব রুমী (রা)। এ লোকগুলি কারা? এরা হচ্ছেন ইরানের সালমান ফারসী (রা), ফিরোজ দাইলামী (রা), সাইখাত (রা) ও মারকাবুদ (রা)। এরা পুরুষানুক্রমে ইরানের বাসিন্দা।

হিজরী ষষ্ঠ শতকে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এমন একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করা হয় যা ইসলামের আসল উদ্দেশ্যের পরিপূরক। অর্থাৎ কুরাইশ ও মুসলমান উভয় পক্ষে যুদ্ধ মুলতবী করতে হবে এবং মুসলমানরা যেখানে ইচ্ছা তাদের ধর্মের দাওয়াত দান করতে পারবে। এ বিরাট সাফল্য লাভের পর ইসলামের পয়গম্বর কি করেন? ঐ বছর ৬ হিজরীতে তিনি সকল সুলতান ও রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে ইসলামী দাওয়াত সম্বলিত পত্র পাঠান এবং তাদের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়ে দেন। দেহিয়া কালবী (রা) রুমের কায়সার হিরাক্লিয়াসের দরবারে, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহামী (রা) ইরানের শাহানশাহ খসরু পারভেজের দরবারে; হাতিব ইবনে বালতায়া (রা) মিসরের গভর্নর মুকাওকাসের দরবারে, আমর ইবনে উমাইয়া (রা) আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজজাশীর দরবারে, সুজা' ইবনে দাহাবুল আসাদী

www.bjilibrary.com

(রা) সিরিয়া প্রধান হারেস গাসসানীর দরবারে এবং সালীত ইবনে আমর (রা) ইয়ামামার প্রধানগণের দরবারসমূহে রাসূলুল্লাহ (স)-র পত্র বহন করে নিয়ে যান যে, তাঁর শিক্ষায়তনের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত।

বন্ধুগণ! এ আলোচনা থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-র শিক্ষায়তনের সর্বজনীনতার এ দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বর্ণ ও আকৃতি, দেশ ও রাষ্ট্র, জাতি ও বংশ এবং ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গিমার প্রশ্নই ছিল না। বরং তার দ্বার দুনিয়ার সকল জাতি, সকল বংশ, সকল দেশ ও সকল ভাষাভাষীর জন্য সমান ভাবে উন্মুক্ত ছিল।

এবার আসুন এ শিক্ষায়তনের অবস্থা ও মর্যাদা পর্যালোচনা করি। এটি কি এমন একটি স্কুল ও কলেজ, যেখানে একটি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়? অথবা এটি একটি ব্যাপক ও সর্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয়– যেখানে রুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেক দেশের অধিবাসী ও প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিবর্গ শিক্ষা লাভ করে থাকে। হযরত মূসা (আ)-র শিক্ষায়তন দেখুন! সেখানে কেবল সিপাহী, ইউশার ন্যায় সেনানায়ক ও বিচারপতি এবং কতিপয় ধর্মীয় পদাধিকারী পাওয়া যায়। হযরত ঈসা (আ)-র ছাত্রদের সন্ধান করুন! কতিপয় কৃচ্ছ্রসাধনকারী ফকিরকে দেখতে পাবেন ফিলিস্তীনের গলি পথে। কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র এখানে কি দেখবেন? একদিকে আছেন আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী বাদশাহ আসমাহা (রা), মাআনের প্রধান ফারদা (রা), হামীরের প্রধান যুলকোলা (রা), হামদান গোত্রের প্রধান আমির ইবনে শাহর (রা), ইয়ামনের প্রধান ফিরোজ দায়লামী (রা) ও মারকাবুদ (রা), আম্মানের প্রধান উবাইদ (রা) ও জাফর (রা) এবং অন্যদিকে বেলাল (রা), ইয়াসির (রা), সোহাইব (রা), খাব্বাব (রা), আম্মার (রা) ও আবূ ফকীহা (রা)-র ন্যায় গোলাম এবং সুমাইয়া (রা), লোবীয়া (রা), যীযা (রা), নাহদীয়া (রা) ও উম্মে উবাইস (রা)-এর ন্যায় বাঁদীগণ। গভীরভাবে নিরীক্ষণ করুন, এখানে আমীর-গরীব, বাদশাহ-ফকির, প্রভু-ভৃত্য সবাইকে এক সারিতে দণ্ডায়মান দেখতে পাবেন।

একদিকে বুদ্ধিজীবীগণ, প্রকৃতির রহস্যজ্ঞানী, দেশশাসক ও পরিচালকগণ তাঁর শিক্ষাগার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বের হয়েছেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা), উমর ফারূক (রা), উসমান গনী (রা), আলী মুর্তজা

www.bjilibrary.com

(রা), মুআবীয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা) পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ড শাসন করেছেন এবং এমনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছেন যে, তাঁদের সামনে বড় বড় শাহানশাহ ও শাসকগণের রাজনীতি, কূটনৈতিক কার্যক্রম ও শাসন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিধান ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষ্প্রভ ও বাতিল হয়ে যায়। তাঁদের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত রায়সমূহ ইরানী শাসনতন্ত্র ও রোমীয় আইনকে প্রভাবহীন করে দেয় এবং দুনিয়ার রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসে এমন স্থান অধিকার করে, যার কোন নজীর পেশ করা যেতে পারে না।

অন্যদিকে আছেন খালিদ ইবনে ওলীদ (রা), সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা), আবূ উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা) ও আমর ইবনুল আস (রা)। তাঁরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জালিম, পাপাসক্ত ও মানবতার জন্য অভিশাপ স্বরূপ পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি বিশাল সাম্রাজ্যকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এভাবে তাঁরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ও বিজয়ী প্রমাণিত হন। তাঁদের বিজয় অভিযানের কাহিনী আজও মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে। সাআদ (রা) ইরাক ও ইরানের রাজমুকুট ছিনিয়ে এনে ইসলামের পদতলে নিক্ষেপ করেন। খালিদ (রা), আবূ উবাইদ (রা) রোমীয়দেরকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতিশ্রুত ভূ-খণ্ডের আমানত মুসলমানদের নিকট সোপর্দ করেন। আমর ইবনুল আস (রা) ফিরাউনের দেশ নীল নদের অববাহিকা রোমান সাম্রাজ্যের হাত থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) ও ইবনে আবী সারাহ (রা) আফ্রিকার বিশাল ভূ-খণ্ড শত্রুদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন। এই বিশ্ববিখ্যাত বিজেতা ও সেনানায়কগণের যোগ্যতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শুধু স্বীকৃতিই লাভ করেনি বরং ইতিহাস তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রমাণ পেশ করেছে।

তৃতীয় দিকে বাযান (রা) ইবনে হাসান (ইয়ামন), খালেদ (রা) ইবনে সাঈদ (সানয়া), মুহাজির (রা) ইবনে উমাইয়া (কান্দা), যিয়াদ (রা) ইবনে লোবীদ (হাদরামাউত), আমর (রা) (তাইমা), আলা (রা) ইবনে হাযরামী (বাহরাইন) প্রমুখ অসংখ্য সাহাবা সাফল্যজনকভাবে বিভিন্ন শহর ও প্রদেশ শাসন করে আল্লাহর সৃষ্ট জীবকুলের জীবন সুখ-শান্তিতে ভরপুর করে তোলেন।

www.bjilibrary.com

চতুর্থ দিকে আছেন উলামা ও ফকীহগণের দল। উমর (রা) ইবনে খাত্তাব, আলী (রা) ইবনে আবী তালেব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত উম্মে সালামা (রা), উবাই ইবনে কাব (রা), মুআয ইবনে জাবাল (রা), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), ইবনে যুবাইর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ ইসলামী ফিকাহ ও আইন শাস্ত্রের ভিত রচনা করে দুনিয়ার আইন প্রণেতাগণের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেন।

পঞ্চম সারিতে আছেন সাধারণ হাদীস সংকলনকারী ও ইতিহাস রচয়িতাগণ। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হরতর আবূ মূসা আশয়ারী (রা), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা), হযরত ইবাদা ইবনে সামেত (রা), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হযরত বারায়া ইবনে আযেব (রা) প্রমুখ অসংখ্য সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (স)-র নির্দেশ ও ঘটনাবলী সংগ্রহ ও বর্ণনা করেন।

সাহাবাগণের ষষ্ঠ দলটিতে আছেন সত্তর জন আসহাবে সুফ্ফা। মসজিদে নববীর উঠান ছাড়া তাঁদের মাথা গুঁজবার দ্বিতীয় কোন স্থান ছিল না। দেহের সঙ্গে জড়ানো কাপড়টি ছাড়া দুনিয়ায় তাঁদের মালিকানায় দ্বিতীয় কোন বস্তু ছিল না। তাঁরা দিনের বেলা জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে আনতেন এবং তা বিক্রি করে নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন, তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয়ও করতেন এবং রাত্রিবেলা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী-করতেন।

সপ্তম দিকে নজর করুন! আবূ যর (রা)-কে দেখা যাবে পৃথিবী বক্ষে তাঁর চাইতে অধিক সত্যভাষী আজও জন্ম নেয়নি। তাঁর মতে আজকের খাদ্য আগামীকালের জন্যে উঠিয়ে রাখাও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার বিরোধী। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁকে 'মসীহুল ইসলাম' উপাধি দান করেন। সালমান ফারসী (রা)-কে দেখুন, তিনি তাকওয়া ও কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতিমূর্তি। আবুদল্লাহ ইবনে উমরকেও দেখুন। ত্রিশ বছর তিনি পূর্ণ অনুসৃতি ও ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করেন। আর যখন তাঁর নিকট খেলাফত পেশ করা হলো তখন বললেন, যদি এর দরুন মুসলমানদের একবিন্দুও রক্তপাত হয়, তাহলে আমার নিকট এ খেলাফত গ্রহণযোগ্য নয়। মুসাআব ইবনে

www.bjilibrary.com

উমাইর (রা)-কেও দেখুন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাকম (পরিধেয়রূপে ব্যবহৃত এক জাতীয় সূক্ষ্ম ও মোলায়েম এবং অতি মূল্যবান চর্ম) ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করতেন। তিনি অত্যন্ত প্রাচুর্য ও বিলাসিতার মধ্যে লালিত-পালিত হন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি মোটা ও তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন এবং যখন শাহাদত লাভ করলেন তখন তাঁর কাফনের জন্য পুরা কাপড়ও পাওয়া গেল না, অবশেষে পায়ের ওপর ঘাস ছড়িয়ে দিয়ে তাঁকে দাফন করা হলো।

উসমান ইবনে মাযঊন (রা)-কেও দেখুন। তাঁকে ইসলামের প্রথম সূফী বলা হয়।

আবার মুহাম্মদ ইবনে সালমা (রা)-কে দেখুন। তিনি ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার যুগে বলতেন, 'যদি কোন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার কক্ষে প্রবেশ করে তাহলেও আমি তার ওপর আঘাত হানবো না। আবূ দারদা (রা)-কেও দেখুন। তাঁর রাত্রি নামাযের মধ্যে এবং দিন রোযার মধ্যে অতিবাহিত হত।

আর একদিকে দেখুন! দুঃসাহসী কর্মবীর ও বিচক্ষণ আরবদের দল এটি। এঁদের মধ্যে আছেন তালহা (রা), যুবাইর (রা), মুগীরা (রা), মিকদাদ (রা), সাআদ ইবনে মুআয (রা), সাআদ ইবনে ইবাদা (রা), উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা), আসআদ ইবনে যিয়ারা (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)। মক্কার ব্যবসায়ী ও সওদাগরদের দেখুন আর মদীনার কৃষকদেরকেও দেখুন। তাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), এবং সাআদ ইবনে যুবাইর (রা)-এর ন্যায় ধনীও দেখতে পাবেন।

আর একটি দল হচ্ছে শহীদ ও নিরপরাধ নিহত ব্যক্তিদের। তাঁরা আল্লাহর পথে তাঁদের প্রিয় জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তবুও সত্যের সঙ্গ ত্যাগ করতে সম্মত হননি। হযরত খাদীজা (রা)-র প্রথম স্বামীর পুত্র হালাকে তলোয়ার দ্বারা কেটে কুচি কুচি করা হয়। হযরত আম্মার (রা)-র মাতা সুমাইয়া (রা) আবূ জেহেলের বর্শার আঘাতে নিহত হন। হযরত ইয়াসের (রা) কাফেরদের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খোবাইব (রা) শূলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত যায়েদ (রা) তরবারির নিচে গলা বাড়িয়ে দেন। হারাম ইবনে মালাহাম ও তাঁর উনসত্তর

www.bjilibrary.com

জন সাথী বীরে মাউনায় আসীয়াতুর রেহেল ও যাকয়ান উপজাতিদ্বয়ের হস্তে নির্দয়ভাবে শাহাদত বরণ করেন। রাজীয়ের ঘটনায় হযরত আসেম ও তাঁর সাতজন সঙ্গীর দেহ বনু লাহিয়ানের একশ জন তীরন্দাজের তীরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়। সপ্তম হিজরীতে ইবনে আবী রজার ৪৯ জন সাথী বনু সালীম গোত্রের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত কাব ইবনে উমর সাফফারী (রা) তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ 'যাতেইতলাহে'র ময়দানে শাহাদত লাভ করেন। দুনিয়ার একটি বহুল পরিচিত ধর্ম মাত্র একটি শূলবিদ্ধ মৃত্যুকে নিয়ে গর্ব করে কিন্তু ইসলামের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে অসংখ্য শূলবিদ্ধ মৃত্যু ও নির্মম হত্যা এবং শত শত কোরবানী গাহের নীরব সাক্ষী আজও দণ্ডায়মান।

তরবারি ও বর্শার আঘাত অথবা শূলদণ্ড এগুলি সাময়িক কষ্ট। কিন্তু সত্যানুসারীর জীবন এর চাইতে অধিক দৃঢ়তা এবং এর চাইতে অধিক ধৈর্য ও পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। একমাত্র সত্যেরই কারণে তাঁরা বছরের পর বছর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন। তাঁরা জ্বলন্ত-আগুনের অগ্নিশিখা ও উত্তপ্ত বালুকার ওপর শুয়ে থাকতেন এবং বড় বড় পাথরখণ্ড নিজেদের বুকের ওপর ধারণ করেছেন। তাঁদের গলায় দড়ি বেঁধে টানা হয় তবু জিজ্ঞাসিত হয়ে বার বার মুহাম্মদ (স)-এর কালেমাই তাঁদের মুখে উচ্চারিত হয়, 'আবূ তালেব গিরিসঙ্কটে' তাঁরা তালাহ বৃক্ষের পাতা খেয়ে জীবনযাপন করেন। সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, এক রাতে ক্ষুধার তাড়নায় একটি শুকনা কাপড় পেয়ে সেটিকে ধুয়ে আগুনে ভাজা করে পানি মিশিয়ে খেয়ে ফেললাম। আম্বাসা ইবনে গাযাওয়ান বলেন, আমরা সাতজন মুসলমান ছিলাম। অনভ্যস্ত খাদ্য খেয়ে খেয়ে আমাদের ঠোঁট ও জিভের চামড়া জখম হয়ে গিয়েছিল। খাব্বাব (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কাফেররা তাঁকে জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে দেয় এবং তাঁর শরীরের চর্বি গলে গলে এ আগুন নিভে যায়। বেলাল (রা)-কে দুপুরের উত্তপ্ত মরু-বালুকার ওপর শুইয়ে দেয়া হত এবং বুকের ওপর স্থাপন করা হত বড় বড় পাথরখণ্ড। তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে গলিতে গলিতে টেনে নেয়া হত। আবূ ফকীহা (রা)-র পায়ে দড়ি বেঁধে পথে পথে ঘুরানো হয়। তাঁর গলা টিপে ধরা হয়। তাঁর বুকের ওপর এত বড় পাথর রাখা হয় যে, তাঁর জিভ বেরিয়ে পড়ে। আম্মার

www.bjilibrary.com

(রা)-কে উত্তপ্ত মরু বালুকার ওপর শুইয়ে বেদম প্রহার করা হত। হযরত যুবাইর (রা)-কে তাঁর চাচা চাটাইয়ে জড়িয়ে নাকের মধ্যে ধোঁয়া প্রবেশ করাত। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)-কে দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রহার করা হত। হযরত উসমান (রা)-কে তাঁর চাচা দড়ি দিয়ে বেঁধে মারপিট করত। এসব কিছু সংঘটিত হচ্ছিল, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যে নেশায় তাঁরা বিভোর হয়েছিলেন তার ঘোর কাটতে চাচ্ছিল না। এ আবার কেমন নেশা? এ ছিল কাওসারের পানি যিনি পান করাচ্ছিলেন তাঁর চিরন্তন পানশালার পানীয় পানের নেশা।

বন্ধুগণ! চিন্তা করুন, এরা সেই বর্বর মূর্তিপূজারী ও অসভ্য আরব! এদের মধ্যে একি বিপ্লব সংঘটিত হলো? এক নিরক্ষর ব্যক্তির শিক্ষা মূর্খ আরবদেরকে বুদ্ধিমান, স্বচ্ছ চিন্তা ও হৃদয়ের অধিকারী এবং আইনবিদে পরিণত করল কেমন করে! এক নিরস্ত্র পয়গম্বরের আবেগময় প্রচার কিভাবে দুর্বল আরবদেরকে সেনানায়ক ও বীর যোদ্ধায় পরিণত করে নতুন শক্তি শৌর্যবীর্যে ভরপুর করে তুলল। যারা আল্লাহর নামও জানত না তারা আবার কেমন করে এহেন রাত্রি জাগরণকারী সাধক মুত্তাকী ও আনুগত্যশীলে পরিণত হলো! আপনারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র শিক্ষায়তন বা মদীনার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যটন শেষ করেছেন। সেখানে সকল বর্ণের ও সকল রুচি-প্রকৃতির ছাত্র দেখেছেন। আলেম দেখেছেন, আইন প্রণেতা দেখেছেন, সিপাহী দেখেছেন, আদালতের বিচারক দেখেছেন, শাসক ও গভর্নর দেখেছেন, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত দেখেছেন, বাদশাহ ও আমীর দেখেছেন, গোলাম দেখেছেন, প্রভুও দেখেছেন, যোদ্ধা দেখেছেন, মৃত্যুবরণকারীও দেখেছেন, সত্যের পথে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকেও দেখেছেন। এথেকে আপনারা সিদ্ধান্তে পৌছালেন। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র মধ্যে মানবিক গুণাবলীর যোগ্যতা ও শক্তির যে পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল, এ কথার স্বীকৃতি ছাড়া এসব থেকে আর কোন সিদ্ধান্তে আপনি পৌছতে পারেন? আর এ সমস্তই ছিল তাঁর সর্বজনীন গুণাবলীর বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশ। এসব গুণাবলীও কখনো সিদ্দিক ও ফারুকরূপে প্রদীপ্ত হয়েছে, কখনো যুন্নুরাইন ও মুর্তযার রূপ ধারণ করেছে, কখনো খালিদ ও আবূ উবাইদা এবং কখনো সা'দ ও জাফর তাইয়ার রূপে হাজির হয়েছে,

www.bjilibrary.com

কখনো ইবনে উমর ও আবূ যর এবং সালমান ও আবূ দারদারূপে মসজিদ ও মেহরাবে দৃশ্যমান হয়েছে। কখনো তা ইবনে আব্বাস ও উবাই ইবনে কা'ব এবং যায়েদ ইবনে সাবেত ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রূপে জ্ঞান ও শিক্ষায়তন এবং বুদ্ধি-তত্ত্ব জ্ঞানের অঙ্গনের রূপ ধারণ করেছে। আবার কখনো বেলাল ও সোহায়েল এবং আম্মার ও খোবাইবের পরীক্ষাগৃহে হৃদয় ও আত্মার সান্ত্বনার বাণী হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র অস্তিত্ব ছিল বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সূর্যের ন্যায়। সুউচ্চ পাহাড়, বালুকাময় মরুভূমি, প্রবহমান স্রোতস্বিনী, শস্যশ্যামল ক্ষেত সবাই নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তা থেকে উত্তাপ ও আলো সংগ্রহ করত। অথবা এ ছিল যেন বর্ষার মেঘমালা। পাহাড় পর্বত, বন-জঙ্গল, ক্ষেত-খামার, মরু-ময়দান, প্রান্তর-বাগান সব কিছুই এ বারিধারায় প্লাবিত হতো। প্রত্যেকেই সাধ্য অনুসারে এ বারিধারা পান করে বিভিন্ন বর্ণের পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হয়ে উঠতো।

এ বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন জনের যোগ্যতার পার্থক্য সত্ত্বেও একটি বিষয় সবার মধ্যে সাধারণ ছিল। আর সেটি হচ্ছে একই প্রকারের বিদ্যুৎ প্রবাহ যা সকলকেই স্পন্দিত করছিল। একই জীবনশক্তি যা সকলের বুকে সঞ্চারমান ছিল। বাদশাহ-ফকীর, আমীর-গরীব, শাসক-শাসিত, বিচারক-সাক্ষী, সেনানায়ক-সিপাহী, শিক্ষক-ছাত্র, ইবাদতকারী, কৃচ্ছ্রসাধক ও ব্যবসায়ী, ধর্মযোদ্ধা অথবা শহীদ সবার মধ্যে তওহীদের জ্যোতি, আন্তরিকতার প্রবাহ, ত্যাগের প্রেরণা, মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি কর্মে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বাসনা সর্বত্র সক্রিয় ছিল। তাঁরা যে পর্যায়েরই হোন, যেখানেই থাকেন এবং যে কাজই করুন না কেন, তাঁদের সবার মধ্যে এ প্রেরণাগুলি সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। রুচি-প্রকৃতি ও পথের পার্থক্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ সকলেরই এক, একই কুরআন, একই রাসূল, একই কাবা সকলেই মেনে চলত। সকল রুচি, সকল পথ ও কাজের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার সংশোধন, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি, আল্লাহর নামকে বুলন্দ করা এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করা। এ ছাড়া তাদের সম্মুখে আর কোন উদ্দেশ্যই ছিল না।

www.bjilibrary.com

বন্ধুগণ! আজকের বক্তৃতায় আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র সর্বজনীন গুণাবলীর বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় দিক আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করলাম। বিশ্ব-প্রকৃতিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর যদি আপনারা বিশ্বাস করেন যে, এ দুনিয়া মানুষের রুচি-প্রকৃতি, যোগ্যতা ও সামর্থ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যি স্বীকার করতে হবে যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র সর্বজনীন ও সর্বগুণাধার ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন মানুষ সর্বশেষ, চিরন্তন ও বিশ্বজনীন নেতা হতে পারে না। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

'যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণের দাবী করে থাক, তাহলে আমার আনুগত্য কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' যদি তোমরা বাদশাহ হও, তাহলে আমার আনুগত্য কর। যদি তোমরা প্রজা হয়ে থাক, তাহলেও আমার আনুগত্য কর। যদি সিপাহসালার ও সিপাহী হয়ে থাক, তাহলেও আমার আনুগত্য কর। যদি শিক্ষক ও অধ্যাপক হয়ে থাক, তবু আমার আনুগত্য কর। ধনী হলেও আমার আনুগত্য কর এবং গরীব হলেও আমার আনুগত্য কর। অসাহায় ও মজলুম হলেও আমার আনুগত্য কর। আল্লাহর ইবাদতকারী এবং জাতির খাদেম হলেও আমার আনুগত্য কর। মোটকথা, তোমরা যে নেক পথই অবলম্বন কর এবং যত উন্নততর ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শের প্রত্যাশী হও আমার আনুগত্যের ভিতর দিয়েই তা লাভ করবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

www.bjilibrary.com

ষষ্ঠ বক্তৃতা

বাস্তব কর্মজীবন

১

www.bjilibrary.com

বাস্তব কর্মজীবন

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

'আল্লাহর রাসূলের জীবনই তোমাদের জন্য মহত্তম আদর্শ।'

বন্ধুগণ! মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র আনুগত্য কোন ব্যাপারে ও কিভাবে করা উচিত এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য এখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবন ও চরিত্রের বাস্তব দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এটি নবী ও ধর্মপ্রবর্তকগণের জীবনের এমন একটি অধ্যায়, যার প্রায় সব অংশটুকুই শূন্য। কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবনের এ অধ্যায়টিই সবচাইতে ব্যাপক ও বিস্তৃত। নবীগণের নেতা ও সর্বশেষ নবী কে হতে পারেন, এ সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য এই একটি মানদণ্ডই যথেষ্ট। সদুপদেশ, মধুর বাণী ও উন্নত শিক্ষার অভাব এখানে নেই, অভাব হচ্ছে প্রচারিত নীতি এবং বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রতিপালনের। বর্তমান ধর্মগুলির প্রবর্তক ও প্রচারকগণের জীবন-কথার সবটুকু পাঠ করলে সেখানে সুন্দর মতবাদ, মনোরম কাহিনী, বক্তাসুলভ বড় বড় দাবী, বক্তৃতার ঝড়, মুখরোচক ও সুবিন্যস্ত শব্দ এবং অত্যধিক আবেগ ও উৎসাহ পাওয়া যাবে। চমৎকার উপমা কিছুক্ষণের জন্য হৃদয় জয় করে নেবে বটে, কিন্তু যে বিষয়টি সেখানে পাওয়া যাবে না, সেটি হচ্ছে নিজের প্রচারিত আদেশ-নিষেধগুলি সর্বপ্রথম নিজে পালন ও কার্যকর করে দেখানো।

মানুষের কর্ম জীবনের নাম হচ্ছে চরিত্র। কুরআন ছাড়া অন্য কোন ধর্মপুস্তক কি তার প্রবর্তকের স্বপক্ষে এ দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, বাস্তব কর্মজীবনের মানদণ্ডেও তিনি উন্নততর মানুষ ছিলেন? কিন্তু কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে এবং বন্ধু ও শত্রুদের সমাবেশে ঘোষণা করেছেঃ

www.bjilibrary.com

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ - وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ -

'অবশ্যি তোমার পারিতোষিক শেষ হবার নয়, আর অবশ্যি তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।' (সূরা আল কলম- ৩-৪)

এখানে 'আর' যদিও ব্যাকরণের দৃষ্টিতে নিছক একটি অব্যয় পদ এবং তা পূর্বাপর দুটি বাক্যকে সংযুক্ত করেছে। কিন্তু আসলে আয়াতের অন্তর্নিহিত ইশারা ও বাক্য সংযোজনের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, একটি হচ্ছে ঘটনা এবং অন্যটি হচ্ছে তার কারণ। অর্থাৎ একটি হচ্ছে দাবী, অন্যটি হচ্ছে তার প্রমাণ। প্রথম বাক্যে তাঁর (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর) পারিতোষিক শেষ না হবার দাবী করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে এর স্বপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে তাঁর কর্মজীবন ও চরিত্রকে পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর কর্মজীবন ও চরিত্রই প্রমাণ করে যে, তাঁর পারিতোষিক কখনো শেষ হবার নয়। মক্কার উম্মী শিক্ষক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উচ্চঃস্বরে সবাইকে আহবান জানিয়ে বলেছিলেন ঃ

لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ -

'কেন তোমরা তা বল, যা কর না?' (আস্ সফ)

একথা ঘোষণা করার অধিকার তাঁর ছিল। কেননা তিনি যা কিছু বলতেন তাকে বাস্তবে কার্যকরী করে দেখিয়ে দিতেন। তূর পাহাড়ের বক্তা ও উপদেশক (হযরত ইউশা) এবং সাফা পাহাড়ের প্রচারক (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ) উভয়ের জীবন-কাহিনী এ দৃষ্টিতে যাচাই করুন। তাহলে জানতে পারবেন যে, একজনের চরিত্রে এর ছিটেফোঁটাও নেই আর অন্যজনের চরিত্রে তা পূর্ণরূপে বিরাজমান। শক্তিলাভ করার পর ক্ষমা ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত পেশ করা উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। কিন্তু কোন অক্ষম, দুর্বল ও শক্তিহীনের নীরবতাকে ক্ষমা ও ধৈর্য আখ্যা দান করা যায় না। এক ব্যক্তি কাকেও আঘাত করেনি, কাকেও হত্যা করেনি, কারোর সাথে অসদ্ব্যবহার করেনি, কারোর অর্থ লুট করেনি, কোন গৃহ নির্মাণ করেনি, কিছুই সংগ্রহ করেনি। কিন্তু এসব কিছু হচ্ছে নেতিবাচক গুণ। এখন বলুন, সে কাকেও আঘাত করেনি–একথা ঠিক। কিন্তু সে কোন অভাবী ও দুর্বলকে সাহায্য করেছে কি? কাকেও হত্যা করেনি, কিন্তু কারোর প্রাণরক্ষা

www.bjilibrary.com

করেছে কি? কারোর সাথে অসদ্ব্যবহার করেনি, কিন্তু কারোর সাথে সদ্ব্যবহার করেছে কি? কারোর অর্থ লুট করেনি, কিন্তু কোন গরীব ও অভাবীকে কিছু দিয়েছে কি? নিজের জন্য কোন ঘর তৈরি করেনি, কিন্তু কোন গৃহহীন ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছে কি? নিজের জন্য কিছু সংগ্রহ করেনি, কিন্তু অন্যের জন্য কিছু করেছে বা করিয়েছে কি? পৃথিবীর প্রয়োজন এই ইতিবাচক গুণাবলীর এবং এরি নাম হচ্ছে বাস্তব কর্মজীবন।

কুরআন সাক্ষ্য দেয় ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ

'আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের জন্য কোমল। (হে মুহাম্মদ) আর যদি তুমি কঠোর হৃদয় হতে তাহলে অবশ্যি এঁরা (যারা তোমার চতুষ্পার্শ্বে জমা হয়েছে) তোমার পাশ থেকে সরে যেত।'

এটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-র কোমল হৃদয়ের দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা। দাবী ও প্রমাণসহ তা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ যদি তিনি কোমল হৃদয় ও দয়ালু না হতেন, তাহলে এই বর্বর, নির্ভীক ও উগ্র মেজাজের অধিকারী আরবেরা কোন দিন তাঁর চারপাশে জমায়েত হত না।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

'তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে একজন নবী এসেছেন। তোমাদের কষ্ট তাঁর নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তোমাদের উপকার করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি ঈমানদারদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র হৃদয়।' (সূরা আত্ তাওবা- ১২৮)

এ আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-র সকরুণ হৃদয়ানুভূতির উল্লেখ করেছেন। তাই বলেন ঃ হে মানব জাতি! তোমাদের কষ্ট ও বিপদ, তোমাদের পাপাচার এবং যুদ্ধ ও জিহাদের কারণে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট রাসূলুল্লাহ (স)-র অন্তরকে ব্যথিত করে এবং তোমাদের উপকার ও কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি সর্বদা উদ্বিগ্ন।

www.bjilibrary.com

মানবজাতির প্রতি এত কল্যাণ কামনাই তাঁকে তোমাদের মধ্যে সত্য প্রচার এবং তোমাদের সত্য পথে আহবান জানানো ও উপদেশ দানে উদ্বুদ্ধ করেছে। যারা তাঁর আহবান ও উপদেশ গ্রহণ করে তাদের সাথে তিনি স্নেহপূর্ণ ও কোমল ব্যবহার করেন। মোটকথা, এ আয়াতে এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স) সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকামী ছিলেন এবং বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি তিনি ছিলেন স্নেহশীল ও কোমল হৃদয়। তাঁর বাস্তব চরিত্র সম্পর্কে এ হচ্ছে আল্লাহর সাক্ষ্য।

ইসলামের বিধি-বিধান ও রাসূলুল্লাহ (স)-র পবিত্র কণ্ঠ থেকে মানুষকে যে শিক্ষা দান করা হয়েছে, তার সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। একজন কর্মতৎপর নবী হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-র পবিত্র জীবন ও চরিত্র প্রকৃতপক্ষে কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। তাঁর ওপর যে বিধান নাযিল করা হয়েছে, তিনি নিজেই তা কার্যকর করে দেখিয়েছেন। ঈমান, তওহীদ, সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যাকাত, সাদকা, খয়রাত, জিহাদ, ত্যাগ, কুরবানী, হিম্মত, দৃঢ়তা, সবর, শোকর এবং এ ছাড়াও সৎ কাজ ও সচ্চরিত্র সম্পর্কে যত কথা তিনি বলেছেন, সব কিছুতেই তিনি নিজের বাস্তব কর্মজীবন থেকে নমুনা পেশ করেছেন। যা কিছু কুরআনে রয়েছে তার সমস্তই তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কতিপয় সাহাবী হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট হাজির হয়ে বললেন ঃ হে উম্মুল মুমেনীন! রাসূলুল্লাহ (স)-র চরিত্র ও স্বভাব বর্ণনা করুন। হযরত আয়েশা (রা) জবাবে বললেন ঃ তোমরা কি কুরআন পড়নি?

كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلْعَمَ اَلْقُرْاٰنَ ـ

অর্থাৎ 'সমগ্র কুরআনটিই ছিল তাঁর চরিত্র' (আবূ দাউদ)।

কুরআন হচ্ছে শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র চরিত্র তার ব্যাখ্যা।

মানুষের চরিত্র, অভ্যাস ও কাজ সম্পর্কে স্ত্রীর চাইতে অধিক আর কেউ জানতে পারে না। হযরত খাদীজা (রা)-কে বিয়ে করার পনর বছর পর রাসূলুল্লাহ (স) নবুয়তের দাবী করেন। একজনের পক্ষে অপরাজনের স্বভাব,

www.bjilibrary.com

চরিত্র, অভ্যাস প্রভৃতি যথার্থরূপে জানার জন্যে পনের বছরের সংসর্গ যথেষ্ট। তাই রাসূলুল্লাহ (স)-র মুখ থেকে নবুয়তের দাবী উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই হযরত খাদীজা (রা) তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে রাজি হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (স) যখন নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব লাভ করে ঘাবড়ে যান, তখন হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে প্রবোধ দান করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কখনো আপনাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছাড়বেন না। কেননা আপনি আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করেন, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করেন, গরীবকে সাহায্য করেন, মেহমানকে আপ্যায়িত করেন, হকের পক্ষাবলম্বন করেন, বিপদে আপনি মানুষের সাহায্য করেন।" (বুখারী) চিন্তা করুন, এগুলি হচ্ছে তাঁর জীবনের বাস্তব কর্মতৎপরতার দৃষ্টান্ত। নবুয়তের পুর্বেও তিনি এসব কাজ সম্পাদন করতেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-র স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা)-র পর হযরত আয়েশা (রা) নয় বছর তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন। তিনি সাক্ষ্য দেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) কাউকে অভিশাপ দিতে, কারো নিন্দা করতে বা কারো সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি দুষ্কর্মের বিনিময়ে দুষ্কর্ম করতেন না বরং ক্ষমা করে দিতেন। তিনি গোনাহর কাজ থেকে বহু দূরে অবস্থান করতেন। তিনি কখনো কারোর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তিনি কখনো কোন চাকর-চাকরাণী, পুরুষ অথবা নারী এমনকি কোন পশুকেও কোনদিন আঘাত করেননি। তিনি কখনো কারো বৈধ আবেদন ও অনুরোধ বাতিল করেননি।

আত্মীয়দের মধ্যে তাঁর দিবারাত্রের অবস্থা ও চরিত্র সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-র চাইতে অধিক কেউই ওয়াকিফহাল ছিলেন না। তিনি শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-র সাহচর্যে ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) সদা প্রফুল্ল, কোমল স্বভাবের ও সদাচারী ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল করুণাসিক্ত। তিনি কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না। কখনো কোন খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের করতেন না। তিনি মানুষের দোষ ও দুর্বলতা খুঁজে বেড়াতেন না। কারোর কোন অনুরোধ যদি তাঁর অপসন্দনীয় হত, তাহলে তিনি নীরব থাকতেন। স্পষ্ট জবাব দিয়ে তাকে ব্যথিত করতেন না এবং মঞ্জুরীও দান করতেন না। বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যবহারের দ্বারাই

www.bjilibrary.com

প্রকৃত বিষয় বুঝতে পারত। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি কারো আশা ভঙ্গ করতে চাইতেন না, আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিনিয়ে নিয়ে কারো হৃদয়কে ভেঙ্গে দিতেন না, আহত হৃদয়ে মলম লাগানোই ছিল তাঁর কাজ। কেননা তিনি ছিলেন দয়ার্দ্র হৃদয় ও করুণাশীল।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ তিনি উদারচেতা, অত্যন্ত দানশীল, সত্যভাষী ও কোমল স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন। লোকেরা তাঁর কাছে বসে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। যে ব্যক্তি প্রথমবার তাঁকে দেখত সে ভীত হত। কিন্তু এরপর যতই তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করত ততই তাঁকে অধিক ভালবাসতে শুরু করত। –(শামায়েলে তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবনী পাঠ করে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গীবন হুবহু এ মতই ব্যক্ত করেছেন।

হযরত খাদীজা (রা)-র প্রথম স্বামীর পুত্র হযরত হিন্দ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-র আশ্রয়ে লালিত হন। তিনি সাক্ষ্য দেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) কোমল স্বভাবের ছিলেন, কঠোর ছিলেন না। কারো মনে দুঃখ দিতেন না। কারো মর্যাদা বিরোধী কোন কথা বলতেন না। সামান্য সামান্য ব্যাপারে অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কোন জিনিসকে খারাপ বলতেন না। যে প্রকারের খাদ্যই সামনে আসত–আহার করতেন, তাকে খারাপ বলতেন না। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না, কারো নিকট থেকে বিনিময় বা প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না এবং কারো মনে দুঃখ দেওয়া পসন্দ করতেন না, কিন্তু যদি কেউ কোন সত্য কথার বিরোধিতা করতো; তাহলে সত্যের পক্ষাবলম্বনে তিনি রাগান্বিত হতেন এবং এ সত্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতেন।–(শামায়েল)।

যারা রাসূলুল্লাহ (স)-র সবচাইতে নিকটবর্তী ও তাঁর সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন, এসবই হচ্ছে তাঁদের সাক্ষ্য। তাঁর বাস্তব কর্মজীবন যে কত উন্নত ছিল, এসব বিবরণ থেকেই তা জানা যাবে।

তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বলতার দিক হচ্ছে এই যে, নবী হিসাবে তিনি নিজের অনুসারীদেরকে যে সমস্ত উপদেশ দান করেন সর্বপ্রথম তিনি নিজেই সেগুলি পালন করেন।

তিনি মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে ও তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ করতে। এ উপদেশের যে প্রভাব সাহাবাদের জীবনে

www.bjilibrary.com

ফুটে উঠেছে তা অবশ্যি স্বতন্ত্র। প্রশ্ন হচ্ছে তাঁর নিজের জীবনে এর প্রকাশ কি পরিমাণ ছিল? দিবারাত্রির মধ্যে এমন সময় খুব কমই ছিল যখন তাঁর হৃদয় আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর কণ্ঠ আল্লাহর নাম উচ্চারণ হতে বিরত থাকত। ওঠাবসা, চলাফেরা, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, কাপড় পরিধান ইত্যাদি সর্বাবস্থায় ও সর্বসময় আল্লাহর নাম ও প্রশংসাবাণী তার কণ্ঠে উচ্চারিত হত। বর্তমান হাদীস গ্রন্থসমূহের একটি বিরাট অংশে তাঁর সেই পবিত্র বাণী ও দোয়াগুলো লিখিত আছে। এগুলি বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পবিত্র কণ্ঠে জারী থাকত। দু'শ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থটি কেবল এসব বাণী ও দোয়ার সমষ্টি। এর প্রতিটি বাক্য ও ছত্র আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব এবং আল্লাহভীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ। রাসূলুল্লাহ (স)-র পবিত্র কণ্ঠ হামেশা এ প্রশংসা কীর্তনে লিপ্ত থাকত।

কুরআন আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের সঙ্গা নির্দেশ করে বলেছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'তারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং নিজেদের পার্শ্বদেশের ওপর শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।'

এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবনের চিত্র। তাই হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) সকল সময় ও প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকতেন।

তিনি মুসলমানদেরকে নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের অবস্থা কি ছিল? তাঁর অনুসারীদেরকে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে আট ওয়াক্ত নামায পড়তেন। সূর্যোদয়ের পর ইশরাক, অতঃপর দিনের কিছু ওয়াক্ত অতীত হলে চাশত, তারপর যথাক্রমে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা। অতঃপর শেষরাতে তাহাজ্জুদ এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায তিনি নিয়মিত পড়তেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ফজরে দু'রাকাত, মাগরিবে তিন রাকাত এবং অবশিষ্ট তিন ওয়াক্তে চার রাকাত করে নামায ফরয। অর্থাৎ দিবারাত্রের মধ্যে মাত্র সতের রাকাত নামায ফরয। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) নিজে

www.bjilibrary.com

দিবারাত্র কমবেশি পঞ্চাশ-ষাট রাকাত নামায পড়তেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হবার পর তাহাজ্জুদের নামায সাধারণ মুসলমানদের জন্য মাফ করে দেয়া হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) এ নামাযটিও সারাজীবন প্রতি রাত্রে আদায় করেছেন। আর তাঁর পবিত্র নামাযই বা কেমন ছিল? রাতভর দাঁড়িয়ে থাকতেন। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তাঁর পবিত্র পদদ্বয় ফুলে যেত। হযরত আয়েশা (রা) বলতেন ঃ আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে সকল দিক দিয়ে মাফ করে দিয়েছেন, তবু আপনার এত কষ্ট করার কি প্রয়োজন? বলতেন ঃ হে আয়েশা! আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবো না? অর্থাৎ এ নামাযের উদ্দেশ্য আল্লাহর ভয় নয় বরং আল্লাহ প্রেম। রুকুতে তিনি বহুক্ষণ ঝুঁকে থাকতেন, এমনকি লোকেরা মনে করতো বুঝি বা তিনি সিজদা করতে ভুলে গেছেন।

নবুয়তের প্রারম্ভকাল থেকে তিনি নামায পড়তেন, কাফেররা তাঁর ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু তবু তিনি হারেম শরীফের ভিতরে গিয়ে সবার সামনে নামায পড়তেন। কয়েকবার নামায পড়া অবস্থায় কাফেররা তাঁর উপর হামলা করে। তবুও তিনি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত হননি। কিন্তু কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে নামায পড়া ছিল সবচাইতে কঠিন কাজ। দু'দলের সেনারা যুদ্ধে লিপ্ত। তীর-তরবারি ও বর্শা মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করছে। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাহাবাদেরকে নামাযের জন্য কাতারবদ্ধ করলেন। বদরের যুদ্ধে সমগ্র মুসলিম সেনাদল কাফেরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। আর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর নিকট সিজদায় ঝুঁকেছিলেন। সমগ্র জীবনে তাঁর কোন নামায নির্ধারিত সময় থেকে বিচ্যুত হয়নি। আর দু'ওয়াক্ত ছাড়া তাঁর কোন ওয়াক্তের নামায কাযাও হয়নি। একবার খন্দক যুদ্ধে কাফেররা আসরের নামাযের সুযোগ দেয়নি। আর একবার আর একটি যুদ্ধে-সফরে সারারাত চলার পর ফজরের নামাযের সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই পরে কাযা নামায আদায় করেন। এর চাইতেও কঠিন অবস্থা ছিল তাঁর মৃত্যুপীড়ার সময়। তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। কষ্ট হচ্ছিল অবর্ণনীয়। কিন্তু নামায এমনকি জামাতের সাথে নামায পড়াও তিনি ত্যাগ করেননি, চলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু তিনি সাহাবীদের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে

www.bjilibrary.com

দিবারাত্র কমবেশি পঞ্চাশ-ষাট রাকাত নামায পড়তেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হবার পর তাহাজ্জুদের নামায সাধারণ মুসলমানদের জন্য মাফ করে দেয়া হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) এ নামাযটিও সারাজীবন প্রতি রাত্রে আদায় করেছেন। আর তাঁর পবিত্র নামাযই বা কেমন ছিল? রাতভর দাঁড়িয়ে থাকতেন। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তাঁর পবিত্র পদদ্বয় ফুলে যেত। হযরত আয়েশা (রা) বলতেন ঃ আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে সকল দিক দিয়ে মাফ করে দিয়েছেন, তবু আপনার এত কষ্ট করার কি প্রয়োজন? বলতেন ঃ হে আয়েশা! আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবো না? অর্থাৎ এ নামাযের উদ্দেশ্য আল্লাহর ভয় নয় বরং আল্লাহ প্রেম। রুকুতে তিনি বহুক্ষণ ঝুঁকে থাকতেন, এমনকি লোকেরা মনে করতো বুঝি বা তিনি সিজদা করতে ভুলে গেছেন।

নবুয়তের প্রারম্ভকাল থেকে তিনি নামায পড়তেন, কাফেররা তাঁর ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু তবু তিনি হারেম শরীফের ভিতরে গিয়ে সবার সামনে নামায পড়তেন। কয়েকবার নামায পড়া অবস্থায় কাফেররা তাঁর উপর হামলা করে। তবুও তিনি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত হননি। কিন্তু কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে নামায পড়া ছিল সবচাইতে কঠিন কাজ। দু'দলের সেনারা যুদ্ধে লিপ্ত। তীর-তরবারি ও বর্শা মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করছে। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাহাবাদেরকে নামাযের জন্য কাতারবদ্ধ করলেন। বদরের যুদ্ধে সমগ্র মুসলিম সেনাদল কাফেরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। আর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর নিকট সিজদায় ঝুঁকেছিলেন। সমগ্র জীবনে তাঁর কোন নামায নির্ধারিত সময় থেকে বিচ্যুত হয়নি। আর দু'ওয়াক্ত ছাড়া তাঁর কোন ওয়াক্তের নামায কাযাও হয়নি। একবার খন্দক যুদ্ধে কাফেররা আসরের নামাযের সুযোগ দেয়নি। আর একবার আর একটি যুদ্ধে-সফরে সারারাত চলার পর ফজরের নামাযের সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই পরে কাযা নামায আদায় করেন। এর চাইতেও কঠিন অবস্থা ছিল তাঁর মৃত্যুপীড়ার সময়। তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। কষ্ট হচ্ছিল অবর্ণনীয়। কিন্তু নামায এমনকি জামাতের সাথে নামায পড়াও তিনি ত্যাগ করেননি, চলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু তিনি সাহাবীদের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে

www.bjilibrary.com

হাজির হন। ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে একবার তিনি ওঠার চেষ্টা করলে হঠাৎ বেহুশ হয়ে পড়েন। তিনবার এ অবস্থা হয়। তখন তাঁকে জামাতের সাথে নামায পড়া বাদ দিতে হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) রোযার হুকুম দিয়েছেন। সমস্ত মুসলমানদের ওপর সারা বছরে মাত্র ত্রিশ দিন রোযা রাখা ফরয। কিন্তু তাঁর নিজের কি অবস্থা ছিল? রোযা ছাড়া তাঁর একটি সপ্তাহ এবং একটি মাসও অতিবাহিত হত না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ যখন তিনি রোযা রাখা শুরু করতেন, তখন মনে হত বুঝি বা তিনি আর কোন দিন ইফতার করবেন না। তিনি মুসলমানদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেন, তাঁর নিজের অবস্থা ছিল এই যে কখনো কখনো দু'তিন দিন যাবত তিনি কিছুই খেতেন না এবং একাদিক্রমে দু-তিন দিন রোযা রাখতেন। এ সময়ের মধ্যে এক তিল পরিমাণ খাদ্যও তাঁর মুখে প্রবেশ করত না। সাহাবাগণ যদি এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করতে চাইতেন তাহলে বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আমার ন্যায়? আমাকে তো আমার প্রভু পানাহার করান। বছরের দু'টি মাস রমযান ও শাবান তাঁর পুরোপুরি রোযার মধ্য দিয়ে কেটে যেতো। প্রত্যেক মাসেই তিনি কয়েকদিন রোযার মধ্যে অতিবাহিত করতেন। প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। এ হলো রোযার ব্যাপারে তাঁর বাস্তব জীবনের চিত্র।

তিনি মুসলমানদেরকে যাকাত ও সাদকাদানের হুকুম দিয়েছেন কিন্তু সর্বপ্রথম তিনি নিজে এ বিষয়ে আমল করে দেখিয়েছেন। হযরত খাদীজা (রা)-র সাক্ষ্য আপনারা শুনেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঋণগ্রস্তদের ঋণ শোধ করে দেন, গরীব ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। রাসূলুল্লাহ (স) একথা বলেননি যে, তোমরা সবকিছু ত্যাগ করে আমার পেছনে এসে দাঁড়াও। তিনি ঘর-সংসার যথাসর্বস্ব দিয়ে দেয়ার হুকুমও দেননি এবং আসমানী সাম্রাজ্যের দুয়ার ধনীদের জন্য বন্ধও করে দেননি। বরং কেবল এতটুকু হুকুম দিয়েছেন যে, নিজেদের আয়ের এক অংশ অন্যদের দান করে আল্লাহর হক আদায় কর।

أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের যে সম্পদ দান করেছি তার একটি অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো।' কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নিজের নীতি ছিল এই যে, তাঁর

www.bjilibrary.com

নিকট যা কিছু আসতো সব আল্লাহর পথে খরচ করে দিতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিজয় অভিযানের ফলে অর্থসম্পদের আমদানী অপ্রচুর ছিল না। কিন্তু সেসব ছিল অন্যের জন্য, তাঁর নিজের জন্য কিছুই ছিল না। দারিদ্র্য ও অনাহার ছিল তাঁর চিরসাথী । খায়বার বিজয়ের পর অর্থাৎ সপ্তম হিজরী থেকে তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর মহিয়সী ও পূতচরিতা স্ত্রীগণকে সারা বছরের খোরাক দান করতেন। কিন্তু বছর শেষ হবার আগে তাঁদের শস্য ফুরিয়ে যেত। কেননা, শস্যের বিরাট অংশ অভাবীদের গৃহে চলে যেত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সবার চাইতে অধিক দানশীল ছিলেন এবং সবচাইতে বেশি পরিমাণ দান করতেন তিনি রমযান মাসে। জীবনে কারো আবেদনের জবাবে তিনি কখনো 'না' বলেননি। তিনি কখনো কোন জিনিস একাকী খেতেন না। যত সামান্য পরিমাণ জিনিসই হোক না কেন, উপস্থিত সবাইকে তিনি তাঁর সঙ্গে শরীক করতেন। তিনি সাধারণ হুকুম জারী করে দিয়েছিলেন যে, 'যে মুসলমান ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার সংবাদ আমাকে জানাবে, আমি তার ঋণ শোধ করবো। আর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ-সম্পত্তির মালিক হবে তার ওয়ারিসগণ।' একবার জনৈক বেদুইন এসে বললো ঃ 'হে মুহাম্মদ! এ সম্পদ তোমার নয়, তোমার পিতারও নয়। এগুলো আমার উটের পিঠে চাপিয়ে দাও।' তিনি জোয়ার ও খেজুর দিয়ে তার উটের পিঠ বোঝাই করে দিলেন এবং এভাবে বলার জন্যে মোটেই রাগান্বিত হলেন না। তিনি নিজে বলতেন,

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ-

অর্থাৎ 'আমিতো হচ্ছি বিতরণকারী ও খাজাঞ্চী এবং আসল দাতা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।' হযরত আবূ যর (রা) বলেন, একবার রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-র সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলাম। পথে তিনি বললেন ঃ হে আবূ যর! যদি উহুদের এ পাহাড়টি আমার জন্য সোনায় রূপান্তরিত হয়, তাহলে তিনরাত পর তার মধ্য থেকে একটি দীনারও আমার নিকট অবশিষ্ট থাকা আমি পসন্দ করবো না। তবে যদি কোন ঋণ থাকে তাহলে তা শোধ করার জন্যে হয়তো কিছু রাখতে পারি।'

www.bjilibrary.com

বন্ধুগণ! এগুলি কেবল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র মনোমুগ্ধকর বাণীই ছিল না বরং এ ছিল তাঁর যথার্থ সঙ্কল্পের প্রকাশ এবং তিনি এ-সবই কার্যকর করেছেন। বাহরাইন থেকে একবার রাজস্ব বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ এলো। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ ওগুলি মসজিদের উঠানে ঢেলে দেওয়া হোক! ফজরের নামাযের জন্য যখন তিনি মসজিদে এলেন তখন ধন-সম্পদের স্তূপের দিকে চোখ উঠিয়ে দেখলেন না। নামাযের পর স্তূপের নিকট বসে বিতরণ শুরু করলেন। যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন জামা-কাপড় ঝেড়ে এমনভাবে উঠে পড়লেন যেন এগুলি ছিল ময়লা আবর্জনা এবং এগুলি লেগে তাঁর জামা-কাপড় নষ্ট হচ্ছিল। একবার ফিদাক থেকে চারটি উট বোঝাই শস্য এলো। কিছু ঋণ ছিল, হযরত তা আদায় করলেন। কিছু বন্টন করলেন। অতঃপর তিনি বেলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আর কিছু অবশিষ্ট নেই তো? জবাব এলো ঃ আর কোন প্রার্থী নেই, তাই কিছুটা রয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ যতক্ষণ দুনিয়ার এ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ আমি গৃহে প্রবেশ করতে পারি না। কাজেই রাতটি মসজিদে কাটালেন। সকালে হযরত বেলাল (রা) এসে সুখবর শুনালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে দায়িত্বমুক্ত করেছেন।' অর্থাৎ যা কিছু ছিল সব বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। একবার আসরের নামাযের পরই ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আবার সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলেন। লোকেরা অবাক হলো। তিনি বললেন, 'নামাযের মধ্যে আমার মনে পড়ল যে, ছোট এক টুকরা সোনা আমার ঘরে রয়ে গেছে। মনে হলো, রাত্রির আগমন পর্যন্ত যেন তা মুহাম্মদের ঘরে পড়ে না থাকে। হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (স) দুঃখিত ও বিষণ্ন বদনে ঘরের ভিতর এলেন। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, 'উম্মে সালামা! গতকাল যে সাতটি দীনার এসেছিল, তা আজ সারাটি দিন অতীত হয়ে যাবার পরও এখন সন্ধ্যা নাগাদ আমার বিছানার উপর পড়ে আছে।' এর চাইতেও বড় ঘটনা হচ্ছে এই যে, তিনি যখন মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত, ভীষণ রোগকষ্ট ও অস্থিরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ল কয়েকটি আশরাফী ঘরে পড়ে আছে। হুকুম হলো, 'এখনি ওগুলি খয়রাত করে দাও। মুহাম্মদ

www.bjilibrary.com

কি তার প্রতিপালকের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার পেছনে তার ঘরে আশরাফী পড়ে থাকবে?'

এ অধ্যায়ে বর্ণিত এগুলিই হচ্ছে তাঁর কর্মজীবনের বাস্তব দৃষ্টান্ত।

তিনি কৃচ্ছ্রসাধন ও অল্প-তুষ্টির শিক্ষা দান করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নিজের কর্মপদ্ধতি কি ছিল? আগেই শুনেছেন যে, আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ জিযিয়া, খারাজ, উশর, যাকাত ও সাদকা মদীনায় স্তূপীকৃত হচ্ছিল। কিন্তু গোটা আরবের শাসনকর্তার ঘরে আগেরই মত অভাব ও অনাহারের ধারাই চলছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-র ইন্তিকালের পর হযরত 'আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, কিন্তু কখনো দুবেলা পেট ভরে খেতে পারেননি।' তিনি আরো বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (স)-র ইন্তিকালের সময় তাঁর ঘরে সেদিনের খাবার জন্য সামান্য জোয়ার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর কয়েক সের জোয়ারের বিনিময়ে এক ইহুদীর নিকট তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রাখা ছিল। তিনি বলতেন ঃ আদম সন্তানের এ কয়েকটি বস্তু ছাড়া আর কোন কিছুরই অধিকার নেই ঃ বসবাসের জন্য একটি কুঁড়েঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরা কাপড় এবং ক্ষুধা মেটাবার জন্যে শুকনো রুটি ও পানি (তিরমিযী)।'

এগুলি নিছক চিত্তাকর্ষক কথাই ছিল না বরং এই ছিল তাঁর জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র। তাঁর বসবাসের জন্য ছিল মাত্র একটি কুঠরী। তার দেয়াল ছিল কাঁচা এবং ছাদ ছিল খেজুর পাতা ও উটের চুলে ছাওয়া। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-র কাপড় কখনো পাট করে সাজিয়ে রাখা হত না। অর্থাৎ তিনি যে কাপড় পরতেন, তা ছাড়া কোন অতিরিক্ত কাপড় তাঁর ছিল না, যা পাট করে রাখা যেতে পারে। একদা জনৈক ভিক্ষুক তাঁর নিকট এসে বললো, 'আমি বড় ক্ষুধার্ত।' তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট বলে পাঠালেন কিছু খাবার থাকলে পাঠিয়ে দিতে। প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট থেকে জবাব এলো, ঘরে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। হযরত আবূ তালহা (রা) বললেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখলাম মসজিদের মধ্যে মাটির ওপর শুয়ে আছেন এবং ক্ষুধার তাড়নায় এপাশ-ওপাশ করছেন। একবার সাহাবাগণ তাঁর খিদমতে অনাহারের

www.bjilibrary.com

অভিযোগ করলেন এবং পেটের কাপড় সরিয়ে দেখালেন সেখানে একটি পাথর বাঁধা আছে। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁর পেটের কাপড় সরালেন, সেখানে একটির পরিবর্তে দু'টি পাথর বাঁধা ছিল। অর্থাৎ তিনি দু'দিন থেকে অনাহারে ছিলেন। অধিকাংশ সময় ক্ষুধার কারণে তাঁর গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে যেত। একদিন ঘর থেকে বের হলেন; তখন তিনি অনাহারে ছিলেন। তিনি হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা)-র ঘরে গেলেন। হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী বাগান থেকে খেজুর কেটে আনলেন এবং আহারের ব্যবস্থা করলেন। খাবার সম্মুখে আসার পর রাসূলুল্লাহ (স) একটি রুটির ওপর সামান্য গোশত রেখে বললেন, এটি ফাতেমা (রা)-র নিকট পাঠাও, কয়েকদিন থেকে তার ভাগ্যে খাবার জোটেনি।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা) ও দৌহিত্র হাসান হোসাইনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু আরবের শাসনকর্তা তাঁর এ ভালবাসাকে মূল্যবান পোশাক ও সোনা-রূপার অলংকারের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি। একবার তিনি হযরত আলী (রা) প্রদত্ত একটি সোনার হার হযরত ফাতেমার গলায় দেখলেন। বললেন ঃ হে ফাতেমা, তুমি কি লোকের মুখ থেকে একথা শুনতে চাও যে মুহাম্মদের কন্যা গলায় আগুনের শিকল পরে আছে? হযরত ফাতেমা (রা) তৎক্ষণাৎ গলা থেকে হার খুলে নিয়ে বিক্রি করে দিলেন এবং তার মূল্য দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করে আযাদ করে দিলেন। অনুরূপভাবে একবার হযরত আয়েশা (রা) সোনার কঙ্কন পরিধান করলে তিনি তা খুলে দেন এবং বলেন 'এটি মুহাম্মদের স্ত্রীর উপযোগী নয়।' তিনি বললেন, 'একজন মুসাফিরের জন্য যে পরিমাণ পাথেয় প্রয়োজন মানুষের জন্য দুনিয়ায় ঠিক ততটুকুই যথেষ্ট।' এ সব তাঁর উক্তি। তাঁর কাজও ছিল এর সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিশীল। একবার কতিপয় সাহাবা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসে দেখলেন, তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইর গভীর দাগ পড়ে গেছে। বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল। আমরা আপনার জন্য একটি নরম তোষক তৈরি কারে আনতে চাই। জবাব দিলেন, 'দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক ততটুকু যতটুকু একজন ঘোড়সওয়ারের সম্পর্ক গাছের ছায়ার সাথে, যে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে। তারপর আবার নিজের

www.bjilibrary.com

পথে এগিয়ে যায়।' নবম হিজরীতে যখন ইসলামী রাষ্ট্র ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তখন রাসূলুল্লাহ (স)-র ঘরে মোট আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল ঃ পরনের একটি তহবন্দ, একটি বিছানা ছাড়া খাট, খোর্মার ছালে ভরা একটি বালিশ, এক কোণে সামান্য পরিমাণ জোয়ার, একদিকে একটি পশুর চামড়া এবং খুঁটিতে ঝুলানো একটি পানির মশক।

তিনি যে কৃচ্ছ্র সাধন ও অল্পতুষ্টির শিক্ষা দান করেছিলেন তাকে নিজের জীবনে এভাবে বাস্তবায়িত করেছিলেন।

বন্ধুগণ! ত্যাগ ও কুরবানী সম্পর্কে অনেককে বক্তৃতা দিতে শুনেছেন। কিন্তু তাদের কারো জীবনে এর বাস্তব চিত্রও দেখেছেন কি? এর চিত্র দেখতে পারেন, মদীনার অলিতে-গলিতে। রাসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে ত্যাগের শিক্ষা দান করেন এবং এই সঙ্গে তাদের সম্মুখে নিজের আদর্শও পেশ করেন। বলা বাহুল্য হযরত ফাতেমা (রা)-কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু হযরত ফাতেমা (রা)-র অবস্থা এরূপ ছিল যে, যাঁতা পিষতে পিষতে তাঁর হাতের তালুতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল এবং মশকে করে পানি আনতে আনতে বুকে নীল দাগ পড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় একদিন তিনি পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে একটি খাদেম দান করার জন্যে আবেদন করলেন। জবাব দিলেন ঃ 'হে ফাতেমা! এখনো সুফ্ফার গরীবদের সুরাহা করতে পারলাম না। এমতাবস্থায় তোমার আবেদন কেমন করে পূর্ণ করতে পারি? বর্ণনান্তরে বলা হয়েছে ঃ 'হে ফাতেমা! বদরের এতিমরা তোমার পূর্বে আবেদন জানিয়েছে। একবার তাঁর নিকট চাদর ছিল না, জনৈক মহিলা সাহাবী একটি চাদর এনে তাঁকে দিলেন। তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি বললেন, কী চমৎকার চাদর! তিনি চাদরটি তাকে দিয়ে দিলেন। এক সাহাবীর গৃহে কোন উৎসব ছিল, কিন্তু তাঁর নিকট কোনো আহার্য দ্রব্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ 'আয়েশার নিকট গিয়ে আটা চেয়ে আনো।' তিনি গিয়ে আটা আনলেন। অথচ সেদিন রাসূলুল্লাহ (স)-র গৃহে ঐ আটা ছাড়া আর কোন খাদ্যবস্তু ছিল না। একদিন সুফ্ফার গরীবদের নিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-র গৃহে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, 'যা খাদ্য আছে হাজির কর।' আটার ভূষির হালুয়া হাজির করা হলো। তা

www.bjilibrary.com

যথেষ্ট হলো না। আরো কিছু খাদ্য চাইলেন। তখন খোর্মার হারীরা (পানীয়) পেশ করা হলো। তারপর দুধের পেয়ালা এলো কিন্তু মেহমানদারীর জন্যে এটিই ছিল গৃহের সর্বশেষ সম্বল।

এই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-র ত্যাগ। নিজের জীবনে তিনি এভাবেই তার বাস্তব রূপ দেখিয়েছেন।

আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার চিত্র দেখতে হলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আল্লাহর নির্দেশ ছিল ঃ

وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

'মহাপরাক্রমশালী পয়গম্বরগণ যে সবর ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তুমিও তেমনি সবর ও দৃঢ়তা দেখাও।' অবশ্যি তিনি ঠিক তেমনি সবর ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। এমন একটি মূর্খ ও অশিক্ষিত জাতির মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যারা তাদের বিশ্বাস ও আকিদাসমূহের বিরুদ্ধে একটি কথাও শুনতে পারত না এবং এজন্য প্রাণ সংহারে উদ্যোগী হত। কিন্তু তিনি কখনো এসবের পরোয়া করেননি। হারেম শরীফের কেন্দ্রে গিয়ে তিনি তওহীদের আওয়াজ বুলন্দ করতেন এবং সেখানে সবার সম্মুখে নামায পড়তেন। হারেম শরীফের উঠানে বসতো কুরাইশ সর্দারদের মজলিস। তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি রুকু ও সিজদা করতেন।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

'হে মুহাম্মদ! তোমাকে যে হুকুম করা হয়, তা সরবে ঘোষণা করো।' আয়াতটি নাযিল হবার পর তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশগণকে আহবান জানালেন ও আল্লাহর হুকুম শুনিয়ে দিলেন।

কুরাইশরা তাঁর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেছে। হারেম শরীফের মধ্যে তাঁর পবিত্র শরীরে নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করেছে। গলায় চাদর জড়িয়ে তাঁকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা করেছে। তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহর পথে তাঁর পদদ্বয় একটুও টলমল করেনি। পথ থেকে এক চুলও বিচ্যুত হননি। আবূ তালিব যখন তার সমর্থন উঠিয়ে নেবার ইঙ্গিত দিল, তখন তিনি কেমন আবেগ ও উৎসাহভরে বললেন ঃ 'চাচাজান! যদি কুরাইশরা আমার ডান হতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে

www.bjilibrary.com

রাখে, তবুও আমি এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবো না।' অবশেষে তাঁকে বনু হাশেমের গিরিসঙ্কটে প্রায় তিন বছর কয়েদ করে রাখা হয়। তাঁর ও তাঁর খান্দানকে সামাজিক বয়কট করা হয়। ভিতরে শস্য সরবরাহ বন্ধ করা হয়। শিশুরা ক্ষুধায় চিৎকার করতে থাকে। যুবকরা গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে থাকে। অবশেষে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়। এসব কিছুই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো সবর ও দৃঢ়তাহারা হননি। হিজরতের সময় তিনি 'ছাওর' গুহায় আশ্রয় নেন। কাফেররা তাঁর পশ্চাদানুসরণ করে গুহার মুখে পৌছে যায়। নির্বান্ধব ও অসহায় মুহাম্মদ (স)-ও তাঁর শত্রু সশস্ত্র কুরাইশদলের মধ্যে মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান ছিল। সাথী আবূ বকর (রা) শঙ্কিত হন। বলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ (স)! আমরা মাত্র দুইজন।' কিন্তু বিশ্বাস ও প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ একটি আওয়াজ শ্রুত হলো ঃ 'হে আবূ বকর ! আমরা দুজন নই, তিনজন لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ভীত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

এ হিজরতের পথে রাসূলুল্লাহ (স)-কে গ্রেফতার করার জন্যে সুরাকা ইবনে জাসাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে বর্শা হাতে নিয়ে তাঁর নিকট ছুটে আসে। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন ঃ 'হে রাসূলুল্লাহ (স)। আমরা গ্রেফতার হয়ে গেছি।' কিন্তু রাসূলে খোদা (স) তখনো যথারীতি কুরআন পাঠ করে চলেছেন। তাঁর অন্তর তখনো গভীর প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ।

মদীনায় পৌছার পর ইহুদী মুনাফিক ও কুরাইশ হামলাকারীদের ভয় সৃষ্টি হলো। সাহাবাগণ রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-র আবাসস্থল পাহারা দিতেন। সে যমানায়ই একদিন এ আয়াতটি নাযিল হলো।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে লোকদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।' তখন তিনি খিমা থেকে মাথা বের করে প্রহরারত সিপাহীদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা চলে যাও, আমাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও! আমার আল্লাহ নিজেই আমার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।'

নাজদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করছিলেন। আর সাহাবাগণ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এমন সময়

www.bjilibrary.com

এক বেদুইন খোলা তরবারি নিয়ে হাজির হলো। রাসূলুল্লাহ (স) জাগ্রত হলেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা একবার চিন্তা করুন! বেদুইন জিজ্ঞেস করলো ঃ 'হে মুহাম্মদ! এবার তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে?' গভীর প্রশান্তি ও নিরুদ্বেগ আওয়াজ ধ্বনিত হলো ঃ 'আল্লাহ'! এই শক্তিপূর্ণ জবাবে শত্রু প্রভাবিত হলো। তার তরবারি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল।

বদরের যুদ্ধ চলছে। প্রায় তিন'শ নিরস্ত্র মুসলমান এক হাজার লৌহবর্ম পরিহিত সশস্ত্র কুরাইশ সেনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। কিন্তু ঐ তিন'শ সিপাহীর সিপাহসালার কোথায়? তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃথক একস্থানে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়ায় মশগুল। কখনো কপাল মটিতে ছোঁয়াচ্ছেন, আবার কখনো আসমানের দিকে হাত তুলছেন এবং বলছেন ঃ 'হে আমার আল্লাহ! যদি আজ এ ছোট্ট দলটি ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এ দুনিয়ায় তোমার ইবাদতকারীদের আর কোন নাম-নিশানা থাকবে না।'

এমন সময়ও উপস্থিত হয়েছিল যখন মুসলমানরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে পেছনে সরে এসেছে। কিন্তু আল্লাহর সাহায্যের ওপর পূর্ণ আস্থাশীল ও পরিপূর্ণ নির্ভরকারী পয়গম্বর পাহাড়ের ন্যায় স্বস্থানে অটল ও অবিচল রয়েছেন। উহুদের যুদ্ধে অধিকাংশ মুসলমান পেছনে সরে এলো কিন্তু মুহাম্মদ (স) স্বস্থানে অটল রইলেন, প্রস্তরাঘাত সহ্য করলেন, তীর, তরবারি ও বর্শার দ্বারা তাঁর ওপর হামলা চালানো হচ্ছিল। লৌহ শিরস্ত্রাণের কড়া তাঁর পবিত্র মস্তকে বিদ্ধ হয়েছিল, তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল, মুখমণ্ডল আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছিল, কিন্তু তখনো তিনি ইস্পাত কঠিন মনোবলের পরিচয় দিয়ে গেছেন এবং আল্লাহর সাহায্যের ওপর আস্থা রেখেছেন ও নির্ভর করেছেন, কেননা আল্লাহর হেফাজতের ওপর তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। হুনায়েনের ময়দানে একবার যখন দশ হাজার তীর বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হচ্ছিল তখন কিছুক্ষণের জন্য মুসলমানরা পশ্চাদপসরণ করল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) স্বস্থানে অবিচল রইলেন। এদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষিত হচ্ছিল আর ওদিকে

اَنَا النَّبِىُّ لَا كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

www.bjilibrary.com

'আমি মিথ্যা পয়গম্বর নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের প্রপুত্র' এর আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছিল। তিনি সওয়ারী থেকে নীচে নেমে এলেন এবং বললেন ঃ 'আমি আল্লাহর বান্দা ও পয়গম্বর' অতঃপর আবার দোয়ার জন্য হাত উঠালেন।

বন্ধুগণ! আপনারা কি এমনি অদ্ভুত বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ়তার অধিকারী সিপাহসালারের কথা শুনেছেন যিনি নিতান্তই স্বল্পসংখ্যক সহযোগী ও নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এবং সঙ্গীগণের পশ্চাদপসরণের পরও নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করেননি, আত্মরক্ষার জন্য তরবারিও উঠাননি, বরং পর্থিব অস্ত্রে নিরস্ত্র হয়েও কেবল আসমানী শক্তি দ্বারা শক্তিমান হবার জন্য আবেদন করেন?

এ পথে এই ছিল তার কর্মজীবনের বাস্তব নজীর। আপনারা শত্রুকে ভালবাসার উপদেশ শুনেছেন। কিন্তু তার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখেননি। আসুন! মদীনার রসূলের মধ্যে আমি আপনাদেরকে তা দেখাচ্ছি। মক্কার অবস্থার কথা বাদ দিচ্ছি। কেননা আমার মতে অধীনতা, অসহায়তা ও অক্ষমতা হচ্ছে ক্ষমা, করুণা ও দয়ার সমর্থক। হিজরতের সময় কুরাইশ সর্দাররা ঘোষণা করলো যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদের শিরচ্ছেদ করে আসবে, তাকে একশটি উট পুরস্কার দেয়া হবে।

সুরাকা ইবনে জা'সাম এ পুরস্কারের লোভে তাঁর পেছনে ঘোড়া ছুটাল। সে নিকটে পৌঁছে গেল। হযরত আবূ বকর শঙ্কিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (স) দোয়া করলেন। তিনবার তার ঘোড়ার পা বালির মধ্যে বসে গেল। সুরাকা তীর ও পাঞ্জা বের করে অদৃষ্ট গণনা করল। প্রতিবার জবাব এলো মুহাম্মদের পশ্চাদ্ধাবন করো না। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সুরাকা ভীত হয়ে পড়েছিল। সে ফিরে যাবার সঙ্কল্প করল। রাসূলুল্লাহ (স)-কে ডেকে সে প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন জানিয়ে বললো ঃ যখন আপনাকে আল্লাহ কুরাইশদের ওপর বিজয় দান করবেন, তখন অনুগ্রহ করে আমার প্রাণরক্ষা করতে হবে। তিনি এ সম্পর্কিত ওয়াদাপত্র লিখিয়ে তার হাতে সোপর্দ করলেন। মক্কা বিজয়ের পর সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে সেদিন তার অপরাধ সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেননি।

আবূ সুফিয়ান কে? যে বদর, উহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-র বিরোধী সেনাদলের সর্দার ছিল। যে ব্যক্তি হাজার হাজার

www.bjilibrary.com

মুসলমানের জীবননাশের কারণ। যে নিজে কয়েকবার রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করেছিল। যে ব্যক্তি প্রতি পদে-পদে ইসলামের ঘোরতর শত্রু প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পূর্বে যখন হযরত আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-র সামনে হাজির হলেন, তখন যদিও তাঁর প্রতিটি অপরাধ তাঁর মৃত্যুদণ্ডের দাবী করছিল, তবুও করুণার মূর্তপ্রতীক রাসূলুল্লাহ (স) আবূ সুফিয়ানকে বললেন ঃ 'ভয়ের কোন কারণ নেই, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিশোধ গ্রহণের অনেক উর্ধে।'

তারপর রাসূলুল্লাহ (স) কেবল তাঁকে ক্ষমাই করলেন না বরং এও বললেন ঃ

مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِى سُفْـيَانَ كَانَ اٰمِنًا

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সেও নিরাপত্তা লাভ করবে।'

হিন্দা আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী। উহুদের যুদ্ধে সে তার বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। রণোন্মাদনা সৃষ্টিকারী গান গেয়ে কুরাইশ সেনাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-র প্রিয়তম চাচা ও ইসলামের বীর যোদ্ধা হযরত হামযা (রা)-র লাশের সঙ্গে চরম বেআদবী করেছিল। তাঁর বুক চিরে ফেলেছিল, তাঁর নাক-কান কেটে হার বানিয়েছিল এবং তাঁর কলিজা দাঁত দিয়ে চিবোতে চাচ্ছিল। যুদ্ধ শেষে এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (স) অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন সেও ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাসূলুল্লাহ (স)-র সামনে হাজির হলো এবং এখানেও গোস্তাখী করতে কসুর করলো না। তবু রাসূলুল্লাহ (স) তাকে একবার জিজ্ঞেসও করলেন না- তুমি এমন করেছো কেন? এই সর্বজনীন ক্ষমার অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সে চিৎকার করে উঠল ঃ হে মুহাম্মদ! আজকের আগে আমার নিকট তোমার খিমার চাইতে অন্য কারো খিমা অধিক ঘৃণ্য ছিল না, কিন্তু আজ তোমার খিমার চাইতে আর কারোর খিমা আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়।

তায়েফ বিজয়ের পর হযরত হামযা (র)-র হত্যাকারী 'ওয়াহশী' অন্যত্র পলায়ন করল। অতঃপর সে স্থানটিও মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হলো। তখন সে অন্য কোন আশ্রয় পেল না। লোকেরা বললো ঃ 'হে ওয়াহশী!

www.bjilibrary.com

তুমি এখন মুহাম্মদ (স)-কে চিনতে পারোনি। একমাত্র মুহাম্মদ (স)-এর আশ্রয় ছাড়া তোমার জন্য দ্বিতীয় কোনো নিরাপদ আশ্রয়স্থল নেই। ওয়াহশী রাসূলুল্লাহ (স)-র নিকট হাজির হলো, রাসূলুল্লাহ (স) তাকে দেখে চোখ নামিয়ে নিলেন। প্রিয় চাচার শাহাদতের দৃশ্য তাঁর চোখে ভেসে উঠল। চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। হত্যাকারী সামনে হাজির, কিন্তু তিনি কেবল এতটুকু বললেন ঃ 'হে ওয়াহশী! আমার সামনে এস না। তোমাকে দেখলে আমার শহীদ চাচার স্মৃতি ভেসে ওঠে।'

ইসলাম, মুসলমান ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-র সবচাইতে বড় শত্রু এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে সবচাইতে কষ্টদানকারী আবূ জেহেলের পুত্র হচ্ছেন ইকরামা (রা)। ইকরামা নিজেও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু যখন মুসলমানরা মক্কা জয় করলো তখন তিনি তাঁর নিজের ও খান্দানের সকল অপরাধের কথা স্মরণ করে ইয়ামনে পলায়ন করলেন। তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে যথার্থ রূপে চিনতে পারলেন। তিনি নিজে ইয়ামনে গিয়ে ইকরামাকে অভয় দান করলেন এবং তাকে সঙ্গে করে মদীনায় আসলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তার আগমনের খবর শুনলেন। তাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য তিনি এত দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন যে, তাঁর পবিত্র দেহে চাদরও রইল না। অতঃপর আনন্দের আতিশয্যে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ

'হে হিজরতকারী সওয়ার! তোমার আগমন মুবারক হোক।' চিন্তা করুন, কাকে এ মুবারকবাদ দান করা হচ্ছে! কার আগমনে এ আনন্দ! কাকে এভাবে ক্ষমা করা হচ্ছে। যার পিতা তাঁকে মক্কায় সব চাইতে বেশি কষ্ট দিয়েছিল, তাঁর পবিত্র শরীরে ময়লা নিক্ষেপ করেছিল, নামাযরত অবস্থায় তাঁর ওপর হামলা করতে চেয়েছিল, তাঁর গলায় চাদর বেঁধে তাঁকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল, দারুন্নদওয়ায়' তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল, বদরের যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং সব রকমের সন্ধি ও চুক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আজ তার দৈহিক স্মৃতি– পুত্রের আগমনে এ আনন্দ মুবারকবাদ!

www.bjilibrary.com

হেবার ইবনুল আসওয়াদ একদিকে রাসূল-দুহিতা হযরত যয়নব (রা)-এর হত্যাকারী এবং অপর দিকে ইসলামের আরো বহু ক্ষতি করেছে। মক্কা বিজয়ের সময় তার রক্ত হালাল ঘোষণা করা হয়। সে ইরানে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু পরে কি চিন্তা করে সোজা রাসূলুল্লাহ (স)-র দরবারে হাজির হলো এবং বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধৈর্যের কথা স্মরণ করে ফিরে এলাম। আমার অপরাধের যে সব বিবরণ আপনি শুনেছেন তা যথার্থ। এতটুকু শুনতেই তাঁর রহমতের দুয়ার খুলে গেল এবং বন্ধু ও শত্রুর পার্থক্য উঠে গেল।

উমাইর ইবনে ওহাব বদর যুদ্ধের পর জনৈক কুরাইশ সর্দারের ষড়যন্ত্রক্রমে নিজের তরবারিতে বিষ মাখিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলো এবং সুযোগ মতো রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার অপেক্ষায় রইল। এই সময় হঠাৎ একদিন সে গ্রেফতার হয়ে গেল। তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-র নিকট উপস্থিত করা হলো। তার অপরাধ প্রমাণিত হলো। কিন্তু তবুও তিনি তাকে মুক্তিদান করলেন।

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার জন্য উমাইর-কে পঠিয়েছিল এবং তার সঙ্গে ওয়াদা করেছিল যে, এ অভিযানে যদি সে নিহত হয়, তাহলে তার পরিবারবর্গ ও ঋণের দায়িত্ব সে গ্রহণ করবে। মক্কা বিজয়ের পর সাফওয়ান ভয়ে জেদ্দায় পলায়ন করলো। তার উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্র পথে ইয়ামন চলে যাবে। আর উমাইর রাসূলুল্লাহ (স)-খিদমতে হাজির হয়ে বললো ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! গোত্র-প্রধান সাফওয়ান ভয়ে পলায়ন করছে, সে নিজেকে সমুদ্রের বুকে নিক্ষেপ করতে চায়।' জবাব দিলেন ঃ যাও তাকে বলো–তাকে নিরাপত্তা দান করা হলো।' উমাইর আরো বললো ঃ এ নিরাপত্তার কোনো প্রতীক দান করুন, যেন সে বিশ্বাস করতে পারে।' তিনি নিজের পাগড়ি প্রতীকস্বরূপ তাকে দান করলেন। উমাইর এ পাগড়ি নিয়ে সাফওয়ানের নিকট পৌছল। সাফওয়ান বললো ঃ মুহাম্মদের নিকট যেতে আমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করছি।' যে উমাইর বিষ মিশ্রিত তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করতে গিয়েছিল, সে সাফওয়ানকে বললো ঃ 'হে সাফওয়ান! এখনো তুমি মুহাম্মদের ধৈর্য ও ক্ষমার কথা জান না।' সাফওয়ান রাসূলুল্লাহ (স)-র

www.bjilibrary.com

দরবারে হাজির হলো এবং বললো ঃ 'আমাকে বলা হয়েছে যে তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছো, এ কথা কি সত্য?' বললেন ঃ হ্যাঁ, সত্য। সাফওয়ান বললো ঃ কিন্তু আমি তোমার দীন কবুল করতে পারব না। আমাকে দু'মাসের সময় দেয়া হোক।' বললেন, দু'মাসের কেন, চার মাসের সময় দেয়া হলো। কিন্তু এ সময় শেষ হবার আগেই হঠাৎ তার মনের অবস্থা পাল্টে গেল এবং মুসলমান হয়ে গেল।

ইহুদী মহিলা কর্তৃক খাদ্যে বিষ প্রয়োগ

রাসূলুল্লাহ (স) খয়বরে গেলেন। এটি ছিল ইহুদী শক্তির প্রধান কেন্দ্রস্থল। যুদ্ধ হলো। তিনি শহর জয় করলেন। জনৈকা ইহুদী তাঁকে দাওয়াত করল। তিনি ইতস্তত না করেই দাওয়াত কবুল করলেন। ইহুদী মহিলা খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিল। তিনি খাদ্যে মুখ দিয়েই বুঝতে পারলেন। ইহুদী মহিলাকে ডাকা হলো। সে অপরাধ স্বীকার করল। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীনের দরবার থেকে তাকে কোন শাস্তি দান করা হলো না। অথচ তিনি এ বিষের প্রভাব সারা জীবন অনুভব করেছিলেন।

নজদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি একাকী একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর তরবারি গাছের ডালে ঝুলছিল। নিকটে কেউ ছিল না। এক বেদুঈন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সাহাবাগণ এদিক-ওদিক গাছের ছায়ায় শায়িত ছিল। সে সোজা রাসূলুল্লাহ (স)-র নিকট এলো। গাছ থেকে তরবারি খুলে নিয়ে কোষমুক্ত করল এবং বলল ঃ 'হে মুহাম্মদ! এবার কে তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে?' হযরতের অবিচলিত কণ্ঠের আওয়াজ এলো– 'আল্লাহ আমায় রক্ষা করবেন।' এ অপ্রত্যাশিত জবাব শুনে বেদুঈন হতচকিত ও ভীত হলো। সে তরবারি কোষবদ্ধ করল। সাহাবাগণ পৌছে গেলেন। বেদুঈন বসে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে কিছুই বললেন না। একবার একজন কাফেরকে গ্রেফতার করে আনা হলো। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে সুযোগ খুঁজছিল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-র সম্মুখে পৌছে তাঁকে দেখে ভীত হলো। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ 'তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইলেও হত্যা করতে পারতে না।'

www.bjilibrary.com

মক্কা যুদ্ধে ৮০ জনের একটি দল গ্রেফতার হলো। তারা তানঈম পাহাড় থেকে নেমে তাঁকে হত্যা করতে চাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) জানতে পেরে বললেন ঃ 'ওদেরকে ছেড়ে দাও।'

বন্ধুগণ! তায়েফের নাম শুনেছেন? যে তায়েফ মক্কা জীবনের কঠোর নির্যাতনকালে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আশ্রয় দান করেনি। এমন কি তার কথাও শুনতে চায়নি। সেখানকার সর্দার আবদ ইয়ালীলের খান্দান তাকে বিদ্রূপ করেছিল। বাজারের লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-র প্রতি বিদ্রূপ করার জন্য লেলিয়ে দিয়েছিল। শহরের গুণ্ডাদল চারদিক থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর সর্দার প্রধানেরা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) যখন মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন দু'দিক থেকে তাঁর ওপর পাথর বর্ষিত হচ্ছিল। এমন কি তাঁর পবিত্র পদযুগল আহত হয়ে গিয়েছিল এবং জুতা রক্তে ভরে গিয়েছিল। তিনি ক্লান্ত হয়ে যখন বসে পড়ছিলেন, তখন সেই দুষ্টের দল তাঁর হাত ধরে তুলে দিচ্ছিল। তিনি পুনরায় চলতে শুরু করলে ওরা পাথর বর্ষণ করতো। সেদিন তাঁর এত কষ্ট হয়েছিল যে, নয় বছর পর একদিন হযরত আয়েশা (রা) যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'হে রাসূলুল্লাহ্ (স)! সমগ্র জীবনে আপনার ওপর সব চাইতে কঠিন ও কষ্টকর দিন এসেছিল কোন সময়?' জবাবে তিনি এই তায়েফের দিনের উল্লেখ করেছিলেন।

৮ম হিজরীতে মুসলিম সেনাদল তায়েফ অবরোধ করল। অবরোধ বেশ কিছুকাল স্থায়ী হলো। দুর্গ বিজিত হলো না। বহু মুসলমান শহীদ হলো। রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প করলেন। উৎসাহী মুসলমানরা মানতে রাযী হচ্ছিল না, তারা তায়েফের জন্য বদ দোয়া করার আবেদন জানালো। তিনি হাত উঠালেন। কিন্তু কি বললেন? বললেন ঃ 'হে আমার আল্লাহ! তায়েফকে হিদায়াত দান কর। তাকে ইসলামের নিকট নত কর।' বন্ধুগণ! কোন শহরের জন্যে তিনি এ দোয়া করছেন? যে শহর তাঁর ওপর প্রস্তর বর্ষণ করেছিল, তাঁকে আহত করেছিল এবং তাঁকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছিল।

উহুদ-যুদ্ধে শত্রুরা হামলা করল। মুসলমানরা পিছু হটল। রাসূলুল্লাহ (স) শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেন। তাঁর ওপর তীর, তরবারি ও প্রস্তর

www.bjilibrary.com

নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। তাঁর দাঁত শহীদ হয়ে গেল। শিরস্ত্রাণের লৌহ শলাকা-মাথায় বিদ্ধ হলো। মুখমণ্ডল রক্তাপ্লুত হলো। এ অবস্থায়ও তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ 'সে জাতি কেমন করে মুক্তি লাভ করবে যে তার পয়গম্বরকে হত্যা করতে উদ্যোগী! হে আমার আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়াত দান কর। কেননা তারা কিছুই জানে না।' 'তোমার শত্রুকে ভালোবাস' –যয়তুন পাহাড়ে প্রদত্ত উপদেশের এই হচ্ছে কার্যকর রূপ। এ কেবল কবিতা নয় বরং কর্মের বিপজ্জনক রূপ।

যে আবদে ইয়ালীলের খান্দান তায়েফে রাসূলুল্লাহ (স)-র ওপর জুলুম করেছিল, তার পুত্র যখন তায়েফের প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (স) নিজে পবিত্র মসজিদে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। প্রত্যেক দিন এশার নামাযের পর তার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন এবং মক্কার দুঃখের কাহিনী তাকে শুনাতেন! কাকে? যে তাঁকে প্রস্তরাঘাতে আহত করেছিল, যে তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছিল। এ হচ্ছে নিজের শত্রুকে ক্ষমা করা ও ভালোবাসার জ্বলন্ত নজীর।

মক্কা যখন বিজিত হলো, তখন হারেম শরীফের বারান্দায় যেখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দেয়া হয়েছিল, যেখানে তাঁর ওপর নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যেখানে তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়েছিল বিজিত কুরাইশ সর্দাররা। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যে ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এমন কি যে তাঁকে মিথ্যা বলে দাবী করতো, তাঁর নিন্দাবাদ করতো, তাঁকে গালি দিত, যে তাঁর সঙ্গে গোস্তাখী করার দুঃসাহস পোষণ করতো, তাঁর ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতো, তাঁর পথে কাঁটা বিছাত, যে তাঁর ওপর তরবারি উঠিয়েছিল, তাঁর আত্মীয়দের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল, তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করেছিল এবং তাদের হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীভুঁড়ি কেটে টুকরা টুকরা করেছিল, যে দরিদ্র ও অসহায় মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত, তাদের বুকের ওপর নিজেদের অত্যাচারের অগ্নি-মোহর লাগিয়ে দিত, তাদেরকে আগুনের মত উত্তপ্ত বালুর ওপর শায়িত করতো, জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে তাদের অঙ্গে দাগ দিত এবং বর্শাঘাতে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করতো। এ সব অপরাধীর দল সেদিন পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় সামনে দাঁড়িয়েছিল।

www.bjilibrary.com

পেছনে দশ হাজার রক্তপিপাসু তরবারি কেবলমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল। অকস্মাৎ তিনি মুখ খুললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে কুরাইশগণ! বলো, আজ তোমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত।' জবাব এলো 'মুহাম্মদ! তুমি আমাদের শরীফ ভাই ও শরীফ ভাতিজা।' রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আজ আমি তোমাদেরকে তাই বলছি যা হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর জালিম ভাইদেরকে বলেছিলেন।

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।' اِذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَآءُ যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।'

এ হচ্ছে শত্রুদেরকে ভালোবাসার ও মাফ করার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ হচ্ছে নবী করীম (স)-এর বাস্তব আদর্শ ও বাস্তব শিক্ষা। আর তা কেবল মুখরোচক বক্তৃতা ও সুমিষ্ট ভাষণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং সত্যিকার ঘটনা ও কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত।

এ কারণেই অন্যান্য ধর্মগুলি তাদের পয়গম্বর ও ধর্ম প্রবর্তকগণের সুমিষ্ট বাণীসমূহের দিকে দুনিয়াকে আহবান করে বার বার সেগুলির পুনরাবৃত্তি করে। কেননা এগুলি ছাড়া অন্য বস্তু তাদের নিকট নেই। অন্যদিকে ইসলাম তার পয়গম্বরের কেবল কথা নয় বরং কাজের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় বলেছিলেনঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقِيْلَيْنِ كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّتِىْ ـ

'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি ঃ 'আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত।' এ ভারী বস্তু দু'টি এখনো কায়েম আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।'

এ জন্যই ইসলাম আল্লাহর কিতাবের সাথে সাথে নিজের পয়গম্বরের সুন্নাতের অনুসৃতির দাওয়াত দেয়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবন অনুসরণযোগ্য এক সুমহান আদর্শ।'

www.bjilibrary.com

ইসলাম নিজে তার পয়গম্বরকে আল্লাহর কিতাবের বাস্তব চিত্র, আদর্শ ও প্রতিমূর্তি হিসাবে পেশ করে। সমগ্র দুনিয়ায় একমাত্র ইসলামের পয়গম্বরই এ মর্যাদার অধিকারী যে, তিনি নিজের শিক্ষা ও নীতির সাথে সাথে নিজের কর্ম এবং দৃষ্টান্তও পেশ করেন। নামাযের পদ্ধতি যে জানে না তাকে বলেন ঃ

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

'আল্লাহর জন্যে ঠিক সেভাবে নামায পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ।' স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের কল্যাণ কামনার শিক্ষা এভাবে দেন ঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য সর্বোত্তম। আর আমার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।'

রাসূলুল্লাহ (স)-র শেষ হজ্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নবীর চতুর্দিকে একলক্ষ পতঙ্গের ভীড় জমে উঠেছে। মানুষকে আল্লাহর সর্বশেষ পয়গাম শুনানো হচ্ছে। আরবের বাতিল রসম-রেওয়াজ ও বংশানুক্রমিক যুদ্ধের সিলসিলা আজ ভেঙে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন নিজের ব্যক্তিগত নজীর ও বাস্তব দৃষ্টান্তও প্রতি পদে পদে পেশ হচ্ছে। বললেন ঃ

> 'আজ সমস্ত প্রতিশোধের রক্ত বাতিল করা হলো। অর্থাৎ তোমরা সবাই পরস্পরের হত্যাকারীদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং সর্বাগ্রে আমি নিজের খান্দানের রক্ত–আমার ভাতিজা রাবীয়া ইবনে হারেসের রক্ত মাফ করে দিলাম!'
>
> 'জাহেলী যুগের সকল প্রকার সূদের লেনদেন ও কারবার আজ বাতিল করা হচ্ছে। এবং সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সূদের কারবার ভেঙে দিচ্ছি।'

ধন ও প্রাণের পর তৃতীয় মূল্যবান বস্তু হচ্ছে ইজ্জত-আবরূ। মানুষের ইজ্জত-আবরূর সঙ্গে যে সমস্ত ভ্রান্ত ও সংস্কারযোগ্য রসম-রেওয়াজের সম্পর্ক সেগুলিকে সর্বপ্রথম কার্যত বিলুপ্ত করার হিম্মত যেন বাহ্যত নিজের অমর্যাদা ও বে-আবরূর নামান্তর প্রতীয়মান হয়। তাই দুনিয়ার বড় বড়

www.bjilibrary.com

সংস্কারকও দেশের কোন রসম-রেওয়াজ কার্যত সংশোধনের সাহস খুব কমই করে থাকেন। মুহাম্মদ (স) মানুষকে সাম্যের শিক্ষা দান করেছেন। আরবে গোলামদেরকে সবচাইতে হীন মনে করা হত। রাসূলুল্লাহ (স) সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক সম-অধিকারের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ পেশ করলেন। তিনি একজন গোলামকে নিজের পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। আরবে গোত্রগত মর্যাদার তারতম্য এত প্রবল ছিল যে, যুদ্ধের সময় কোনও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গোত্রের লোক নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন গোত্রের লোকের বিরুদ্ধে তরবারি উঠানো অপমানজনক মনে করতো। কেননা তারা মনে করতো যে, ছোট লোকদের রক্ত তাদের তরবারি নাপাক করে দেবে। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করলেন ঃ 'হে লোকেরা! তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে। কালোর ওপর সাদার এবং অনারব ব্যক্তির ওপর আরবীদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে তার আল্লাহকে সকলের চাইতে বেশি ভয় করে।' তাঁর এ শিক্ষা অকস্মাত উচ্চ-নীচ, উন্নত-অবনত, ছোট-বড় এবং প্রভু-ভৃত্যের মধ্যকার পার্থক্য উঠিয়ে দিয়ে সবাইকে এক পর্যায়ে এনে দাঁড় করাল। কিন্তু এ জন্য বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন ছিল। এ দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই পেশ করলেন। কুরাইশদের শরীফ খান্দানের অন্তর্গত তাঁর নিজের ফুফাতো বোনকে নিজের গোলামের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। পালক পুত্রকে গর্ভজাত সন্তান মনে করার কুসংস্কার নীতি যখন ইসলাম উঠিয়ে দিল, তখনই 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মদকে' যায়েদ ইবনে হারেস বলা হলো। পালক পুত্র যে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাকে বিয়ে করা আরবে অবৈধ ছিল। কিন্তু এটি যেহেতু নিছক মৌখিক আত্মীয়তা ছিল, প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না। এবং এ প্রথাটির কারণে আরবদের মধ্যে নানাবিধ খান্দানী হিংসা-বিদ্বেষ ও ত্রুটির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তাই এ প্রথা উঠিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ নিয়ম ভঙ্গ করে কার্যকর দৃষ্টান্ত পেশ করার বিষয়টি মানুষের সব চাইতে প্রিয় বস্তু আবরূর সাথে সম্পর্কিত ছিল। কাজেই এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। রাসূলুল্লাহ (স) এগিয়ে এসে নিজেই এর দৃষ্টান্ত পেশ করলেন। যায়েদ ইবনে হারেস যখন নিজের স্ত্রী হযরত জয়নবকে বনিবনা না হওয়াতে তালাক দিলেন, তখন হযরত আল্লাহর আদেশে জয়নবকে বিয়ে করলেন। তখন থেকেই আরবের এ

www.bjilibrary.com

অবাঞ্ছিত প্রথাটি নির্মূল হয়ে গেলো এবং পালিত পুত্র সম্পর্কিত ভ্রান্ত প্রথা থেকে দেশ নাজাত লাভ করলো।

এরূপ ঘটনার অভাব নেই। অগণিত নজীর এর রয়েছে কিন্তু আলোচনা সুদীর্ঘ হবার আশংকায় এ থেকে বিরত হলাম।

বন্ধুগণ! আমার আলোচনার আলোকে আদম (আ) থেকে শুরু করে ঈসা (আ) পর্যন্ত এবং সিরিয়া থেকে শুরু করে হিন্দুস্থান (পাক-ভারত-বাংলাদেশ) পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির সংস্কারধর্মী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এমন কার্যকর হিদায়াত ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত কি আর কোথাও দেখতে পাবেন?

বন্ধুগণ! আরো কয়েকটি কথা জেনে রাখুন। অনেক মিষ্টভাষী বক্তা কবিতার ভঙ্গিতে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও গভীর প্রেমের কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু 'বৃক্ষের পরিচয় ফলে' তাদের উক্তি মুতাবিক তাদের জীবনে ভালোবাসা ও প্রেমের কি প্রভাব পড়েছিল? আরবের প্রেমিকের জীবনী পাঠ করুন। গভীর রাত, সারা জাহান ঘুমন্ত কিন্তু প্রেমিকের চোখ রয়েছে জেগে। হাত আকাশের দিকে, কণ্ঠে আল্লাহর প্রশংসা-কীর্তিত হচ্ছে, বুকের ভেতর হৃদয় অস্থির ও উদ্বেগ-চঞ্চল এবং চোখ থেকে দরবিগলিত ধারায় ঝরে পড়ছে অশ্রু। সত্যিকার প্রেমের চিত্র কি এটি না ওটি?

খ্রিস্টানদের মতে যীশুকে শূলের উপর চড়ানো হয়। তখন তিনি অস্থিরভাবে বলেছেন ঃ ايلى ايلى لما سبقتنى

'হে আমার আল্লাহ! হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করলে?' কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

'হে আমার আল্লাহ! হে আমার সর্বোত্তম সাথী?' এ দু'টি কথার কোনটির মধ্যে ভালোবাসার স্বাদ, প্রেমের নিদর্শন এবং আল্লাহ নির্ভর প্রশান্তির গভীরতা লক্ষ্য করা যায়?

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ -

www.bjilibrary.com

সপ্তম বক্তৃতা

ইসলামের পয়গম্বরের বাণী

www.bjilibrary.com

ইসলামের পয়গম্বরের বাণী

বন্ধুগণ! ইতিপূর্বে ছ'টি বক্তৃতায় আমি যুক্তি-প্রমাণ ও ইতিহাসের আলোকে একথা প্রমাণ করেছি যে, সকল উন্নত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একমাত্র নবীগণের জীবন ও চরিত্র অনুসরণযোগ্য এবং তাঁদের মধ্যেও বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী আদর্শ হচ্ছে একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবন-চরিত। এ পর্যায়ে যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী আদর্শ, তখনই প্রশ্ন ওঠে তাঁর বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী শিক্ষা কি? তিনি দুনিয়ার জন্য কি বাণী বহন করে এনেছিলেন এবং কি বাণী শুনিয়ে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন? তাঁর পয়গামের কোন জরুরী অংশকে বাস্তবায়িত করার জন্য শেষ নবীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল? অন্যান্য পয়গম্বরগণও দুনিয়ার জন্য পয়গাম বহন করে এনেছিলেন। এ শেষ নবীর পয়গাম কিভাবে তাকে যথার্থ রূপ ও পূর্ণতা দান করেছিল?

আমরা স্বীকার করি, মাঝে মাঝে নবীদের মাধ্যমে দুনিয়ায় আল্লাহর বাণী এসেছে। কিন্তু যেমন ইতিপূর্বে বারবার বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন ঘটনার আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর বাণী কোন বিশেষ যামানা ও জাতির জন্য এসেছে এবং সেগুলি সাময়িক ছিল, তাই সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি। তাদের আসল বস্তু নষ্ট হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল পর সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তাতে বহু বিকৃতি সাধিত হয়েছে। ওসব গ্রন্থের অনুবাদ আবার তাদের চেহারাই পাল্টে দিয়েছে। তাদের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতার কোন প্রমাণ নেই। অনেকের মনগড়া বাণী তাদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আর এসব হয়েছে মাত্র কয়েকশ বছরের মধ্যে। আল্লাহর কাজ যদি বিচার-বিবেচনাশূন্য না হয়ে থাকে,

www.bjilibrary.com

তাহলে তাদের নিশ্চিহ্ন ও বিকৃত হয়ে যাওয়াই তাদের সাময়িক ফরমান ও শিক্ষার প্রমাণ। কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র মাধ্যমে যে বাণী এসেছে, তা এসেছে বিশ্বজনীন ও চিরন্তন বাণী হিসেবে। তাই এগুলি আগমনের পর থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ণরূপে সংরক্ষিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কেননা এরপর আর কোনো নবী আসবে না। আল্লাহতাআলা অতীতের কোন বাণী সম্পর্কে এ কথা বলেননি যে, তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। দুনিয়ার যে সকল 'সহীফা' বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের বিলুপ্তিই তাদের সাময়িক বাণী হবার প্রমাণ। আর যেসব সহীফা বর্তমান আছে, তাদের প্রত্যেক আয়াত ও বাক্য অনুসন্ধান করুন সেখানে তাদের পরিপূর্ণতা বা তাদের সংরক্ষণের ওয়াদা সম্পর্কে একটি কথাও পাবেন না। বরং বিপরীতপক্ষে তাদের অসম্পূর্ণতারই ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

হযরত মূসা বলেন ঃ আমার আল্লাহ তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের মধ্যে তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে তিনি আমার ন্যায় একজন নবী পাঠাবেন! তোমরা তাঁর কথা শুনবে।–(দ্বিতীয় বিবরণ ঃ ১৫, ১৮)।

'আমি তাদের জন্য ভাইদের মধ্য থেকে তোমাদের ন্যায় একজন নবী পাঠাবো এবং নিজের বাণী তার মুখে দান করবো। আমি তাকে যা কিছু বলবো তা সমস্তই সে তাদেরকে শুনাবে।'–(দ্বিতীয় বিবরণ ঃ ১৮, ১৯)

'মর্দে খোদা মূসা (আ) মৃত্যুর পূর্বে বনী ইসরাঈলদেরকে এ বরকত দান করে যান এবং তিনি বলেন, আল্লাহ সিনাই থেকে এসেছেন, সাঈর থেকে তাঁর উপর উদিত হয়েছেন আর ফারানের পাহাড় থেকে তিনি উদিত হবেন এবং তাঁর ডান হাতে হবে একটি অগ্নিময় শরীয়ত।'

উপরের আয়াতগুলির মাধ্যমে তাওরাত সুস্পষ্টভাবে একথা ব্যক্ত করেছে যে, 'মূসার ন্যায় আর একজন নবী আগমন করবেন। তাঁর সাথে থাকবে একটি অগ্নিময় শরীয়ত এবং তাঁর মুখে আল্লাহ নিজের বাণী দান করবেন।' এ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসার বাণী সর্বশেষ ও চিরন্তন ছিল না।

অতঃপর 'আশিয়া'য় আর একজন 'রাসূলের সুসংবাদ দান করেন ঃ 'যার শরীয়ত মধ্যবর্তী দেশসমূহ ও দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।' (৪ অধ্যায়)

www.bjilibrary.com

'মালাখীয়ায়' বলা হয়েছে ঃ 'দেখ, আমি আমার রাসূল পাঠাবো।' বনী ইসরাঈলদের অন্যান্য সহীফাসমূহে এবং যাবুরেও ভবিষ্যতে আগমনকারী নবীর সুসংবাদ দান করা হয়েছে। এথেকে প্রমাণ হয় যে, বনী ইসরাঈলদের কোন একটি সহীফাও সর্বশেষ ও চিরন্তন ছিল না।

বর্তমান ইঞ্জীলের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

'এবং আমি আমার পিতার নিকট আবেদন জানাবো যেন তিনি তোমাদেরকে দ্বিতীয় 'ফারকালীত' দান করেন, যিনি হামেশা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'–(ইউহেনা ঃ ১৪-২৬)

'কিন্তু সে 'ফারকালীত' হচ্ছেন পবিত্র আত্মা। তাঁকে পিতা আমার নামে প্রেরণ করবেন। তিনিই তোমাদেরকে সব বিষয় শেখাবেন। এবং আমি তোমাদের যে সব কথা বলেছি, তা তিনি স্মরণ করিয়ে দেবেন।' –(ইউহেনা ঃ ১৪-২৬)

'আমার আরো অনেক কথা আছে, যেগুলি আমি তোমাদেরকে শুনাতে চাই। তবে এখন তোমরা সেগুলি বরদাশত করতে পারবে না। কিন্তু যখন তিনি অর্থাৎ সত্যের আত্মা আসবেন, তখন তিনিই তোমাদের সত্যের পথ দেখাবেন। কেননা তিনি নিজের কথা বলবেন না। বরং যা কিছু শুনবেন তাই বলবেন।' –(ইউহেনা ঃ ৬-৮)

এ আয়াতগুলির মাধ্যমে ইঞ্জীল সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে আল্লাহর সর্বশেষ বাণী এ কিতাবে ঘোষিত হয়নি এবং তা পরিপূর্ণও নয়। আর একজন আসবেন তিনি 'মসীহ'র পয়গামকে পূর্ণতা দান করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম ভবিষ্যতের এমন কোন আগমনকারীর সংবাদ দেয় না, যিনি কোন নতুন পয়গাম শুনাবেন। অথবা রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামের মধ্যে কোন ত্রুটি ও অপূর্ণতা রয়ে গেছে, তা দূর করে তিনি তাকে পরিপূর্ণতা দান করবেন। বরং রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম নিজেই নিজের পরিপূর্ণতার দাবী করে। যেমন বলা হচ্ছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ ـ

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করেছি এবং তোমাদের ওপর আমার দানও সম্পূর্ণ করেছি।' (সূরা আল মায়েদা- ৩)

www.bjilibrary.com

এবং এই সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ শেষ নবী অর্থাৎ তার পর নবুয়তের সিলসিলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঐ শুনুন কুরআন বলছে وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ (তিনি নবীদের শেষ) এবং হাদীস বলছে وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ আর আমার দ্বারা নবীদের আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।– (মুসলিম বাবুল, মাসাজিদ) اَلَا لَانَبِىَّ بَعْدِىْ (সাবধান আমার পর আর কোন নবী নেই)। বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে ঃ 'আমি নবুয়ত প্রাসাদের সর্বশেষ প্রস্তর। কুরআন তার আয়াতসমূহে পরবর্তী আগমনকারী কোনো পয়গম্বরের জন্য কোন স্থান শূন্য রাখেনি। এথেকে জানা গেল যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র মাধ্যমে দুনিয়ায় যে পয়গাম এসেছে, সেটিই আল্লাহর শেষ ও চিরন্তন পয়গাম। আর এ জন্যেই وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (আর আমিই তার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি) এ আয়াতে ওয়াদার মাধ্যমে আল্লাহ, নিজেই তার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বন্ধুগণ! এরপর প্রশ্ন হচ্ছে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম ছাড়া অন্য কোন পয়গাম বিশ্বজনীন রূপ নিয়ে আগমন করেছে কি না? বনী ইসরাঈলদের দৃষ্টিতে দুনিয়া কেবল বনী ইসরাঈলদেরই বাসস্থান। আল্লাহ কেবল বনী ইসরাঈলদেরই আল্লাহ। তাই বনী ইসরাঈলদের নবীগণও তাদের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থগুলির আল্লাহর পয়গাম কখনো অ-বনী ইসরাঈল পর্যন্ত পৌছাননি। আজ ইহুদী ধর্ম ও মূসার শরীয়ত বনী ইসরাঈলদের মধ্যেই সীমিত। তাদের সমস্ত 'সহীফা'য় শুধু তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এবং তাদের খান্দানী আল্লাহর দিকেই তাদের আকৃষ্ট করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর পয়গাম কেবল 'বনী ইসরাঈলদের হারিয়ে যাওয়া মেষপালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং অ-ইসরাঈলদেরকে নিজের পয়গাম শুনিয়ে ছেলেদের রুটি কুকুরের মুখে তুলে দেয়া পসন্দ করেননি।' ভারতবর্ষের বেদও অনার্যদের কান পর্যন্ত পৌছতে পারে না, কেননা আর্য ছাড়া দুনিয়ার আর সবই হচ্ছে শূদ্র এবং সেখানে এ কথার ওপর জোর দেয়া হয়েছে যে, 'বেদের বাণী যদি শূদ্রের কানে প্রবেশ করে, তাহলে তার কানে গরম শীশা ঢেলে দাও।

www.bjilibrary.com

এদিক দিয়ে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম দুনিয়ায় আল্লাহর সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গাম, যা সাদা-কালো, আরবী-আজমী, তুর্কী-তাতারী, ভারতীয়-চৈনিক, ফিরিংগী-অফিরিংগী সবার জন্য সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। তাঁর আল্লাহ যেমন সমগ্র দুনিয়ার আল্লাহ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ 'সমগ্র দুনিয়ার প্রতিপালক' তেমনি তাঁর রাসূলও সমগ্র দুনিয়ার রাসূল رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ 'সমগ্র দুনিয়ার জন্যে করুণাস্বরূপ' তদ্রূপ তাঁর পয়গামও সমগ্র দুনিয়ার জন্য। যেমন বলা হচ্ছে ঃ

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ -

'তা সমগ্র দুনিয়ার জন্যে উপদেশ।' (সূরা আল-আন-আম- ৯০)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا- الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

'উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ তিনি, যিনি তার বান্দাদের উপর ফয়সালাকারী কিতাব নাযিল করেছেন, যেন তা সমগ্র বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে পারে। পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র কর্তৃত্ব সে আল্লাহরই।'

(সূরা আল ফুরকান- ১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমগ্র দুনিয়ার জন্য সতর্ককারী হিসেবে এসেছেন। আল্লাহর কর্তৃত্ব যতদূর পরিব্যাপ্ত তাঁর পয়গম্বরীও ততদূর বিস্তৃত।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ط الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

'(মুহাম্মদ!) তুমি বলে দাও, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সবার জন্য সেই মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবীর ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

দেখুন, এখানেও সমগ্র দুনিয়ায় মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামের বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। এর চাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, যতদূর পর্যন্ত এ সমস্ত পয়গামের আওয়াজ পৌছতে পারে ততদূর পর্যন্ত এলাকা তার আওতাভুক্ত।

www.bjilibrary.com

وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ -

'আর এ কুরআন আমার প্রতি ওহীরূপে নাযিল করা হয়েছে, যাতে করে এর সাহায্যে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট পর্যন্ত এটি পৌঁছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।' (সূরা আল-আন-আম)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

'আর আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে।' (সূরা আস্ সাবা)

এ উদ্ধৃতিসমূহ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই তার চিরন্তন, পরিপূর্ণ, অপরিবর্তনীয় ও বিশ্বজনীন হবার দাবী করেছে। মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ 'আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীকে কেবল তাঁর নিজের জাতির জন্যই পাঠানো হয়েছিল। আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল জাতির জন্য।' এটি আমাদের দাবীর স্বপক্ষে আর একটি প্রমাণ এবং ইতিহাসের বাস্তব সাক্ষ্যও আমাদের সমর্থক। মোটকথা, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র চরিত্র ও তাঁর জীবনের বাস্তব চিত্র যেমন পরিপূর্ণ চিরন্তন ও বিশ্বজনীন অনুরূপভাবে তাঁর পয়গামও পরিপূর্ণ চিরন্তন ও বিশ্বজনীন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ পরিপূর্ণ, চিরন্তন ও বিশ্বজনীন ব্যক্তির শেষ, চিরন্তন ও বিশ্বজনীন পয়গাম কি, যা সকল ধর্মকে চূড়ান্ত রূপ এবং আল্লাহর দীনকে চিরকালের জন্যে পরিপূর্ণতা দান করেছে এবং তাঁর দানের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।

ধর্ম মাত্রই দু'অংশে বিভক্ত। একটিকে ঈমান ও দ্বিতীয়টিকে আমল বা কর্ম বলা হয়। কর্মেরও আবার তিনটি অংশ। তন্মধ্যে একটি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, তাকে বলা হয় ইবাদত; দ্বিতীয়টির সম্পর্ক মানুষের কাজ কারবারের সঙ্গে, তাকে বলা হয় মুআমালাত বা ব্যবহারিক জীবন। এর বৃহত্তম অংশ হচ্ছে আইন-কানূন। তৃতীয়টি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল। একে বলা হয় আখলাক বা নৈতিক চরিত্র। বস্তুত ঈমান, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও নৈতিক চরিত্র-এ চারটি বিষয় নিয়েই ধর্ম। আর চারটি বিষয়ই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

www.bjilibrary.com

তাওরাত ও ইঞ্জীলে ঈমান ও আকিদার অধ্যায়গুলি একেবারেই অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ। সেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তওহীদের আলোচনা আছে। কিন্তু তার পেছনে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। আল্লাহর যে গুণাবলী মানবাত্মার পূর্ণত্ব প্রাপ্তির মাধ্যম এবং যে সব বিষয় অবলম্বনে আল্লাহর মারেফাত ও প্রেমের উদ্ভব হয়, তা তাওরাতে বা ইঞ্জীলে কোথাও নেই।

তাওহীদের পর হচ্ছে রিসালত। রিসালত ও নবুয়তের তাৎপর্য হলো ওহী, ইলহাম এবং আল্লাহ ও নবীর কথোপকথনের ব্যাখ্যা, নবীগণের মানবিক মর্যাদা, প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব সম্পর্কিত বার্তা, নবীগণের দায়িত্ব, নবীগণকে কোন পর্যায়ে স্বীকার করা উচিত, নবীগণের পাপহীনতা আর এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামের পূর্বের কোন পয়গামে নেই। পুরস্কার ও শাস্তি, বেহেশত ও দোযখ, হাশর-নশর, কিয়ামত, জীবন ও আখিরাত সম্পর্কিত আলোচনা তাওরাতে অত্যন্ত অস্পষ্ট। ইঞ্জীলে জনৈক ইহুদীর প্রশ্নের জবাবে ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে দু-একটি বাক্যের সন্ধান মেলে। বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কে দু-একটি বাক্য পাওয়া যায়। ব্যস এ পর্যন্তই শেষ! কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামে প্রত্যেকটি বস্তু পরিষ্কার ও বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়।

ফেরেশতাদের আলোচনা তাওরাতেও আছে। কিন্তু তা একেবারেই অস্পষ্ট। কখনো কখনো এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ এবং ফেরেশতাদের উল্লেখ এমনভাবে করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতার পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইঞ্জীলে দু-একজন ফেরেশতার নাম পাওয়া যায়। সেখানে 'রূহুল কুদুসের তাৎপর্য এতই সংশয়পূর্ণ যে, তাঁকে না ফেরেশতা বলা যেতে পারে, না আল্লাহ। অথবা এভাবেও বলতে পারেন যে, তাঁকে ফেরেশতা বলা যেতে পারে, আবার আল্লাহও বলা যেতে পারে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পয়গামে ফেরেশতাদের তাৎপর্য ও মৌলিকতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তাঁদের মর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে। তাঁদের কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে, পয়গম্বরদের সঙ্গে ও বিশ্বজাহানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আকিদা ঈমানের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম সব বিষয়েই পূর্ণতাদানকারী। এখন আমল বা কর্মের পর্যায়ে আসুন। কর্মের প্রথম অংশ

www.bjilibrary.com

হচ্ছে ইবাদত। তাওরাতে কুরবানীর দীর্ঘ আলোচনা এবং তার শর্ত ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে, রোযার উল্লেখও আছে, দোয়াও করা হয়েছে, 'বায়তুইল' বা 'বায়তুল্লাহ'র নামও পাওয়া যায়, কিন্তু এ সমস্ত বিষয় এতই অস্পষ্ট যে, এদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিই আকৃষ্ট হয় না–বরং এগুলি গুরুত্বহীন বিবেচিত হয়। উপরন্তু এখানে না ইবাদতের বিভাগ আছে, আর না তাদের পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইবাদতের কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি এবং নিয়মিত আল্লাহর স্মরণ ও দোয়ারও শিক্ষা দেয়া হয়নি। বান্দাকেও কোন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়নি। যাবুরে আল্লাহর নিকট বহু সংখ্যক দোয়া ও মুনাজাতের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইবাদতের পদ্ধতি, আনুষ্ঠানিকতা, সময় ও অন্যান্য শর্তসমূহের উল্লেখ অতি অল্প। বরং নেই বললেই হয়। এক স্থানে হযরত ঈসা (আ)-র চল্লিশ দিন উপবাসের উল্লেখ আছে। একে রোযাও বলতে পারেন। ইঞ্জীলে ইহুদীদের এ আপত্তিরও উল্লেখ আছে যে, তোমার শাগরিদরা রোযা রাখে না কেন? শূলদণ্ডের রাত্রে একটি দোয়ার উল্লেখ আছে এবং সেখানে একটি দোয়াও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ইবাদতের নাম-নিশানাও সেখানে নেই। অপরদিকে ইসলামের পয়গামের প্রত্যেকটি অংশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্তাবলীর ইবাদতের পদ্ধতি, আল্লাহর যিকির ও তাঁকে স্মরণ করার জন্য দোয়াসমূহ, নামাযের সময়, রোযার সময়, হজ্বের সময় এবং এগুলির প্রত্যেকটির বিধান, আল্লাহর সমীপে বান্দার নম্রতা প্রকাশ ও কান্নাকাটির দোয়া, মুনাজাত, আল্লাহর সমীপে গোনাহর স্বীকারোক্তি, তওবা ও লজ্জা প্রকাশ এবং বান্দা ও আল্লাহর পারস্পরিক ভালোবাসা ও গোপন সম্পর্কের এমন সব শিক্ষা দান করা হয়েছে, যা রূহের খোরাক সংস্থান করে, তার গ্রন্থিসমূহ খুলে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর এত সন্নিকটে পৌছিয়ে দেয় যে, ধর্মের সূক্ষ্ম প্রাণ পূর্ণাবয়ব দেহের রূপলাভ করে। আর এসবই হচ্ছে পয়গামে মুহাম্মদীর অনস্বীকার্য জ্বলন্ত প্রমাণ।

কর্মের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে ব্যবহারিক জীবন, অথবা দেশ ও সমাজের আইন। এ অংশটি হযরত মূসা (আ)-র পয়গামে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামে এগুলিকে অধিকাংশ

www.bjilibrary.com

ক্ষেত্রে বহাল রাখা হয়েছে। কিন্তু এ আইনসমূহের কঠোরতা হ্রাস করা হয়েছে। একটি জাতীয় আইনের সঙ্কীর্ণ পরিসর অতিক্রম করে এগুলিকে বিশ্বজনীন আইনের রূপ দান করা হয়েছে। এদিক দিয়ে যে-সকল পরিশিষ্ট অংশের প্রয়োজন ছিল, সেগুলি সংযোজন করা হয়েছে। যাবুর ও ইঞ্জীলে এ শরীয়ত ও আইনের লেশমাত্রও নেই। তালাক প্রভৃতি সম্পর্কে অবশ্যই ইঞ্জীলে দু'একটি বিধান আছে, অন্য কোন বিষয়ে কিছু নেই। কিন্তু বিশ্বজনীন ও চিরন্তন ধর্মের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য দেশ ও সমাজের উপযোগী আইনের প্রয়োজন ছিল। আর যেহেতু হযরত ঈসা (আ)-র পয়গামে এসব ছিল না, তাই খ্রিস্টান জাতির মূর্তিপূজারী গ্রীক ও রোমীয়দের নিকট থেকে এসব কিছু গ্রহণ করতে হয়েছে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম এগুলির প্রতিটি অংশে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পূর্ণতা প্রদান করেছে এবং এমন সব নীতি ও ব্যাপক নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করেছে, যার মাধ্যমে যুগে যুগে উলামা ও মুজাহিদগণ নতুন নতুন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন মাসায়েল উদ্ভাবন করেছেন। কমপক্ষে এক হাজার বছর পর্যন্ত ইসলাম দুনিয়ায় যে একচ্ছত্র শাসন ও শত শত প্রগতিশীল ও উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেসব পরিচালিত হয়েছিল এ আইনের সাহায্যে এবং আজো দুনিয়া এর চাইতে উত্তম আইন পেশ করতে পারেনি ও পারবে না।

কর্মের তৃতীয় অংশটি হচ্ছে নৈতিক চরিত্র। তাওরাতে নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে কতিপয় বিধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সাতটি হচ্ছে নীতিগত বিধান। এ বিধানসমূহের একটি মাতা-পিতার আনুগত্য সম্পর্কিত ইতিবাচক শিক্ষা দান করে। এছাড়া বাকি ছটি বিধানই নেতিবাচক। যেমন, তুমি হত্যা কর না, তুমি চুরি কর না, তুমি জেনা কর না, তুমি নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, তুমি নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীকে কামনা কর না, তুমি নিজের প্রতিবেশীর অর্থ-সম্পদের লোভ কর না। এগুলির মধ্যে ষষ্ঠ বিধানটি চতুর্থটির মধ্যে এবং সপ্তমটি তৃতীয়টির মধ্যে পাওয়া যায়। কাজেই মূলত চারটি বিধান থেকে যায়।

ইঞ্জীলেও এ বিধানগুলির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সংক্ষেপে অন্যকে ভালবাসারও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটিকে তাওরাতের বিধানের উপর

www.bjilibrary.com

অতিরিক্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম এই বিন্দুটিকেও সমুদ্রে পরিণত করেছে। এখানে সর্বপ্রথম বারটি মৌলিক বিধান নির্ধারিত হয়েছে। এ বিধানগুলি মিরাজের সময় আল্লাহর নিকট থেকে প্রদত্ত হয়েছিল। সূরায়ে ইসরা-এ এগুলি উল্লেখিত আছে। এ বারটি বিধানের এগারটি হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্র এবং একটি তাওহীদ সম্পর্কে। আবার এ বারটির মধ্যে পাঁচটি নেতিবাচক ও পাঁচটি ইতিবাচক এবং একটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই।

পিতা-মাতার সম্মান ও আনুগত্য কর, তোমার উপর যাদের হক আছে তাদের হক আদায় কর, এতিমের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, পরিমাপ, ওজন ও দাঁড়িপাল্লা ঠিক রাখ, নিজের ওয়াদা পূরণ কর, কেননা, এ সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে–এ পাঁচটি হচ্ছে ইতিবাচক। তোমার সন্তানকে হত্যা কর না, কাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা কর না, জ্বেনার নিকটেও যেও না, অজ্ঞাত বিষয়ের পেছনে ধাবিত হয়ো না, যমীনের ওপর অহঙ্কার কর না–এ পাঁচটি হচ্ছে নেতিবাচক। এছাড়া অমিতব্যয়ী হয়ো না এবং ভারসম্যপূর্ণ ও মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর–এটি নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় ধরনের হুকুমের শামিল। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম কিভাবে পূর্ণতাদানকারী পয়গাম হিসেবে দুনিয়ায় আগমন করেছে, কেবল এই মৌলিক বিধানগুলির তুলনামূলক আলোচনায় তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়ে গেছে। এ পয়গাম কেবল ঐ বিধানসমূহকে ব্যক্ত ও পরিপূর্ণ করেনি বরং নৈতিকতার প্রতিটি গ্রন্থি উম্মোচন করেছে, মানুষের প্রতিটি শক্তির প্রয়োগক্ষেত্র নির্ণয় করেছে, তার প্রতিটি দুর্বলতা প্রকাশ করেছে, আত্মার প্রত্যেকটি রোগ নির্ধারণ করেছে এবং তার ঔষধ বাতলে দিয়েছে।

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামের মাধ্যমে কর্ম এভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে।

ইসলামী শিক্ষার বিরাট ও বিপুল সম্পদকে যদি আমরা মাত্র দুটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই, তাহলে তাকে বলতে হয়–ঈমান ও সৎ কর্ম। ঈমান ও সৎ কর্ম এ দুটি বস্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র সকল প্রকার পয়গামকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং পবিত্র কুরআনে এ দু'টি বস্তুর উপর মানুষের নাজাত নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের ঈমান

www.bjilibrary.com

পবিত্র, সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ও শক্তিশালী হতে হবে আর কর্ম হতে হবে উৎকৃষ্ট ও সৎ।

কুরআনে বহু স্থানে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে) এবং প্রত্যেক স্থানে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাফল্য ও কল্যাণ একমাত্র ঈমান ও সৎ কর্মের ওপর নির্ভরশীল। আমি এ মৌলিক বিষয় দু'টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে আপনাদের সম্মুখে পেশ করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তাই এখন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামের কেবল সেই অংশটি পেশ করছি, যেটি ঈমান ও কর্মের ব্যাপারে সমগ্র দুনিয়ার বিভ্রান্তি অপনোদন করেছে, অসম্পূর্ণ দীন ও জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণতা দান করেছে এবং এমন সব নীতিগত ও মৌলিক ভ্রান্তি দূর করেছে, যেসব কারণে মানবতা সীমাহীন অবনতি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছিল। ঐ বিভ্রান্তিগুলিই ছিল সকল প্রকার ভ্রষ্টতার মূল।

১. মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে বিশ্বজাহান ও আল্লাহর সৃষ্টিকূলের মধ্যে মানুষের মর্যাদা। এটিই তাওহীদের ভিত্তিমূল। ইসলামপূর্ব যুগে মানুষ আল্লাহর অধিকাংশ সৃষ্টির চাইতে নিজেকে স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন মনে করত। সে কঠিন প্রস্তর, সুউচ্চ পাহাড়, প্রবহমান নদী, সবুজ বৃক্ষ, বর্ষণশীল বারিধারা, প্রজ্বলিত অগ্নি, ভীতিপূর্ণ বনানী, বিষাক্ত সাপ, শিকারী সিংহ, দুগ্ধ দানকারী গাভী, উজ্জ্বল সূর্য, প্রদীপ্ত তারকা, কৃষ্ণ রজনী, ভয়াবহ প্রকৃতি তথা দুনিয়ার যে সকল বস্তুকে ভয় করতে অথবা যাদের দ্বারা লাভবান হবার বাসনা রাখতো, তাদের প্রত্যেকটিকে পূজা করত এবং তাদের সম্মুখে করজোড়ে মাথা নত করত। অতঃপর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) এসে দুনিয়াকে এ পয়গাম শোনালেন ঃ 'হে মানব জাতি! এ সকল বস্তু তোমাদের প্রভু নয় বরং তোমরা তাদের প্রভু। তাদেরকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমাদেরকে তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তারা তোমাদের সম্মুখে নত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা তাদের সম্মুখে নত হচ্ছো কেন? হে মানব জাতি! এ বিশ্ব জাহানে তোমরা আল্লাহর

www.bjilibrary.com

প্রতিনিধি ও খলীফা! তাই সমগ্র বিশ্বজাহান ও তার মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টিকে তোমাদের অনুগত করা হয়েছে! তোমরা তাদের অনুগত নও। তারা তোমাদের জন্য, তোমরা তাদের জন্য নও।'

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً -

(স্মরণ কর) যখন তোমার আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে নিজের খলীফা বানাতে চাই।' (সূরা আল বাকারা- ৩০)

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ فِى الْاَرْضِ -

'এবং সেই আল্লাহই পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল-আন-আম)

এই প্রতিনিধিত্ব ও খিলাফত আদমকে ও আদম সন্তানদেরকে সমগ্র সৃষ্টির মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কুরআন বলছে ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ

'আর অবশ্যই আমি বনী আদমকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি।' কাজেই সবচাইতে মর্যাদাশালী হবার পর এখন কি তারা নিজেদের চাইতে কম মর্যাদাশালী ও হীনতর সৃষ্টির সম্মুখে মাথানত করবে?'

ইসলাম মানুষকে এই কথা উপলব্ধি করিয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِى الْاَرْضِ -

'তোমরা কি দেখনি, যা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সব কিছুকেই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন?' (সূরা আল হজ্জ- ৬৫)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا .

'তিনিই তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল বাকারা-২৯)

তোমাদের জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন। যেমন–

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ .

'আর পশুদের সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের জন্য, তাদের পশমে উষ্ণতা ও অন্যান্য উপকার পাওয়া যায়।' (সূরা আন্ নহল- ৫)

www.bjilibrary.com

বৃষ্টি এবং তার সাহায্যে উৎপাদিত শাক-সবজি ও বৃক্ষাদি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ- يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ـ

'তিনি (আল্লাহ্) আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন। তা থেকে কিছু তোমরা পান কর, আর কিছুর সাহায্যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে তোমরা পশু চরিয়ে থাক। তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য শস্য, যয়তুন (তৈল), খেজুর, আংগুর ও সব রকমের ফল উৎপন্ন করেন।'

(সূরা আন্ নহল- ১০-১১)

রাত্রি, দিন, চন্দ্র, সূর্য, তারকা সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ -

'আর তিনি (আল্লাহ্) রাত্রি, দিন, চন্দ্র ও সূর্যকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন এবং তারকারাজি তাঁর নির্দেশে কর্মরত।'

(সূরা আন্ নহল- ১২)

সমুদ্র এবং তার প্রবাহও তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

যেমন,

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

'আর তিনি (আল্লাহ্) সমুদ্রকে তোমাদের করায়ত্ত করেছেন, যেন তোমরা তা থেকে তাজা গোশ্ত (মাছের) আহরণ করতে পারো এবং পরিধানে ব্যবহার করার জন্য তা থেকে মোতি আহরণ করতে পারো। তোমরা জাহাজগুলিকে সমুদ্রের বুক চিরে অগ্রসর হতে দেখতে পাও। যাতে করে তোমরা আল্লাহর মেহেরবানী প্রদত্ত সম্পদ তালাশ করতে পার এবং

www.bjilibrary.com

যাতে করে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।'

(সূরা আন্ নহল- ১৪)

এ অর্থে আরও বহু আয়াত কুরআন মজীদে রয়েছে। এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পয়গাম একথা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ হচ্ছে বিশ্বজাহানের মধ্যমণি। আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে সে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সে হচ্ছে বিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্য এবং وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ হচ্ছে তার সীলমোহর। চিন্তা করুন এ সত্য উদ্ঘাটিত হবার পর মানুষের জন্য বিশ্বজাহানের কোন অংশ বা সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত কি সঙ্গত? এবং তার সম্মুখে মাটিতে কপাল রাখা কি শোভনীয়?

নির্বোধ লোকেরা একে অপরকে আল্লাহ্ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছিল। তারা কখনো অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, কখনো ক্ষমতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ফিরাউন, নমরূদ ও শাহানশাহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কখনো পবিত্রতার বেশ ধারণ করে যোগী ও সন্ন্যাসী আখ্যা লাভ করেছিল। আবার কখনো পোপ, রাব্বি ও দরবেশ সেজে নিজেদেরকে উপাস্য হিসেবে স্বীকার করাতে চেয়েছিল। এসবই ছিল মানবতার লাঞ্ছনা ও অমর্যাদার বিভিন্ন রূপ। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পয়গাম এসব অনাচারের শিকড় কেটে দিয়ে ঘোষণা করেছে ঃ

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

'আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে একে অপরকে নিজের 'রব' হিসেবে গ্রহণ করবে না।' (সূরা আলে ইমরান- ৬৪)

এমন কি নবীদের জন্যেও একথা বলার অবকাশ নেই–

كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

'অন্য সব আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা আমার বান্দায় পরিণত হও।'

(সূরা আলে ইমরান- ৭৯)

অদৃশ্য সত্তাসমূহের মধ্যে ফেরেশ্তাগণ এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য সত্তাসমূহের মধ্যে নবীগণ সবচাইতে উন্নত। কিন্তু তারাও মানুষের উপাস্য হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ـ

'আর তিনি (আল্লাহ্) ফেরেশ্তা ও নবীদেরকে 'রব' মেনে নেয়ার নির্দেশ দেন না।' (সূরা আলে ইমরান- ৮০)

বস্তুত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পয়গামের মাধ্যমে মানব জাতির মর্যাদা এত অধিক উন্নত হয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সামনে তার মাথা নত হতে পারে না এবং কারো সামনে তার হস্তও প্রসারিত হতে পারে না। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় করা চলবে না। আসমান ও যমীনে একমাত্র তাঁকেই ভয় করা হয়। তিনি যার নিকট থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে চান তাকে কেউ রাখতে পারে না এবং তিনি যাকে দেন তার নিকট থেকে কেউ ছিনিয়েও নিতে পারে না।

وَهُوَ الَّذِيْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ـ

'আর তিনিই আসমানে আল্লাহ্ এবং তিনিই যমীনেও আল্লাহ'।

(সূরা আয্ যুখরুফ- ৮৪)

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ـ

'জেনে রাখো, সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দান করা একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত।' (সূরা আল আ'রাফ)

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

'কর্তৃত্ব ও নির্দেশ দানের অধিকার একমাত্র তাঁরই।'

(সূরা আল-আন-আম)

لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ ـ

'তার কর্তৃত্বে শরীক নেই।' (সূরা আল ফুরকান)

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র এ পয়গামকে সামনে রেখে একবার তাওহীদকে বুঝবার চেষ্টা করুন, তাহলে জানতে পারবেন যে, এ ছাড়াও মানুষের মর্যাদাকে তিনি কতদূর উন্নত করেছেন এবং তাওহীদের তাৎপর্যকেও কিভাবে ব্যক্ত করেছেন। এখানে কোন 'কায়সার' ও 'কিসরা' আল্লাহ্র সহযোগী নয়। যা কিছু আছে সব একমাত্র আল্লাহ্র, কায়সারের

www.bjilibrary.com

কিছুই নেই। রাষ্ট্র একমাত্র তাঁর ও কর্তৃত্ব তাঁরই। তাঁর একই নির্দেশ যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

বন্ধুগণ! একবার চিন্তা করে বলুন, খেলাফতের নেশায় বিভোর হয়ে মানুষ কি কখনো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নত করতে পারে? নিকষ অন্ধকার, উজ্জ্বল আলোক, প্রবল বায়ুপ্রবাহ, উত্তাল অথৈ পানি, পরাক্রমশীল বাদশাহ, শক্তিশালী দুশমন, বিপুল বিস্তৃত বনানী, সুউচ্চ পাহাড়, দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর অথবা বিরাট সমুদ্র-আল্লাহ ছাড়া এসবের কোনটির সামনে একজন সত্যিকার মুসলমানের অন্তর ভীত-প্রকম্পিত হতে পারে? এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার নৈতিক জোরের প্রতি লক্ষ্য করুন এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পয়গামের উচ্চ মর্যাদাও অনুধাবন করুন।

২. মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র দ্বিতীয় মৌলিক পয়গাম হচ্ছে এই যে, জন্মগতভাবে মানুষ পবিত্র, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ। ভালমন্দ কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে ফেরেশ্‌তা বা শয়তান অর্থাৎ বেগুণাহ্ বা গুণাহ্গারে পরিণত করে। মানুষের মূল প্রকৃতি পরিষ্কার ও দাগশূন্য। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র নিকট থেকে মানুষ এ বৃহত্তম সুসংবাদ লাভ করেছে। বার্মা, পাক-ভারত ও বাংলাদেশের সকল ধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। গ্রীসের কতিপয় নির্বোধ দার্শনিকও এ চিন্তার সাথে একমত। কিন্তু এ ধারণাটি মানব জাতিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে এবং তার পিঠের ওপর ভারী বোঝা স্থাপন করেছে। তার প্রত্যেকটি কর্মকে অন্য কর্মের ফল হিসেবে চিত্রিত করে তাকে অক্ষম প্রাণীতে পরিণত করেছে। এবং তার প্রত্যেকটি জীবনকে অন্য জীবনের হাতে সোপর্দ করেছে। এ আকিদা অনুযায়ী কোন মানুষের পুনর্জন্মই তার গুনাহ্গার হবার প্রমাণ। খ্রিস্টধর্মও মানব জাতির এ বোঝা হালকা করেনি বরং আরো বাড়িয়েছে। খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাদান করেছে যে, প্রত্যেকটি মানুষ পিতা আদমের গুনাহর কারণে উত্তরাধিকারাসূত্রে গুনাহ্গার। ব্যক্তিগতভাবে কোন গুনাহ্ না করলেও উত্তরাধিকারাসূত্রে প্রাপ্ত এ গুনাহ্ থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তাই মানুষের পাপমুক্তির জন্য উত্তরাধিকারাসূত্রে পাপী নয় এমন এক অতি মানুষের প্রয়োজন, তিনি নিজের প্রাণ দান করে মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

www.bjilibrary.com

কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স) এসে দুঃখী মানবতাকে এ সুসংবাদ শোনালেন যে, তোমরা নিজেদের পূর্বজন্ম ও কর্মফলের ক্রীড়নক নও, তোমরা অক্ষম নও এবং তোমাদের পিতা আদমের গুনাহ্র কারণে তোমরা জন্মগতভাবে গুনাহ্গার নও, বরং তোমরা স্বাভাবিক নিয়মেই পাক-পবিত্র, নিষ্কলংক ও নির্দোষ। ইচ্ছা করলে তোমরা নিজেদের কর্মের মাধ্যমে নিজেদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে অথবা অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে নিমজ্জিত হতে পার।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ- وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ- وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ. ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ.

'ত্বীন ও যয়তুন বৃক্ষ এবং সিনাই পাহাড় ও এই শান্তি শহরের (মক্কা) শপথ, অবশ্যই আমি মানুষকে উত্তম ভারসাম্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে নিম্ন হতে নিম্নতর পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেই, কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে নয়।' (সূরা আত্ তীন)

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-র পয়গাম মানবজাতিকে এ সুসংবাদ দান করেছে যে, মানুষকে সর্বোত্তম অবস্থা, সর্বোত্তম ভারসাম্য ও সরলতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু নিজের কর্মের কারণে সে সৎ ও অসৎ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا- فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

'নফসের শপথ ও তাকে যথাযথভাবে গঠন করার শপথ, অতঃপর আমি তাকে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান দান করেছি। যে তাকে (নফসকে) পবিত্র রেখেছে, সে সফলকাম হয়েছে আর যে তাকে (নফসকে) মলিন করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।' (আশ শামস্)

মানবতার প্রকৃতিগত পাক-পবিত্রতার জন্য এর চাইতে স্বচ্ছ পয়গাম আর কি হতে পারে? সূরায়ে দাহারে পুনর্বার বলা হয়েছে ঃ

www.bjilibrary.com

انَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ . نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا . انَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا .

'অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এক বিন্দু যৌগিক পদার্থ থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করি। অতঃপর তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। নিশ্চয়ই আমিই তাকে পথ দেখিয়েছি। এরপর কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ হওয়া তার ইচ্ছাধীন।' (সূরা আদদাহর)

সুরায়ে ইনফিতারে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ - الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ .

'হে মানুষ! তোমরা দানশীল প্রতিপালকের ব্যাপারে কি জন্য প্রতারণার মধ্যে অবস্থান করছ? যিনি তোমাদের যথাযথ রূপ দান করেছেন, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের ভারসাম্য দান করেছেন। যেভাবে ইচ্ছা তিনি তোমাদের সংযুক্ত করেছেন।'

(সূরা আল-ইন-ফিতার- ১)

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র ওহীর ভাষায় দীন (জীবন-বিধান) ও প্রকৃতি দুটি সমার্থক শব্দ। দীন হচ্ছে আসল প্রকৃতি আর পাপ মানুষের একটি রোগ, তা বাইরে থেকে মানুষকে আক্রমণ করে।

কুরআন বলে ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ . ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

'তুমি বাতিল থেকে সরে এসে নিজেকে দীনের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহ্ তাঁর নিজের প্রকৃতির ওপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হচ্ছে সহজ-সরল দীন। কিন্তু অনেকেই তা জানে না।' (সূরা আররূম-৪)

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ্ (স)-র এক পয়গামে এ আয়াতটির অর্থ পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়েছে। বুখারী শরীফে সূরায়ে রূমের তফসীরে উল্লেখিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

مَامِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلاَّ عَلَى الْفِطْرَةِ .....

অর্থাৎ 'এমন কোন শিশু নেই যে, স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু পরবর্তীকালে তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপুজারীতে পরিণত করে। যেমন দেখা যায় প্রত্যেক পশুর বাচ্চা নিখুঁত জন্মায়। আপনারা কি কখনো কোনো পশুর কানকাটা বাচ্চা জন্মাতে দেখেছেন?'

চিন্তা করুন! মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র এ পয়গাম মানবজাতিকে কত বড় সুসংবাদ দান করেছে। মানুষের চিরন্তন দুঃখকে কিভাবে আনন্দে পরিবর্তিত করেছে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে নিজের জীবনের কর্মক্ষেত্রে কিভাবে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছে।

৩. মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার সমগ্র জনবসতি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। মানুষ পরস্পরের নিকট অপরিচিত ছিল। হিন্দুস্তানের মুনি-ঋষিগণ আর্যাবর্তের বাইরে আল্লাহ্র বাণীর জন্যে কোন স্থান রাখেননি। তাঁদের মতে পরমেশ্বর কেবল আর্যাবর্তের মানুষের কল্যাণ চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ কেবল এদেশের এবং এখানকার কতিপয় খান্দানকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। যরথুষ্ট্র ইরানের পবিত্র মানবগোষ্ঠী ছাড়া আর কোথাও আল্লাহ্র বাণী শুনাতেন না। বনী ইসরাঈলগণ তাদের নিজেদের খান্দানের বাইরে কোন রাসূল ও নবীর আবির্ভাবের অধিকার স্বীকার করতো না। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পয়গামই সর্বপ্রথম পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সর্বত্র আল্লাহর আওয়াজ শোনায় এবং বলে যে, নেতৃত্ব কোন বিশেষ দেশ, জাতি ও ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাঁর দৃষ্টিতে ফিলিস্তীন, ইরান, হিন্দুস্তান ও আরব সকল দেশই সমান। সর্বত্রই তাঁর পয়গামের আওয়াজ ধ্বনিত হয়েছে এবং তাঁর নেতৃত্বের আলোক সকল দিকেই বিচ্ছুরিত হয়েছে।

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ ـ

www.bjilibrary.com

'এমন কোনো জাতি নেই যার মধ্যে একজন ভীতি প্রদর্শনকারী আবির্ভূত হননি।' (সূরা আল ফাতির)

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ـ

'আর প্রত্যেক জাতির জন্য এসেছেন একজন পথপ্রদর্শক।'

(সূরা আল ওয়া'দি)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً اِلٰى قَوْمِهِمْ ـ

'আর আমি (আল্লাহ্) তোমার (মুহাম্মদ) পূর্বে তাদের নিজেদের জাতিদের নিকট বহু রাসূল পাঠিয়েছি।' (সূরা আররূম)

কোনো ইহুদী তার জাতির বাইরে কোন পয়গম্বরকে স্বীকার করে না। কোনো খৃস্টানের জন্য বনী ইসরাঈল বা অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দকে স্বীকার করা অপরিহার্য নয় এবং এহেন কর্মের দ্বারা তার খৃস্টানিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আর্যাবর্তের বাইরে আল্লাহর কোনো বাণী আগমনে বিশ্বাসী নয়। ইরানের যরথুষ্ট্র মতাবলম্বীগণ নিজেদের দেশ ছাড়া দুনিয়ার সকল দেশকেই অন্ধকার রাজ্য বিবেচনা করে। কিন্তু একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামই ঘোষণা করে যে, সমগ্র দুনিয়া আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর দানে প্রত্যেক জাতি, গোত্র ও বংশ সমান অংশীদার। ইরান বা হিন্দুস্তানে, চীনে বা গ্রীসে, আরবে বা সিরিয়ায় সর্বত্রই আল্লাহর জ্যোতি সমানভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দুনিয়ার যেখানেই জনবসতি আছে, সেখানেই আল্লাহ তাঁর দূত পাঠিয়েছেন, তাঁর পথ-প্রদর্শনকারীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন আর তাঁদের মাধ্যমে নিজের বিধিবিধান সম্পর্কে সবাইকে অবগত করেছেন।

ইসলামের এ শিক্ষার ফলে কোনো মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ না সে দুনিয়ার সকল পয়গম্বরের উপর, আসমানী কিতাবসমূহের ওপর এবং আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ববর্তী বাণীসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। কুরআনে যে সকল পয়গম্বরের নাম উল্লেখিত হয়েছে, তাঁদের নামসহ আর যাঁদের নাম অজ্ঞাত অর্থাৎ কুরআন জানায়নি তাঁরা, যে দেশেই আবির্ভূত হোন না কেন এবং যে নামেই পরিচিত হোন না কেন, তাঁদের সবাইকে সত্য স্বীকার করা অপরিহার্য।

www.bjilibrary.com

মুসলমান কে?

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -

(হে মুহাম্মদ!) তোমার উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছিল, তার ওপর যারা ঈমান রাখে।'

(সূরা আল বাকারাহ)

পূনর্বার সূরায়ে বাকারায় উক্ত হয়েছে ঃ

لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ -

'কিন্তু নেকী তার জন্য নির্ধারিত যে আল্লাহর ওপর, আখেরাতের দিনের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর ও সকল নবীর ওপর ঈমান এনেছে।'

(সূরা আল বাকারাহ)

এ সূরার শেষের দিকে বলা হয়েছে ঃ পয়গম্বর ও তাঁর অনুসারীগণের

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ -

'সবাই ঈমান এনেছেন আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর ও তাঁর রাসূলগণের ওপর। (তারা বলেন ঃ) আমরা তাঁর (আল্লাহর) রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।'

(সূরা আল বাকারাহ)

অর্থাৎ এমন নয় যে, তাঁদের কারো ওপর ঈমান আনবে এবং কারো ওপর ঈমান আনবে না। সমগ্র মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ -

'হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রাসূলের ওপর এবং যে কিতাব ইতিপূর্বে নাযিল হয়েছে তার ওপর।'

(সূরা আন নিসা- ১৩৬)

www.bjilibrary.com

বন্ধুগণ! মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া আর কে দুনিয়াকে এই আধ্যাত্মিক সাম্য, মানবিক ভ্রাতৃত্ব এবং সকল সত্য ধর্ম, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পয়গম্বরগণের প্রতি যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন ও সমানভাবে তাঁদের সত্যতার স্বীকৃতির শিক্ষাদান করেছে? এবার চিন্তা করুন, ইসলামের পয়গম্বরের 'রহমত' কত সার্বজনীন, তাঁর সহানুভূতি ও সাম্যের পরিসর কত ব্যাপক! কোনো মানুষ, কোনো আবাস, বনী আদমের কোনো গৃহ এ থেকে মুক্ত নয়।

৪. সকল ধর্ম উপাস্য ও উপাসক, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যস্থলে কোনো না কোনো ধরনের মধ্য-সত্তা সৃষ্টি করে রেখেছিল। প্রাচীন মন্দিরগুলোর পূজারী ও পুরোহিত ইহুদীরা বনী লাবী ও তাঁর বংশধরদেরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বান্দার ইবাদত ও কুরবানীর মধ্যস্বত্বা বিবেচনা করত। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসার কতিপয় হাওয়ারী (সাথী) ও তাদের স্থলাভিষিক্ত পোপদেরকে এ মর্যাদা দান করেছিল যে, তারা যমীনের ওপর যা বাঁধবে, আকাশেও তাই উন্মুক্ত করা হবে। তাদেরকে সকল মানুষের গোনাহ মাফ করার অধিকার দান করা হয়েছে। তাদের সাহায্য ছাড়া কোন ইবাদত হতে পারে না। হিন্দুদের মতে আল্লাহ বিশেষভাবে ডান হাত দিয়ে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করেছেন। সে-ই হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যস্বত্বা। তার সাহায্য ছাড়া হিন্দুর কোন ইবাদত সম্পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু ইসলামে পূজারী পুরোহিত পোপ ও পাদ্রীদের কোন শ্রেণী নেই। এখানে বাঁধা ও খোলার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এখানে গোনাহ মাফ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। উপাস্য, উপাসক, আল্লাহ ও বান্দার ইবাদত এবং গোপন সম্পর্কের মধ্যে অন্য কারো কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক মুসলমান নামাযের ইমাম হতে পারে, কুরবানী করতে পারে, বিয়ে পড়াতে পারে এবং ধর্মের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারে। এখানে মানবজাতির জন্য اُدْعُونِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (হে লোকেরা সরাসরি আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের জবাব দেব)-এর আহবান সর্বজনীন। প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারে, নিজের দোয়ার মধ্যে তাঁকে ডাকতে পারে, তাঁর নিকট মাথা নত করতে পারে এবং হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ সরাসরি পেশ করতে পারে। এখানে উপাস্য ও উপাসক এবং আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে

www.bjilibrary.com

কোন মধ্যস্বত্ব নেই। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র মাধ্যমে মানবজাতিকে এ শ্রেষ্ঠতম আযাদী দান করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে মানুষ মানুষের দাসত্বমুক্ত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের পুরোহিত, প্রিস্ট, পোপ ও ব্রাহ্মণ।

৫. মানুষের শিক্ষা ও হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে যে সকল পবিত্রাত্মা আগমন করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে শুরু থেকেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে সীমাতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল এবং তাদের মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল। বাড়াবাড়ি এই ছিল যে, মূর্খরা তাঁদেরকে আল্লাহ, আল্লাহর সমতুল্য, আল্লাহর রূপ বা তাঁর প্রকাশ গণ্য করেছিল। ব্যাবিলন, আসিরিয়া ও মিসরের ধর্ম মন্দিরসমূহে পুরোহিতদেরকে আল্লাহর সমতুল্যরূপে দেখা যায়। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ স্বীকৃতি লাভ করেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীগণ যথাক্রমে নিজেদের ধর্মপ্রবর্তক বুদ্ধ ও মহাবীরকে আল্লাহ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। খ্রিস্টানরা তাদের পয়গম্বরকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করেছে। অন্যদিকে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত, সে ছিল নবী ও পয়গম্বর, সে গোনাহগার হোক বা নৈতিক দিক দিয়ে যতই নিম্ন পর্যায়ের এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সে যে কোনো পর্যায়ে অবস্থান করুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। তার সৎ ও নিষ্পাপ হওয়াও জরুরী ছিল না। তাই বনী ইসরাইলদের বর্তমান আসমানী কিতাব ও পুস্তিকাসমূহে বড় বড় পয়গম্বরগণ সম্পর্কে এমন সব কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যা একেবারেই নিম্নমানের। এমন কি তা উল্লেখ করারও যোগ্য নয়।

ইসলাম এ বিরাট দায়িত্বটির মর্যাদা নির্ধারণ করেছে এবং বলেছে যে, নবীগণ আল্লাহ্ নন, আল্লাহ্র সমতুল্যও নন, অবতারও নন এবং আল্লাহ্র পুত্র ও আত্মীয়ও নন। তাঁরা হচ্ছেন মানুষ, নিছক মানুষ, রক্তমাংসের দেহবিশিষ্ট মানুষ। নির্জলা মানুষরূপেই সকল পয়গম্বর আগমন করেছিলেন এবং সর্বশেষ পয়গম্বর নিজের সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'আমি একজন মানুষ মাত্র।' কাফেররা সবিস্ময়ে বলতো ঃ

اَبَشَرًا رَّسُوْلًا 'মানুষ কি রাসূল হতে পারে?'

www.bjilibrary.com

ইসলাম বলে, 'হ্যাঁ।

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً

'হে পয়গম্বর! বলে দাও, আমি তোমাদেরই মত মানুষ!' 'আমি তো মানুষ-রাসূল ছাড়া কিছুই নই।'

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতের কোনো বস্তুর উপর নবীগণের সরাসরি কোনো অধিকার নেই। তাঁরা সরাসরি কোনো অতি মানবিক কার্য সম্পাদনের শক্তি রাখেন না। তাঁরা সব কিছু আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইশারায় সম্পাদন করেছেন।

অন্যদিকে বলা হয়েছে, যদিও তাঁরা মানুষ–তবুও নিজেদের কর্মশক্তি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে তাঁরা সমস্ত মানুষের উর্ধে। তাঁরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের ওপর আল্লাহ্‌র ওহী নাযিল হয়। তাঁরা নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক। কেননা তাঁরা হবেন পাপীদের জন্য আদর্শ। তাঁদের হাত দিয়েই আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ ও ইশারার মাধ্যমে নিজের অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করেন। তাঁরা মানুষকে সৎবৃত্তি শিক্ষা দেন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁদের আনুগত্য সবার ওপর ফরয। তাঁরা আল্লাহ্‌র বিশেষ, খাঁটি ও অনুগত বান্দা। আল্লাহ্ তাঁদেরকে রিসালাত ও পয়গম্বরীর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পয়গাম নবী ও রাসূলগণের সম্পর্কে এই ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থার প্রচলন করেছে। এ পন্থা সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও সীমাতিরিক্ততার ত্রুটিমুক্ত। যে ধর্ম দুনিয়ায় তাওহীদকে পূর্ণতা দান করেছে, এটি একমাত্র তারই উপযোগী।

বন্ধুগণ! আমাদের আজকের আলোচনা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। এখনো অনেক কথা বলা হলো না। ইনশাআল্লাহ্ আগামী আলোচনায় আরো কিছু পেশ করবো। রাত অনেক হয়ে গেছে। তাই আজকের মজলিস এই চিরন্তন, পরিপূর্ণ ও বিশ্বজনীন শিক্ষকের প্রতি দরূদ ও সালামের মাধ্যমে শেষ করছি।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

www.bjilibrary.com

অষ্টম বক্তৃতা

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পয়গাম–কর্ম

www.bjilibrary.com

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পয়গাম–কর্ম

বন্ধুগণ! আজ আমার ও আপনাদের মাসিককাল সাক্ষাতকারের সিলসিলা খতম হয়ে যাচ্ছে। আমার অষ্টম মৌলিক বিষয়গুলোর বক্তৃতা আজ শুরু হচ্ছে। এ শেষ বক্তৃতা দু'টিতে আমি ইসলাম সম্পর্কে সব কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাচ্ছি।

তাওহীদের ব্যাপারে পূর্বের অন্যান্য ধর্মগুলো–যেগুলো মূলত তাওহীদেরই পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিল–তিনটি কারণে বিভ্রান্তি ও গোমরাহির সৃষ্টি করেছে।

প্রথমত, দেহভিত্তিক উপমা ও রূপ বর্ণনা।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর গুণাবলীকে তাঁর অস্তিত্ব থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র মনে করা।

তৃতীয়ত, কর্মবৈচিত্র্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম এ গ্রন্থিগুলো উন্মুক্ত করেছে, এ বিভ্রান্তিগুলো আপনোদন করেছে এবং এ সত্যকে আবরণমুক্ত করেছে। সর্বপ্রথম উপমা ও রূপকের আলোচনায় আসুন।

'আল্লাহকে, আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে, আল্লাহ্‌ ও বান্দার পারস্পরিক সম্পর্ককে সুস্পষ্ট করার জন্য অন্যান্য ধর্মগুলোর ভক্তবৃন্দ কাল্পনিক অথবা বস্তুগত উপমা ও রূপকের অবতারণা করে। ফলে ধীরে ধীরে আল্লাহ্‌র আসল অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে থাকে এবং তদস্থলে উপমা ও রূপকে বর্ণিত আস্তিত্বগুলো আল্লাহ্‌র স্থান দখল করে। এ অস্তিত্বগুলো পরে দেহ ধারণ করে মূর্তির রূপলাভ করে এবং মানুষ তাদের পূজা করতে শুরু করে। বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র স্নেহ, ভালোবাসা ও করুণাকেও উপমা ও রূপকের রঙে রঙীন করে দেহের রূপদান করা হয়। আর্যজাতিগুলোর মধ্যে যেহেতু নারী ছিল প্রেমের দেবী, তাই আল্লাহ্‌ ও বান্দার সম্পর্ককে 'মাতা' ও 'পুত্র'

www.bjilibrary.com

নামে অভিহিত করা হয়। আর এ জন্য সেখানে আল্লাহ 'মা' রূপে আগমন করেছেন। হিন্দুদের অন্যান্য কতিপয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ অনাস্বাদিত প্রেমকে নারী-পুরুষ এবং স্বামী-স্ত্রী শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। চিরসোহাগী যোগীরা শাড়ী ও চুড়ি পরিধান করে এ বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। গ্রীক ও রোমীয়দের মধ্যেও আল্লাহকে নারী মূর্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে। সিরীয় জাতিদের নিকট প্রকাশ্যে নারীর নামোচ্চারণ ছিল সভ্যতা বিরোধী। তাই পিতা খান্দানের মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এভাবে ব্যাবিলন, আসিরিয়া ও সিরিয়ার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে আল্লাহকে পুরুষের রূপে দেখা যায়। বনী ইসরাঈলদের প্রারম্ভিক চিন্তাধারায় আল্লাহকে পিতা এবং সকল ফেরেশতা ও মানুষকে তার সন্তানরূপে চিত্রিত করা হয়। পরবর্তীকালে কেবল বনী-ইসরাঈলগণই পিতারূপী আল্লাহর সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বনী-ইসরাঈলদের কতিপয় সহীফায় আল্লাহ ও বনী-ইসরাঈলদের সম্পর্ককে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক রূপে পেশ করা হয়েছে। এমন কি বনী-ইসরাঈল ও জেরুসালেম স্ত্রী হিসেবে এবং আল্লাহ এদের স্বামী হিসেবে পরিগণিত হয়। খ্রিস্টানদের মধ্যেও পিতা এবং পুত্রের উপমা আসল সম্পর্কের স্থান লাভ করে। আরবদের মধ্যেও এমনিতর ধারণা ছিল। আল্লাহকে পিতারূপে ধারণা করা হতো এবং ফেরেশতাদেরকে তাঁর কন্যারূপে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম ঐ সমস্ত উপমা, রূপক ও প্রবাদকে নিমেষেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং ওগুলোর ব্যবহার শিরকরূপে গণ্য করেছে। এখানে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে – لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

'তাঁর সমতুল্য কোন বস্তুই নেই।' এ একটি বাক্যই যাবতীয় শিরকের ভিত্তিমূল উৎপাটিত করেছে। অতঃপর ছোট একটি সূরার সাহায্যে মানুষের বৃহত্তম বিভ্রান্তি দূর করেছে ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ- وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۔

'(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও, আল্লাহ এক। আল্লাহ (নিজেই প্রত্যেক বস্তুর) মুখাপেক্ষীহীন। এবং সকল বস্তুই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেন না (যারা তাঁর সন্তান গণ্য হতে পারে)। এবং তিনি কারো জাতও নন

www.bjilibrary.com

(যাতে করে কারো সন্তান হয়ে তারপর আল্লাহ হতে হয়)। এবং তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই (যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।)'–(সূরা আল ইখলাস)

কুরআনের এই সবচাইতে ছোট্ট সূরাটির মাধ্যমে তাওহীদের পরিচ্ছন্ন চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। যার ফলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র দীন সব রকমের গলদমুক্ত হয়েছে।

বন্ধুগণ! এর অর্থ এ নয় যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার প্রেম, ভালবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন করছেন, বরং তিনি এ সম্পর্কগুলোকে আরো অধিক শক্তিশালী ও গভীর করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কগুলো প্রকাশ ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন মানবিক আকৃতির মাধ্যমে যে দেহভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রচলন ছিল, কেবল সেগুলোকে বিলুপ্ত করেছেন। কারণ প্রথমত, এ মানবিক পদ্ধতি সত্যের প্রকাশ থেকে বহু দূরে অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে বান্দা ও আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক, তার তুলনায় পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা অথবা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নেহাতই অর্থহীন ও নিম্নস্তরের। দ্বিতীয়ত, ঐ ব্যাখ্যাসমূহের দ্বারা শিরকের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই ইসলাম বলেছে ঃ اُذْكُرُوْا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآئَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا 'তোমরা আল্লাহকে ঠিক তেমনিভাবে স্মরণ করো, যেমন তোমাদের পিতাদেরকে স্মরণ করে থাকো এবং তার চাইতে বেশি করে (স্মরণ করো)।' লক্ষ্য করুন, এ আয়াতে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য এ কথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ তোমাদের পিতা অর্থাৎ আল্লাহ ও পিতাকে উপমান ও উপমেয় হিসেবে পেশ করা হয়নি। বরং আল্লাহর ভালবাসা এবং পিতার ভালবাসা এই উভয় ভালবাসাকে উপমা ও উপমেয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এথেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলাম এ দৈহিক সম্পর্ককে ত্যাগ করেছে কিন্তু এ দৈহিক সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট ভালবাসাকে জীবিত রেখেছে। বরং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলেছে ঃ 'আল্লাহকে পিতার চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসা উচিত।' اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا থেকে প্রমাণ হয় যে, এ সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট ভালবাসাকে সে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার ভালবাসার তুলনায় তুচ্ছ ও নিম্নতর পর্যায়ের মনে করে এবং তার মধ্যে উন্নতির প্রয়োজন অনুভব করে। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ঈমানদারগণ আল্লাহকে সর্বাধিক

www.bjilibrary.com

ভালবাসে।' ইসলাম আল্লাহকে 'আবুল 'আলামীন' (বিশ্বপিতা) বলে না, বরং বলে 'রাব্বুল 'আলামীন' (বিশ্বপালক)। কেননা তার দৃষ্টিতে তার পিতার চাইতে রব (প্রতিপালক)-এর মর্যাদা অনেক উচ্চে। পিতার সম্পর্ক পুত্রের সঙ্গে সাময়িক কিন্তু 'রবে'র সম্পর্ক তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে তার অস্তিত্ব লাভের পরবর্তী মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এর মধ্যে একটি মুহূর্তেরও ছেদ নেই। ইসলামের আল্লাহ হচ্ছেন 'ওয়াদুদ' অর্থাৎ প্রেমময়, 'রউফ' অর্থাৎ এমন স্নেহ ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ যেমন স্নেহ ও ভালবাসা পিতা-পুত্রের প্রতি পোষণ করেন এবং 'হান্নান' অর্থাৎ এমন স্নেহ ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ, যেমন স্নেহ ও ভালবাসা মাতা-পুত্রের প্রতি পোষণ করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি পিতাও নন, মাতাও নন, বরং এ উপমাগুলোর বন্ধন থেকে মুক্ত।

২. বন্ধুগণ! প্রাচীন ধর্মসমূহের তওহীদ-বিশ্বাসে বিভ্রান্তি সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে ভুল ধারণা। অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলীকে তাঁর সত্তা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করা। হিন্দু ধর্মে দেবতার যে বিরাট দল দৃষ্টিগোচর হয়, তার মূল কারণও এখানেই নিহিত। তারা আল্লাহর প্রতিটি গুণকে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে নিয়েছে, যার ফলে দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে। সংখ্যা ছাড়াও গুণাবলীর উপমা ও রূপককেও তারা দেহধারী হিসেবে পেশ করেছে। আল্লাহর শক্তিকে তারা সত্যিকার হাতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে এবং তাঁর দেহধারী উপমা ও রূপককেও দেহধারী হিসেবে পেশ করেছে। তাঁর দেহধারী উপমা দান করতে গিয়ে দুই হাতের স্থলে কয়েক জোড়া হাত তৈরি করেছে। আল্লাহর গভীর ও পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে বুঝাতে গিয়ে একটি মস্তকের স্থলে দ্বিমস্তকধারী মূর্তি দাঁড় করিয়েছে।

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে চিন্তা করলে জানতে পারবেন যে, এই একই আল্লাহর গুণাবলী ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দেহরূপ দান করার কারণে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। আল্লাহর তিনটি প্রধান পরিচয় হচ্ছে ঃ তিনি স্রষ্টা, প্রতিপালনকারী ও ধ্বংসকারী। হিন্দু সম্প্রদায়সমূহ এ তিনটি পরিচয়কে তিনটি পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে ঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অর্থাৎ স্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাকারী ও পালনকারী এবং ধ্বংস ও সংহারকর্তা।

www.bjilibrary.com

এভাবে তিনটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও শৈব তিনটি পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। শিবলিঙ্গবাদী সম্প্রদায় স্রষ্টার নিছক সৃষ্টিগুণকেই নিজেদের আল্লাহ গণ্য করে প্রজননযন্ত্রকে স্রষ্টার প্রকাশ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং তার প্রতিমূর্তির পূজা করতে শুরু করেছে।

খ্রিস্টানরা আল্লাহর তিনটি বৃহত্তম গুণ অর্থাৎ চিরস্থায়ী অস্তিত্ব, অসীম জ্ঞান ও অপ্রতিরোধ্য সংকল্পকে তিনটি পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। চিরস্থায়ী অস্তিত্ব হচ্ছে পিতা, অসীম জ্ঞান হচ্ছে পবিত্র আত্মা এবং সঙ্কল্প হচ্ছে পুত্র। এ ধরনের খেয়াল রোমীয়, গ্রীক ও মিসরীয় চিন্তায়ও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম এ ভ্রান্তি অপনোদন করেছে এবং গুণাবলীর বৈচিত্র্যে প্রতারিত হয়ে আল্লাহকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করা মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতা বলে গণ্য করেছে। কুরআন বলেছে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'সমস্ত গুণাবলী একমাত্র বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত' وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى 'সমস্ত উত্তম গুণাবলী একমাত্র তাঁরই জন্যে নির্ধারিত।' اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ 'আল্লাহ হচ্ছেন যমীন ও আসমানের নূর।' আরবে এই সত্তাকে 'রহম' গুণে বিভূষিত করে খ্রিস্টানরা তাঁকে বলতো রহমান। আরবের সাধারণ মুশরিকরা তাঁকে বলতো 'আল্লাহ'। কুরআন বললো ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى-

'আল্লাহ' বলে ডাকো কিংবা 'রহমান' বলে ডাকো, যাই বলে ডাকো না কেন, সমস্ত ভালো নাম বা উত্তম গুণাবলী একমাত্র তাঁরই জন্যে নির্ধারিত।' (সূরা আল ইসরা- ১১০)

فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

'কাজেই আল্লাহই হচ্ছেন বন্ধু ও কার্যোদ্ধারকারী, তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর শক্তিশালী!'(সূরা আশ শূরা- ৯)

www.bjilibrary.com

اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ –

'জেনে রাখ, অবশ্যি আল্লাহ ক্ষমাকারী ও করুণাশীল।' (সূরা আশ্ শূরা)

هُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ

'তিনি আসমানে আল্লাহ এবং তিনি যমীনেও আল্লাহ এবং তিনি সুবিবেচক জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।' (সূরা আয যুখরুফ- ৮৪)

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا م اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۔ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ط رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۔

'তিনিই শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। তিনি আসমান ও যমীন এবং যা কিছু আসমান ও যমীনের মধ্যে আছে, সবকিছুর প্রতিপালক–যদি তোমরা বিশ্বাস কর। তিনি ছাড়া কোনো আল্লাহ নেই। তিনি জীবিত করেন এবং মারেন।' অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই শিব। তিনটি একই বিশেষ্যের বিশেষণ এবং এদের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই।

(সূরা আদ দুখান- ৬-৮)

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ص وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

'সমস্ত প্রশংসা ও গুণাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্য। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। যমীন ও আসমানে সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই জন্যে নির্ধারিত এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।' (সূরা আল জাসিয়া- ৩৬)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ–هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط

www.bjilibrary.com

يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

'আল্লাহ ছাড়া আর কোন 'ইলাহ' নেই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়গুলোর সকল খবর রাখেন। তিনি অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তা ও শান্তিদানকারী, আশ্রয়দাতা, বিপুল শক্তিপ্রয়োগকারী, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশকারী। মুশরিকরা আল্লাহর সঙ্গে যে সকল বিষয়ে শরীক করে, তাথেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহই স্রষ্টা। তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেন, তিনি আকৃতি দানকারী, যাবতীয় উত্তম নাম (অথবা উত্তম গুণাবলী) তাঁরই জন্যে নির্ধারিত। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু (সৃষ্টি) আছে, সবই তাঁর গুণকীর্তন করে। তিনিই পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।'

(সূরা আল হাশর- ২২-২৪)

এ সকল গুণে গুণান্বিত আল্লাহকে আমরা একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। নয়তো অন্যেরা সত্তা ও গুণাবলীকে পৃথক করে এক আল্লাহকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করেছিল। سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ বাক্যেও ঐ শিরকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর সত্তাকে তাঁর গুণাবলী থেকে পৃথক করে লোকেরা এ শিরকে নিমজ্জিত হয়েছিল। এ সর্বশেষ পয়গাম একথা ব্যক্ত করেছিল যে, যিনি আল্লাহ তিনিই স্রষ্টা, তিনিই অস্তিত্বদানকারী, তিনিই আকৃতিদানকারী, তিনিই বাদশাহ, তিনিই পবিত্র সত্তা, তিনিই শান্তিদাতা, তিনিই পরাক্রান্ত ও বিপুল শক্তিশালী এবং তিনিই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। সমস্ত একই সত্তার অন্তর্ভূক্ত এবং তিনি মাত্র একজন।

৩. শিরকের তৃতীয় উৎস হচ্ছে আল্লাহর কর্মবৈচিত্র। অজ্ঞ লোকেরা ভুলক্রমে মনে করে নিয়েছে যে, বিভিন্ন সত্তা বিভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদন করে।

কর্ম দু'ভাগে বিভক্ত। একটি সৎ অন্যটি অসৎ অথবা এভাবেও বলা যায়, একটি ভালো এবং অন্যটি মন্দ। একটি সত্তার মধ্যে ভালো ও মন্দের ন্যায় দু'টি বিপরীত গুণের সমাবেশ হতে পারে না। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যরথুস্ট্রিয়গণ ভালো কাজ ও ভালো বিষয়ের জন্য পৃথক আল্লাহ এবং মন্দ

www.bjilibrary.com

কাজ ও মন্দ বিষয়ের জন্যে পৃথক আল্লাহর ধারণা করে নিয়েছে। প্রথমটির নাম ইয়াযদাঁ ও দ্বিতীয়টির নাম আহিরমন! তারা দুনিয়াকে এ দু'টি আল্লাহর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের যুদ্ধক্ষেত্র গণ্য করেছে। তাদের এ ভুল করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা ভালো ও মন্দের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। বন্ধুগণ, দুনিয়ায় ভাল ও মন্দ নামক কোনো বস্তু নেই। কোনো বস্তু তার মূলের দিক দিয়ে ভালোও নয়, মন্দও নয়। মানুষের উক্ত বস্তু ব্যবহারের মাধ্যমেই তা ভালো ও মন্দে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগুনের উল্লেখ করছি। এর সাহায্যে যদি খাদ্য তৈরী করেন, গাড়ী চালান অথবা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কাকেও উত্তাপ দান করেন, তাহলে এগুলো ভালো। আবার যদি এর সাহায্যে কোন গরীবের ঘর জ্বালিয়ে দেন, তাহলে মন্দ। আগুন তার প্রকৃতির দিক দিয়ে ভালোও নয়, মন্দও নয়। আপনারা নিজেদের ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে ভালো বা মন্দে পরিণত করেন। তলোয়ার ভালোও নয়, মন্দও নয়, আপনারা তাকে যেভাবে ব্যবহার করবেন, সেভাবেই সে কাজ করবে। অন্ধকার ভালোও নয়, মন্দও নয়। তাকে মানুষের গৃহে সিঁদ কাটার জন্যে ব্যবহার করলে তা মন্দে পরিণত হয়, আবার নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে নেকী অর্জন বা মানুষকে শান্তি ও আরামদানের উপায় হিসেবে গ্রহণ করলে তা ভালোয় পরিণত হয়।

আল্লাহ এ বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন, এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন, পদার্থ সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন গুণ ও শক্তিতে ভূষিত করেছেন। অতঃপর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাকে হৃদয় ও মস্তিষ্ক দান করেছেন। এখন দেখুন, এক ব্যক্তি এ বিশ্বজাহানের বিন্যাস এবং পদার্থের গঠনপ্রণালী ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে এক মহাশক্তিধর স্রষ্টার সৃষ্টি-ক্ষমতা ও গঠন-বৈচিত্র্যের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করে فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ। 'শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা আল্লাহ মহামহীয়ান' বলে হযরত ইবরাহীমের ন্যায় এরূপ চিৎকার করে ওঠে ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

www.bjilibrary.com

'আমার মুখ সকল দিক থেকে ফিরিয়ে এনে সেই সত্তার দিকে স্থাপন করেছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।' (সূরা আল-আন-আম- ৯৭)

অন্যদিকে ঐ পদার্থ এবং তার শক্তিসমূহ ও গুণাবলীর বাহ্যিক আকৃতিতে বিভ্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্কের যাবতীয় শক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং পদার্থকেই আসল বিশ্ব ও তার সকল শক্তির মূল মনে করে এবং বলে ওঠে ঃ

مَا هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا ـ وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ-

'এই পার্থিব জীবনটি ছাড়া আর কোন জীবন নেই, আমরা মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত হই এবং যামানার বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদেরকে মৃত্যু দান করে না।' (সূরা আল জাসিয়া- ২৪)

বিশ্বজাহান ও তার সৃষ্টিবৈচিত্র্য সকলের সামনে একইরূপে বিরাজমান কিন্তু এ বিশ্বে রয়েছে হাজার ধরনের মন-মস্তিষ্ক। একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে একটি মস্তিষ্ক আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং অন্যটি গোমরাহী ও নাস্তিকতায় পতিত হয়। চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, একটি বস্তু মানুষকে সৎ পথও দেখাচ্ছে, আবার বিভ্রান্তও করছে। অথবা এভাবেও বলা যায়, এ বিশ্বজাহান তার প্রকৃতিগতভাবে সৎ পথ প্রদর্শন করা বা পথভ্রষ্ট করার কোন কিছুরই যোগ্যতা রাখে না বরং আপনারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য অনুসারে সৎ পথ লাভ করছেন, আবার পথভ্রষ্ট হচ্ছেন। আল্লাহর একটি কর্ম (পদার্থ) যেমন দুই প্রকার ফল দান করে, তেমনি তাঁর পয়গামও দুই প্রকার ফল দান করে। একই কুরআন ও ইনজীল পাঠ করে এক ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পারে ও সান্ত্বনা লাভ করে এবং অন্য ব্যক্তির মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং সে আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পয়গাম একই, কিন্তু হৃদয় দু'টি এবং এ দু'টি হৃদয় ও দু'টি মস্তিষ্ক একই স্রষ্টার সৃষ্টি। স্রষ্টাও এখানে দু'জন নয়। তাহলে এ আলোচনার ফল কি দাঁড়াল? ফল এই দাঁড়াল যে, কর্মের প্রকারভেদ ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। এ-বিপুল বৈচিত্র্য একই আল্লাহর শক্তিমত্তার প্রকাশ। ভালো ও মন্দ উভয়ই তাঁরই হাতে এবং হিদায়াত ও গোমরাহী উভয়ই তাঁর নিকট থেকে আসে।

www.bjilibrary.com

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ط وَيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفَاسِقِيْنَ - الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ م بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

'নিজের এ বাণীর মাধ্যমে তিনি (আল্লাহ) অনেককে সত্য পথের সন্ধান দেন। তিনি তাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দেন না যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ যাকে সংযুক্ত করার হুকুম দেন তাকে কর্তন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

(সূরা আল বাকারা- ২৭)

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ -

'এবং আল্লাহ কাফেরদেরকে সত্য পথের সন্ধান দেন না।'

(সূরা আল বাকারা- ২৬৪)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যাবে যে, সৎ পথ ও পথভ্রষ্টতা উভয়ের মূলে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের দ্বারাই উভয়ের উদ্ভব হয়। মানুষ ফাসেকীর কাজ করে, আত্মীয়-পরিজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কুফরী করে, অতঃপর পথভ্রষ্টতা অনুসরণ করে। পথভ্রষ্টতা কখনো প্রথমে এবং ফাসেকী, নির্লজ্জতা প্রভৃতি পরে আগমন করে।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, এ পথটি গন্তব্যের দিকে গিয়েছে এবং ঐ পথটি মানুষকে গভীর গহবরে নিক্ষেপ করে। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا -

'আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এখন সে কৃতজ্ঞ হয় অথবা হয় অস্বীকারকারী।' (সূরা আদদাহর- ৩)

সমগ্র বিশ্বের ভালো-মন্দ প্রত্যেকটি বস্তুর তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ م لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ -

www.bjilibrary.com

'আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, তিনিই সকল বস্তুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া আর কোন আল্লাহ নেই।'(সূরা আল মুমিন- ৬২)

اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

'আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কিছু করো সব সৃষ্টি করেছেন।'(সূরা আস সফফাত- ৯৬)

কিন্তু ঃ

اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى ـ

'তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন অতঃপর তাকে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়েছেন।' (সূরা আত-ত্বহা- ৫০)

এখন মানুষই তাকে হেদায়াত ও গোমরাহে এবং ভালো ও মন্দে পরিণত করেছে। ভূল পথে অগ্রসর হলে তা গোমরাহীতে পরিণত হয় এবং সঠিক পথে অগ্রসর হলে হেদায়াতের রূপ লাভ করে। যথার্থ ক্ষেত্রে ব্যয় করলে তা ভালোয় এবং ভুল ব্যবহারের ফলে মন্দে পরিণত হয়। অন্যথায় কোনো বস্তু তার মৌলিকত্বের দিক দিয়ে ভালোও নয়, মন্দও নয়, গোমরাহীও নয়। তাই ভালো ও মন্দকে দু'টি বস্তু মনে করে দু'টি পৃথক আল্লাহ স্বীকার করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং আল্লাহ উভয়ের স্রষ্টা।

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ـ

'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা আছে কি? তিনিই তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই, তাহলে তোমরা কোথায় পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?'

(সূরা আল ফাতির- ৩)

আল্লাহ তাঁর পয়গাম তোমাদের নিকট সোপর্দ করেছেন, এখন তোমরা তাকে মানতে পার, আবার নাও মানতে পার।

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ج فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ج وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ج وَمِنْهُمْ سَابِقٌ م بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

www.bjilibrary.com

'অতঃপর আমি তাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারীতে পরিণত করেছি, যাদের আমি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করেছি। এখন তাদের মধ্য থেকে কেউ নিজেদের ওপর অত্যাচার করে, আবার কেউ আল্লাহর নির্দেশে সৎকর্ম সহকারে এগিয়ে যায়।' (সূরা আল ফাতির- ৩২)

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

'আর তোমাদের ওপর যে সমস্ত বিপদ আসে, তা তোমাদের হস্তদ্বয় যা কিছু অর্জন করে তারই প্রতিফল স্বরূপ। এবং তিনি অনেক কিছুই মাফ করে দেন।'(সূরা আশ শূরা- ৩০)

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۔

'প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ পাপ ও পুণ্য নিক্ষেপ করেছেন। কাজেই যে তাকে (নিজের নফসকে) পবিত্র করেছে, সে নাজাত লাভ করেছে। আর যে তাকে মৃত্তিকায় মিশিয়ে দিয়েছে, সে ব্যর্থ হয়েছে।' (সূরা আশ শামস)

৪. আল্লাহর ইবাদত করার রীতি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ছিল এবং আজও আছে। কিন্তু প্রাচীন ধর্মগুলোতে একটি বিভ্রান্তি বিস্তার লাভ করেছিল। তা হচ্ছে এই যে, ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে কষ্ট দেয়া অথবা অন্য কথায় বলা যায়, তাদের মধ্যে এ ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, রক্ত-মাংসের এ শরীরটিকে যত বেশি কষ্ট দেয়া হবে তত বেশি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হবে এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পাবে। এরই ফলে হিন্দুদের মধ্যে সাধারণভাবে যোগবাদ ও খ্রিস্টানদের মধ্যে 'রাহবানিয়াত' বা সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব হয় এবং কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার প্রচলন হয়। একেই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় মনে করা হয়। কেউ সারা জীবন গোসল করতো না, কেউ বা সারা জীবন চট বা কম্বল পরিধান করতো, কেউ সকল সময় এমন কি শীতের দিনেও দিগম্বর থাকতো, কেউ সারা জীবন দাঁড়িয়ে থাকতো, কেউ সারা জীবন গুহার মধ্যে বসে থাকতো, কেউ সারা জীবন রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকতো, কেউ সারা জীবন কোনো পাথরের ওপর বসে থাকতো, কেউ শপথ করতো যে, সারা জীবন কেবল গাছের পাতা খেয়ে

www.bjilibrary.com

জীবন ধারণ করবে, কেউ সারা জীবন কুমার থাকতো এবং সন্তান উৎপাদন না করাকে ইবাদত মনে করতো, কেউ একটি হস্ত শূন্যে উত্তোলিত রেখে তাকে শুকিয়ে ফেলতো, কেউ শ্বাস রোধ করাকে ইবাদত মনে করতো, কেউ গাছের ডালে উল্টা হয়ে ঝুলে থাকতো। এ ছিল ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বীদের আল্লাহপরস্তির উন্নততর পর্যায় এবং আধ্যাত্মিকতার সর্বাধিক উন্নত রূপ। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম মানবতাকে এ সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে এবং বলেছে যে, এগুলো আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং দেহের বিচিত্র কসরত। আল্লাহ আমাদের দেহের কসরত পসন্দ করেন না বরং হৃদয়ের রং ভালোবাসেন। তাঁর শরীয়তে সামর্থের অধিক কষ্টের অবকাশ নেই।

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ـ

'আল্লাহ কাউকে তার সামর্থের অধিক কষ্ট দেন না।'

ইসলাম এ রাহবানিয়াত বা সন্ন্যাসবাদকে বিদআত গণ্য করে বলছে ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَاكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ـ

'আর যে রাহবানিয়াতকে (খ্রিস্টানরা) তাদের দীনের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে, তাকে আমি তাদের ওপর ফরয করিনি।' (সূরা আল হাদীদ) ·

এবং রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

لَاصَرُوْرَةَ فِى الْاِسْلَامِ ـ

'ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই।' (আবু দাউদ)

যারা আল্লাহর সৃষ্ট আরাম-আয়েশকে নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছিল তাদেরকে কুরআন প্রশ্ন করেছে ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ

'বলো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সাজসজ্জা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে কে হারাম করেছে?' (সূরা আল আ'রাফ- ৩২)

. এমন কি একবার রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্য মধু হারাম করে নিয়েছিলেন, তখন তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَا تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ـ

www.bjilibrary.com

'হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন তাকে তুমি হারাম করছো কেন?' (সূরা আত তাহরীম- ১)

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম সর্বপ্রথম দুনিয়াকে একথা জানিয়েছে যে, ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাত্র একটি, আর তা হচ্ছে এই যে, বান্দা আল্লাহর সম্মুখে নিজের বন্দেগীর স্বীকৃতি দান করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ـ

'যারা আমার ইবাদত থেকে বিদ্রোহ করে, তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা আল মুমিন- ৬০)

অর্থাৎ ইবাদত হচ্ছে এই যে, বান্দা আল্লাহদ্রোহী হবে না। ইবাদতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পাদন করে বান্দা এ কথা প্রকাশ করে যে, সে আল্লাহদ্রোহী নয় বরং তাঁর অনুগত বান্দা।

ইসলামে ইবাদতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ফল কি? কেবল তাকওয়া বা আল্লাহভীতি সৃষ্টি।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা আল বাকারা- ২১)

নামাযের দ্বারা কিভাবে উপকৃত হওয়া যায়, তা নিম্নের আয়াত থেকে বোঝা যায়।

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অপসন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে।'

(সূরা আল-আনকাবুত- ৪৫)

রোযার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

www.bjilibrary.com

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া হাসিল করতে পারো।' (সূরা আল বাকারা- ১৮৩)

হজ্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ م بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ـ

'যাতে করে লোকেরা তাদের লাভের স্থানে পৌছতে পারে এবং যাতে করে কতিপয় নির্ধারিত দিনে আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা হিসেবে যে পশু দান করেছেন তার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে।'

(সূরা আল হজ্জ- ২৭)

যাকাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করা ও গরীবদেরকে সাহায্য করা।

اَلَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ـ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ـ

'যে ব্যক্তি নিজের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করার জন্যে অর্থ দান করে এবং এ জন্য কোন বিনিময়ের আশা করে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।' (সূরা আল লাইল- ১৮-২০)

বিবাহ করা ও বংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে ইসলামের পয়গম্বরের সুন্নাত। তিনি বলেছেন ঃ

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ـ

বিবাহ হচ্ছে আমার পথ, যে আমার পথ পরিহার করলো সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।' (আল হাদীস)

কুরআন মজীদ স্ত্রী ও সন্তানকে চোখের শীতলতা বলে উল্লেখ করেছে এবং মুসলমানদেরকে এই কামনাকারী হিসেবে গণ্য করেছে যে,

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

www.bjilibrary.com

'আর যারা বলে ঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মাধ্যমে চোখের শীতলতা দান করো।'

অন্যান্য বিষয় ছাড়া কোরবানীও একটি ইবাদত। লোকেরা নিজেদেরকে (অর্থাৎ মানুষকে) দেবতাদের জন্য কোরবানী করতো। সন্তানদেরকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করতো এবং তাদেরকে দেবতাদের নিকট নজরানা হিসেবে পেশ করতো। দেবতাদেরকে রক্তের ফোঁটা দান করা হতো। যে পশু কোরবানী করা হতো তার গোশ্ত জ্বালানো হতো। কেননা তার ধোঁয়ায় দেবতা খুশী হতো। ইহুদীরা এজন্য গোশ্ত জ্বালাত। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) এসে কোরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য জানালেন। তাঁর পয়গাম মানুষকে কোরবানী করার প্রথা একেবারেই বন্ধ করে দেয়। অবশ্যই পশু কোরবানীকে বৈধ ঘোষণা করে, কিন্তু রক্তের ফোঁটা দেয়া আর গোশ্ত জ্বালানোর অনুমতি দেয়নি। কোরবানীর কারণ বর্ণনা পসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ- فَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ج فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ -

'আর কোরবানীর জানোয়ারকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নামের নিশানীতে পরিণত করেছি। ঐ জানোয়ারগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। কাজেই তাদের ওপর আল্লাহ্র নাম পাঠ করো সারিবন্দী করে। আর তা নিশ্চল হয়ে যাবার পর তার মধ্য থেকে কিছু তোমরা খাও এবং বাকীটা পরিতুষ্ট হয়ে বসে থাকা এবং নিজেদের অভাব পেশকারী গরীবদেরকে আহার করাও। এভাবেই এ পশুগুলোকে আমি তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। ঐ কোরবানী-সমূহের গোশ্ত ও রক্ত কখনো আল্লাহ্র নিকট পৌছে না, কিন্তু তোমাদের দিলের তাকওয়া তাঁর নিকট পৌছে। এভাবে তাদেরকে তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করেছেন, যাতে করে আল্লাহ

www.bjilibrary.com

তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, তার জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পারো এবং (হে নবী) সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।'

(সূরা আল হজ্জ- ৩৬-৩৭)

কোরবানীর এ ভ্রান্ত ধারণার ফলে এ বিষয়ের উদ্ভব হয়েছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের প্রাণের মালিক এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী। অনুরূপভাবে সে তার সন্তানদের প্রাণেরও মালিক। স্বামী তার স্ত্রীর প্রাণের মালিক। এই একটি ভ্রান্ত নীতির ফলে আত্মহত্যা, কন্যা হত্যা, সন্তানকে নজরানা হিসেবে পেশ করা অথবা তাদেরকে হত্যা করা, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সতীদাহ প্রভৃতি শত শত মানবতা বিরোধী রসম-রেওয়াজের উদ্ভব হয়েছিল। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পয়গাম এসবের মূলোৎপাটন করেছে। এখানে এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণ একমাত্র আল্লাহ্র মালিকানাধীন এবং একমাত্র আল্লহ্রই উদ্দেশ্যে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। এ জন্য গায়রুল্লাহ্র নামে যে পশু কোরবানী করা হয় তার গোশ্ত হালাল নয়। আত্মহত্যাকারীদের ওপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জান্নাতও হারাম করে দিয়েছেন! ইসলাম ছাড়া সমগ্র দুনিয়ায় এবং বর্তমানেও ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সুসভ্য দেশেও আত্মহত্যাকে সমস্যা ও বিপদ থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পন্থা বিবেচনা করা হয়। আইন এর প্রতিরোধে অগ্রসর হয়, কিন্তু সফল হয় না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করে এবং তাকে দুনিয়ার বিপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায় বলে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, এ মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই, আর যদি থেকেও থাকে তাহলে আল্লাহ্ আমাদের নিকট থেকে আমাদের এ কর্মের কোনো জবাব তলব করবেন না। কিন্তু ইসলাম বলেছে, কারো প্রাণের মালিক মানুষ নয় বরং সকল প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্। তাই আত্মহত্যার মাধ্যমে বিপদ মুক্তির ধারণা নেহাত ভ্রান্ত চিন্তাপ্রসূত। কেননা এভাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পর পরবর্তী জগতে আরো অধিক বিপদসঙ্কুল জীবন শুরু হবে।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ـ

'কাকেও হত্যা করো না। আল্লাহ্ একমাত্র হকের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কারণে প্রাণনাশ করা হারাম করেছেন।' (সূরা বণী ইসরাঈল)

www.bjilibrary.com

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ـ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ـ

আর তোমাদের নিজেদেরকেও হত্যা করো না। অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর করুণাশীল (আর এ জন্য করুণাবশত তোমাদেরকে এ নির্দেশ দান করেছেন)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশ লঙ্ঘন করে এবং নিজের ওপর জুলুম করে এ কাজে ব্রতী হবে, তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবো।' (সূরা আন-নিসা- ২৯-৩০)

আরবে কন্যা হত্যার প্রচলন ছিল। হিন্দুস্তানের রাজপূতদের মধ্যেও এর প্রচলন ছিল। দুনিয়ার আরো বিভিন্ন দেশেও এর প্রচলন ছিল। আরবে এটি এমন নিষ্ঠুর রীতিতে পরিণত হয়েছিল যে, সেখানে কন্যাকে জীবিত প্রোথিত করা হতো। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পয়গামের একটি মাত্র বাক্যই এ বাতিল রীতিটি চিরকালের জন্য উৎখাত করে।

وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ- بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ـ

'আর যেদিন জীবিত প্রোথিত কন্যা সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন পাপে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল?' (সূরা আত তাকভীর)

নিজের সন্তানকে হত্যা করা আরবে অপরাধ বলে গণ্য হতো না। আজকের এই সুসভ্য জগতেও অসংখ্য সন্তানকে এজন্য হত্যা করা হচ্ছে যে, পিতামাতার তাদের লালন-পালন করার সঙ্গতি নেই। বলা হয়, দেশের উৎপাদন কম, তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। আরবে এবং অন্যান্য জাতিদের আইনে গর্ভপাত করা বা শিশু হত্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান ছিল না। গ্রীসের নবজাতকদের পরীক্ষা করা হতো এবং তন্মধ্যে দুর্বলদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার আছে বলে মনে করা হতো না। তাদেরকে পাহাড় থেকে নীচে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হতো। আজও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নামে এ সব কিছুই হচ্ছে। ইসলাম এ চিরন্তন নীতি বর্ণনা করেছে যে, রিযিক কেউ কাউকে দান করে না।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ـ

www.bjilibrary.com

'যমীনের ওপর প্রত্যেক বিচরণকারীকে রিযিকদানের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।'

তাই ইসলাম বলে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ـ

'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না! আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি। অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করা বিরাট অন্যায়।' (সূরা বণী ইসরাঈল- ৩১)

দুনিয়ার যে বিরাট অংশে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-র পয়গাম গৃহীত হয়নি, সেখানে যে ভ্রান্তি বিরাজমান তা হচ্ছে এই যে, লোকেরা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে বংশ, গোত্র, ধন-সম্পদ, বর্ণ, রূপ ও আকৃতি-প্রকৃতির প্রাচীর খাড়া করেছে। ভারতের লোকেরা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদেরকে ছাড়া সারা দুনিয়ার মানুষকেই ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্য গণ্য করেছে এবং নিজেদেরকে চারটি বর্ণের মধ্যে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে সম্মান ও অধিকারের তারতম্য সৃষ্টি করেছে। শূদ্রদের ধর্ম-কর্ম করারও অধিকার ছিল না। প্রাচীন ইরানেও এ চারটি সম্প্রদায় এভাবেই বিদ্যমান ছিল। রোমানরা নিজেদেরকে প্রভুত্বের অধিকারী এবং অন্যদেরকে গোলামী করার যোগ্য মনে করেছিল। আজ সভ্যতা, মানব প্রেম ও সাম্যের দাবীদার ইউরোপের অবস্থাটাই একবার বিবেচনা করুন। শ্বেতকায়রা সেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একচ্ছত্র অধিকারী বলে গণ্য হয়। কৃষ্ণকায়রা তাদের সমপর্যায়ের বলে বিবেচিত হয় না। এশীয় জাতিরা সফরেও তাদের সঙ্গে একত্রে চলতে পারে না। কোন কোন দেশে তাদের মহল্লায় বসবাসও করতে পারে না এবং তাদের সকল অধিকারও ভোগ করতে পারে না। আমেরিকার মানব দরদীদের দৃষ্টিতে সেখানকার কৃষ্ণকায় বাসিন্দাদের বেঁচে থাকারও কোনো অধিকার নেই। আর দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় কেবল কৃষ্ণকায় নয় বরং ভারতীয় তথা এশীয়রাও মানবিক সমানাধিকার লাভ করতে পারে না। পার্থিব অধিকারের সীমা পেরিয়ে এ তারতম্য আল্লাহ্র এ দুটি কালো ও

www.bjilibrary.com

সাদা বান্দা এক সঙ্গে এক আল্লাহর সম্মুখে নত হতে পারে না। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম এ সমস্ত তারতম্য ও পার্থক্য বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে বংশ, গোত্র, ধন-সম্পদ, আকৃতি, প্রকৃতি কোনো কিছুই মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না। যে কুরাইশরা তাদের বংশ ও গোত্রের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর গর্ব করতো, মক্কা বিজয়ের দিন কাবার হারেমে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন ঃ

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نُخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَعَظَمَهَا بِالْاٰبَاءِ النَّاسُ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ ـ

'হে কুরাইশগণ! এখন আল্লাহ তাআলা জাহেলিয়াতের অহঙ্কার গোত্রীয় গর্ব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম বংশোদ্ভূত এবং আদমের সৃষ্টি মৃত্তিকা থেকে।' (ইবনে হিশাম)

বিদায় হজ্বের জনসমুদ্রে আবার ঘোষণা করলেন ঃ

لَيْسَ لِلْعَرَبِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَلَا لِلْعَجَمِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَرَبِيِّ كُلُّكُمْ اَبْنَاءُ اٰدَمَ وَ اٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ ـ

'আরবের অনারবের ওপর এবং অনারবের আরবের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদমের সৃষ্টি হয়েছিল মৃত্তিকা থেকে।' (মুসনাদে আহ্‌মদ)

অতঃপর তিনি বলেন, আসল পার্থক্য হচ্ছে কর্মের ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ ـ اَلنَّاسُ كُلُّكُمْ بَنُو اٰدَمَ وَاٰدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ

'আল্লাহ জাহেলী যুগের অহঙ্কার ও বংশগর্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। মানুষ এখন হচ্ছে মুত্তাকী ঈমানদার বা গোনাহগার দুর্ভাগা। সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান এবং আদমকে মাটি থেকে পয়দা করা হয়েছিল।'

(তিরমীযি, আবু দাউদ)

www.bjilibrary.com

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র ওহী সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে বললো ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ

'হে মানব জাতি! তোমাদের সবাইকে আমি (আল্লাহ) একটি মাত্র পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে গোত্র ও বংশে এজন্য বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। আল্লাহর নিকট সবচাইতে সম্মানী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তাঁকে সবচাইতে বেশি ভয় করে।'

(সূরা আল হুজরাত- ১৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ز فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا ـ

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন কোন বস্তু নয়, যা আমার নিকট তোমাদের মর্যাদা উন্নত করে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে। তারা তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান লাভ করবে।'

(সূরা আস সাবা- ৩৭)

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম সমস্ত মুসলমানকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছে এবং তাদেরকে এ পয়গাম শুনিয়েছে যে, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ। 'সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই।' এ অনুযায়ী বিদায় হজ্বে রাসূলুল্লাহ (স) এক লক্ষ জনতার মহাসমুদ্রে ঘোষণা করলেন ঃ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ। 'প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই।' এ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সাদা-কালো, আরাবী-আজমী, তূর্কী-তাতারী, ইংগী ও ফিরিংগীর পার্থক্য উঠিয়ে দিয়েছে এবং আল্লাহ তাদের ওপর তাঁর এ অনুগ্রহের উল্লেখ করলেন যে, فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا 'আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাইয়ে পরিণত হয়েছো।' আল্লাহর ঘরে সবার সমান অধিকার, বংশ-গোত্রের কোন পার্থক্য নেই, পেশা ও পদমর্যাদার পার্থক্য নেই, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের পার্থক্য নেই। আল্লাহর নিকট সবাই সমান। এখানে কেউ

www.bjilibrary.com

ব্রাহ্মণ আর কেউ শূদ্র নয়। সকলেরই হাতে কুরআন দেয়া হবে। সকলের পিছনেই নামায পড়া হবে। প্রত্যেকের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। জ্ঞানে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত। اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ 'প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।'

প্রিয় যুবকরা!

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম দুনিয়াকে যে সমস্ত বস্তু দান করেছে, তা আমি একটি একটি করে আপনাদের সম্মুখে উল্লেখ করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রয়োজনের অনুপাতে সময় অতি অল্প এবং এ অতল সমুদ্রের প্রান্ত মেলাও দুষ্কর। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম নারী সমাজকে যে অধিকার দান করেছে এবং গোলামদেরকে যে মর্যাদায় ভূষিত করেছে, ইচ্ছা হচ্ছিল এর বিবরণও আপনাদের সম্মুখে পেশ করি এবং এ বিষয়টিও দেখাই যে, ইউরোপের গালভরা দাবী সত্ত্বেও ইউরোপীয় জাতিরা ইসলামের সুউচ্চ মিনারের বহু নিম্নে অবস্থান করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময় নেই।

দীন ও দুনিয়ার পৃথকীকরণ

দুনিয়ার যে বস্তুটি সবচেয়ে বেশি গোমরাহীর পথ পরিষ্কার করেছে, সেটি হচ্ছে দীন ও দুনিয়ার পৃথকীকরণ। দীনের কাজকে পৃথক করে নেয়া হয়েছে এবং দুনিয়ার কাজকে পৃথক। আল্লাহর নির্দেশে ধন-সম্পদ লাভের পথ পৃথক করা হয়েছে এবং দীন অর্জনের পথ পৃথক। প্রিয় যুবকবৃন্দ! দুনিয়ায় যে সমস্ত বিভ্রান্তি বিস্তার লাভ করেছিল তার মধ্যে এটিই ছিল বৃহত্তম। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গামের উজ্জ্বল কিরণ এ বিভ্রান্তি-জাল ছিন্নভিন্ন করেছে। এ পয়গামই একথা বলেছে যে, আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য সহকারে দুনিয়ার কার্যাবলী আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সম্পাদন করাও দীন। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী দুনিয়াদারীর নামই দীনদারী। লোকেরা মনে করে, যিকির-ফিকির করা, গৃহত্যাগ করে বৈরাগীর জীবন যাপন করা এবং পাহাড়ের গুহায় বসে আল্লাহকে স্মরণ করার নাম দীনদারী। আর বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, দেশ-জাতি এবং নিজেকে সাহায্য ও প্রতিপালন করা এবং জীবিকার সন্ধান

www.bjilibrary.com

ও সন্তান পালন করা দুনিয়াদারী। ইসলাম এ ভ্রান্ত ধারণারও বিলোপ সাধন করেছে এবং বলেছে যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এ অধিকারগুলো হাসিল করা ও কর্তব্য পালন করা দীনদারীরই অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামে দু'টি বিষয়ের ওপর নাজাত নির্ভরশীল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ঈমান ও অন্যটি সৎ কর্ম। পাঁচটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম হচ্ছে ঈমান ঃ আল্লাহর উপর, সৎ পথের সন্ধানদাতা পয়গম্বরগণের ওপর, পয়গম্বরগণের নিকট আল্লাহর পয়গাম আনয়নকারী ফেরেশতাগণের ওপর, আল্লাহর এ পয়গাম যে সমস্ত কিতাবে আছে সে কিতাবসমূহের ওপর, এ পয়গাম অনুযায়ী কার্য করা ও না করার পুরস্কার ও শাস্তির ওপর। এ পাঁচটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখার নামই হচ্ছে ঈমান। এ ঈমানের ওপরই সৎ কর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। কেননা এ ঈমান ও বিশ্বাস ছাড়া সঙ্কল্প ও আন্তরিকতা সহকারে কোনো কার্য সম্পাদন সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে সৎ কর্ম। অর্থাৎ আমাদের কাজ সৎ ও ভালো হতে হবে।

ইতিপূর্বে আমার সপ্তম বক্তৃতায় বলেছি যে, কর্মের তিনটি অংশ ঃ একটি হচ্ছে ইবাদত, অর্থাৎ যার মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বান্দার বন্দেগী প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যবহারিক জীবন, অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক লেন-দেন, কাজ-কারবার, দেশ পরিচালনা সম্পর্কিত আইন-কানুন ও সংবিধান, যার সাহায্যে মানব সমাজ ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তিলাভ করে এবং জুলুমের বিলোপ সাধন হয় ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৃতীয়টি হচ্ছে নৈতিক চরিত্র, অর্থাৎ এমন সব অধিকার যা পরস্পরের ওপর আইনগত দিক দিয়ে ফরয না হলেও আত্মার পূর্ণতা ও সমাজের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। এই চারটি বস্তু অর্থাৎ ঈমান, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ও যথার্থতাই আমাদের নাজাতের মাধ্যম।

প্রিয় যুবকগণ! আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, নিসঙ্গতা, নির্জনতা, স্থবিরতা এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একক জীবন ইসলাম নয়। ইসলাম হচ্ছে সংগ্রাম, সাধনা, প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতার নাম। ইসলাম মৃত্যু নয়, জীবন। তাই ফরমান হচ্ছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ -

'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের হাতে বিক্রীত।'

(সূরা আল মুদ্দাস্‌সির- ৩৭)

www.bjilibrary.com

ইসলাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক অবিরাম প্রচেষ্টা- সাধনার নাম। কিন্তু সে প্রচেষ্টা নির্জনে ঘরে বসে নয়–কর্মক্ষেত্রে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবন আপনাদের সামনে রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনও আপনাদের সম্মুখে বর্তমান, সাধারণ সাহাবাগণের জীবনও আপনাদের জানা আছে। তাঁরাই আপনাদের আদর্শ। তাঁদের জীবনের মধ্যে আপনাদের নাজাতের পথ নিহিত। তাঁদের জীবনও আপনাদের কল্যাণের মাধ্যম এবং আপনাদের আদর্শ। তাঁদের জীবনের মধ্যে আপনাদের নাজাতের পথ নিহিত। তাঁদের জীবনেও রয়েছে আপনাদের কল্যাণের মাধ্যম এবং আপনাদের উন্নতি ও সৌভাগ্যের সোপান। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম গৌতম বুদ্ধের পয়গামের ন্যায় কামনা-বাসনা পরিহারের শিক্ষা দেয় না বরং কামনা-বাসনার পরিশুদ্ধি ও তাকে যথার্থ রূপ দানের শিক্ষা দেয়। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র পয়গাম হযরত ঈসার পয়গামের ন্যায় ধন-সম্পদ ও শক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও নিষেধাজ্ঞা জারির নাম নয় বরং এগুলো অর্জন ও ব্যয়ের পদ্ধতিসমূহ সংশোধন ও তাদের যথার্থ ব্যবহার ও ব্যয়ক্ষেত্রের নির্ধারণ এ পয়গামের লক্ষ্য।

বন্ধুগণ! ঈমান ও সেই অনুযায়ী সৎ কর্মের নাম হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে কর্ম, কর্ম পরিহার নয়। ইসলাম হচ্ছে কর্তব্য সম্পাদন, কর্তব্য পরিহার নয়। এই কর্ম ও কর্তব্যসমূহের ব্যাখ্যা আপনাদের পয়গম্বর ও তাঁর সহচরগণের জীবন ও চরিত্রে পাওয়া যাবে। এর চিত্র নিম্নরূপ ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا .

'মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল এবং যে সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের ওপর শক্তিশালী, পরস্পরের প্রতি করুণাশীল। তাদেরকে দেখবে যে, তারা রুকু-সিজদায় রত, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধান করছে।' (সূরা আল ফাতহ্- ২৯)

সত্য অস্বীকারকারীদের সঙ্গে তারা জিহাদ করছে, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালোবাসা কায়েম রেখেছে, আল্লাহর সম্মুখে রুকুতে ঝুঁকে আছে এবং সিজদায় নত আছে। আবার দুনিয়ায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিরও

www.bjilibrary.com

সন্ধান করছে। কুরআন মজীদের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগ্রহ (ফযল) বলা হয় রিযিক ও জীবিকাকে। এই রিযিক ও জীবিকার ক্ষেত্রেও দীনের দাবী রয়ে গেছে।

رِجَالٌ لَاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

'এরা এমন লোক যাদেরকে ব্যবসায় ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না।' (সূরা আন নূর- ৩৭)

ব্যবসায়, বেচাকেনা, কাজ-কারবার সব জারি আছে, আবার আল্লাহকে স্মরণ করাও হচ্ছে। তারা একটিকে ত্যাগ করে অন্যটির সন্ধান করে না, বরং উভয়ের সন্ধান করে একই সঙ্গে।

মুসলমান ও রোমীয়দের যুদ্ধ চলছে। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য হচ্ছেন সাহাবায়ে কিরাম! রোমান সেনাপতি মুসলিম সিপাহীদের অবস্থা জানবার জন্য মুসলমানদের শিবিরে গুপ্তচর পাঠাল। তারা এখানে এসে মুসলমানদের দেখে আপাদমস্তক প্রভাবিত হয়ে ফিরে গেল। রোমান সেনানায়কের নিকট তারা রিপোর্ট দিল ঃ মুসলমানরা অদ্ভুত সিপাহী– هم بالليل رهبان وبا النهار فرسان 'তারা রাতে সংসার ত্যাগী ও দিনে ঘোড়-সওয়ার।' এটিই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত জীবন।

বন্ধুগণ! আজ আমার বক্তৃতার শেষ দিন। মনে করেছিলাম, আটটি বক্তৃতায় আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)-র জীবন, চরিত্র ও পয়গাম সম্পর্কে সবকিছুই পেশ করতে পারবো, কিন্তু আটটি বক্তৃতার পর এখনো অনেক কিছুর আলোচনা রয়ে গেল।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

www.bjilibrary.com

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী

পয়গামে মুহাম্মদী

www.bjilibrary.com